জা না - অ জা না

আ ফ্রি কা

কাজী জহিরুল ইসলাম

আফ্রিকার জানা-অজানা রোগ-ব্যাধি

কতো যে রোগ-ব্যধি এখনো অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে আফ্রিকায় তার হিসেব কে রাখে। খোদ মার্কিন মুলুকের ডাক্তাররাই স্বীকার করেন আফ্রিকার সব রোগ-ব্যধি এখনো আবিস্কৃত হয়নি। সামান্য জ্বর হয়ে মানুষ মরে যাচ্ছে। আসলে এটা কি জ্বর? না-কি অন্য কিছু? এর উত্তর কোন ডাক্তারও দিতে পারেন না। আবার অনেক রোগ আছে, আবিস্কৃত হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা নেই। আবার অনেক রোগের চিকিৎসাও আছে কিন্তু সচেতনতা নেই বলে রোগী জানেই না কার কাছে যেতে হবে, কি চিকিৎসা করাতে হবে।

এবার ছুটি থেকে ফিরে এসেই শুনি, হলুদ জ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়েছে আইভরিকোস্টে। ইতোমধ্যেই নাকি কয়েজন মারাও গেছে। হলুদ জ্বর একটি ভয়ানক ব্যাধি। এর চিকিৎসা আছে ঠিকই কিন্তু চিকিৎসা সত্বেও মৃত্যুহার খুব বেশী। তবে সুখের কথা হলো এই রোগের প্রতিষেধক টিকা আছে। হলুদ জ্বর দুই রকমের। একটি হলো জঙ্গলের হলুদ জ্বর আর অন্যটি হলো শহুরে হলুদ জ্বর। দুই ধরণের হলুদ জ্বরই ইনফেক্টেড মশার দ্বারা ছড়ায়। জঙ্গলের হলুদ জ্বর সাধারণত বানরের হয়। বানর থেকে মশার মাধ্যমে এটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যে মশা শহুরে হলুদ জ্বরটা ছড়ায় তার নাম হলো *এইডেস এইজিপ্টি।* এ জাতীয় মশা গাড়ির ফেলে দেওয়া চাকা, ফুলদানি, তেলের ড্রাম কিংবা পানির ট্যাঙ্কিতে বংশবিস্তার করে। এখনো পর্যন্ত আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া হলুদ জ্বর পৃথিবীর আর অন্য কোথাও দেখা যায়নি। হলুদ জ্বর দেখা দিলে মাথা ধরে, মেরুদন্ডে ব্যাথা হয়, মাংশপেশিতে ব্যাথা হয়, বমির ভাব হয় এবং অতিরিক্ত জ্বর হয়। রোগী জ্বরের প্রকোপে শীতে থরথর করে কাঁপতে থাকে। কিছুদিন রোগে ভোগার পরে একটু ধাতস্থ হয়ে এলে হলুদ জ্বরের ভাইরাস আক্রমন করে কিডনীতে এবং কলিজায়। এর ফলে লিভার ফাংশন খারাপ হয়ে যায়। সমস্ত শরীর ধীরে ধীরে হলুদ হতে শুরু করে, প্রস্রাব হলুদ হয়ে যায়। ইনফেক্টেড মশা কামড়ানোর ৩ থেকে ৬ দিনের মধ্যেই এই লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করে।

আরেকটি অসুখের নাম লাসা জ্বর। এই জ্বরের প্রকোপ নাইজেরিয়াতে বেশী। তবে আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও লাসা জ্বর দেখা যায়। সাধারণত ইঁদুরের খাওয়া খাবার খেলে বা ইঁদুর খাবারের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে এবং সেই খাবার খেলে এই জ্বর হয়। লাসা জ্বরের কোনো চিকিৎসা নেই বলে শুনেছি। এই জ্বর হলে মানুষ মারা যাবেই। এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, লাসা জ্বরে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হলে সেই লাশ আন্তর্জাতিক কোন এয়ারলাইন্স বহন করে না। লাসা জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে ২৫ ফুট মাটির নিচে মৃত্যু হওয়া মাত্র পুতে দিতে হয়। নইলে মরদেহ থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পরে অন্যদের শরীরে। লাসা জ্বরে আক্রান্ত রোগী সর্বোচ্চ সাতদিন বাঁচে। এই রোগ শরীরের টিস্যুগুলি খেয়ে ফেলে।

আইভরিকোস্টের জঙ্গলে এক ধরণের মাছি আছে। এই মাছি বংশবিস্তার করে মানবদেহে। শুনে নিশ্চয়ই শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে। রোদে যখন আমরা কাপড় শুকোতে দিই তখন এই মাছি কাপড়ের ওপর বসে মনের সুখে ডিম পাড়ে। আমরা কাপড় রোদ থেকে এনে যদি ভালোমতো ইস্ত্রি না করে পরে ফেলি তাহলে সেই ডিমগুলি কাপড় থেকে আস্তে আস্তে রোমকুপের ভেতর দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। ব্যাস। দুই থেকে তিনদিন। তারপর চামড়া ফুলে এক একটা ফোড়া দেখা দিবে। সেই ফোড়া পাকবে, ব্যাথা করবে। এরকম তিন থেকে চারদিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগের পর একদিন ফোড়া ফেটে একটা মাছিশাবক উড়াল দিয়ে পালিয়ে যাবে।

আফ্রিকানদের প্রধান দুটি খাবারের একটি হলো কাসাভা। পেস্তা আলুর মতো এক ধরণের শেকড় এই কাসাভা। কাসাভা দিয়ে তৈরী হয় নানান রকমের সুস্বাদু খাবার। এই কাসাভা থেকে একবার ছড়িয়ে পড়লো এক ধরণের মোজাইক ভাইরাস। এই রোগের নাম হয়ে গেল কাসাভা রোগ। ১৯৯০ সালে পূর্ব আফ্রিকার আড়াই কোটো মানুষ আক্রান্ত হলো কাসাভা রোগে। তবে সুখের কথা হলো কাসাভা রোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুহার তেমন বেশী না।

এবোলা জ্বরের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। এটা একটা ঘাতক ব্যাধি। এবোলা জ্বর নিয়ে আমেরিকানরা ছবিও বানিয়েছে। সাধারণত এই জ্বর বানর, গরিলা, শিম্পান্জি এবং মানুষের হয়। অর্থাৎ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর-ই এই এবোলা জ্বর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কঙ্গোর একটি নদীর নামে এই রোগটির নাম রাখা হয় এবোলা। কারণ কঙ্গোর এবোলা নদীর পাড়েই এই রোগ ১৯৭৬ সালে প্রথম সনাক্ত করা হয়। চার ধরণের এবোলা ভাইরাস আছে। এর মধ্যে তিনটি মানব দেহে আক্রমন করে। এই তিনটি হচ্ছে: এবোলা জায়ের, এবোলা সুদান এবং এবোলা আইভরিকোস্ট। চতুর্থটি, এবোলা রেস্টন, মানুষ ছাড়া অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীকে আক্রমন করে। এবোলা ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ২ থেকে ২১ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করে। এবোলা জ্বরের প্রাথমিক লক্ষণগুলো হচ্ছে ঘুষঘুষে জ্বর, মাথাব্যথা, গিরায় ও জয়েন্টে ব্যথা, মাংশপেশিতে চাবানি-কামড়ানি, গলায় প্রদাহ এবং দূর্বলতা। কিছুদিনের মধ্যেই পেটে ব্যথা, বমির ভাব এবং ডায়রিয়া দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরে রাশ ওঠে, চোখ লাল হয়ে যায়, রোগী হিক্কা তুলতে থাকে এবং শরীরের বাইরে এবং অভ্যন্তরে রক্তপাত হয়। এবোলা এইচএফ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী মারা যায়। তবে দু'একজন এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখনো আবিস্কার করতে পারেননি কেন কেউ কেউ ভালো হয়ে যায় আর বেশিরভাগ রোগী মারা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে যারা ভালো হয়ে যায় তাদের শরীরে এবোলা এইচএফের সাথে যুদ্ধ করার মতো ন্যচারাল প্রতিষেধক রয়েছে। এবোলা জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে শুধুমাত্র রোগের লক্ষণের ওপর চিকিৎসা করা হয়। যেমন যখন প্রেসার কমে যায়, তখন প্রেসার বাড়ানোর অষুধ, যখন পাতলা পায়খানা হয় তখন পাতলা পায়খানা বন্ধের অষুধ দেওয়া হয়।

এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘাতকের নাম হলো ম্যালেরিয়া। প্রতি বছর ৩০ থেকে ৫০ কোটি শিশু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, যার ১ কোটি মারা যায়। এই হতভাগ্য শিশুদের সিংহভাগই আফ্রিকার শিশু। এই রোগটিও ছড়ায় আক্রান্ত মশার দ্বারা। আইভরিকোস্টের পৌনে দুই কোটি মানুষের এমন একজনও নেই যার জীবনে একবার ম্যালেরিয়া হয়নি। ম্যালেরিয়া এখন আফ্রিকানদের কাছে ডাল-ভাত। অবশ্য বেশিরভাগ আফ্রিকান এখনো মৃত্যুকেই পরোয়া করে না। আফ্রিকার যেসব দেশ গৃহযুদ্ধের আগুলে পুড়ছে, সেসব দেশের ৫ বছর বয়সী শিশুর হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিচ্ছে বাবা-মা। অস্ত্র ঠিক মতো কাজ করে কি-না এইটা পরীক্ষা করার জন্য ওরা হয়ত একজন পথচারীকেই গুলি করে দিল। যদি লোকটি মারা যায় তাহলে হত্যাকারী আনন্দে দাঁত বের করে হাসে।

আরেক নীরব ঘাতকের নাম এইডস। গড়ে আফ্রিকার ২০ শতাংশ মানুষ এইচআইভি ভাইরাস বহন করছে। কোন কোন দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ এই ঘাতক ভাইরাসে আক্রান্ত। আমার বর্তমান আবাস আইভরিকোস্টের ৪৬ শতাংশ মানুষ এইচআইভি ভাইরাস বহন করছে।

আরো কত যে অজানা রোগে ছেয়ে আছে আফ্রিকা কে জানে। সেদিন আমার এক সহকর্মী মানসুর জাহি বললো, ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে যে সন্ত্রাসীর মতো রোদ ওঠে এই রোদে কখনো হাঁটবে না। তখন আকাশ থেকে ঝরে পড়ে হাজারো রোগ-ব্যাধি। তারপরেও যখন আবিদজান থেকে গাড়ি চালিয়ে ইয়ামুসুক্রো যাই, দালোআ যাই, বুআকে যাই তখন দেখি পথের দু'পাশে নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহ। সবুজের এতো প্রাচুর্য, এতো বৈচিত্র পৃথিবীর আর কোথায় আছে। এখানে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ। সবুজের ওপরে সবুজ, তার ওপরে সবুজ আর তার ওপরে সুনীল আকাশ। আর এজন্যই বেধ হয় এতো রোগ-বালাইকে উপেক্ষা করে প্রতিদিন সৌন্দর্যপিপাসু হাজার হাজার মানুষ পাড়ি জমায় আফ্রিকায়।

আকান সম্প্রদায় ও শিশুহত্যার সংস্কৃতি

আটলান্টিকের ফেনা মাথায় নিয়ে জেগে উঠেছে আবিদজান শহর। ফরাসীরা এই শহরটিকে গড়ে তুলেছে প্যারিসের আদলে। কি নেই আবিদজান শহরে? বার, পাব থেকে শুরু করে চার ট্র্যাক রাস্তা, অসংখ্য ফ্লাইওভার, শত শত ইউরোপিয় মানের রেস্তোঁরা, নাইটক্লাব, বিশাল বিশাল গলফ ক্লাব, হাজারো সুইমিংপুল, অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ মনোরম সি-বিচ, হেলথ ক্লাব, সব মিলিয়ে নীল লেগুনের পাড়ে গড়ে ওঠা একটি সুদৃশ্য নয়নাভিরাম আধুনিক শহর।

অথচ এই আধুনিক শহর থেকে মাত্র ৩০০ কিলোমিটার উত্তরে আকান সম্প্রদায়ের শহর দাউক্রুতে এখনো শিশুহত্যার সংস্কৃতি পালিত হচ্ছে। মানুষ হত্যার সংস্কৃতি অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর নানান দেশে পালিত হয়ে আসছে। মিশরের রাজা-রাণীরা মারা গেলে তাদের দাস-দাসীদের হত্যা করে রাজা-রাণীর সাথে সমাহিত করা হতো। আমাদের উপমহাদেশে সতীদাহ প্রথার কথা কে না জানে। নরবলীর প্রচলন অতি গোপনে পৃথিবীর কোথাও কোথাও এখনো পালিত হয় বলে খবর পাওয়া যায়। আরব দেশে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে হত্যা করা হতো। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বন্ধ দরোজা খুলেছে, মানুষ ক্রমশ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের আলো ধীরে ধীরে তাড়িয়েছে এইসব নরহত্যা-সংস্কৃতির অভিশপ্ত অন্ধকার।

কিন্তু অন্ধকার মহাদেশখ্যাত আফ্রিকায় এখনো রয়ে গেছে এ জাতীয় কিছু নির্মম সংস্কৃতি। দাউক্রুর আকান সম্প্রদায় এখনো পালন করে শিশুহত্যার সংস্কৃতি। আকান সম্প্রদায়ের কিশোরী মেয়েরা ঋতুবতী হয় বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। জীবনের প্রথম ঋতুস্রাবের পর কিশোরিটিকে আকান সম্প্রদায় মহা ধুমধামে কমিউনিটির সকলের উপস্থিতিতে এক ধরণের সাদা পাথর ভেজানো পানি দিয়ে স্নান করায়। এটি একটি পুণ্য উৎসব। এই পূন্য অর্জন না করে কোন মেয়ে যদি গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলে তার গর্ভের সন্তানকে অভিশপ্ত সন্তান আখ্যা দিয়ে জন্মের সাথে সাথেই হত্যা করা হয়।

আকান সম্প্রদায়ের প্রতিটি কিশোরীকে যৌবনের কুঁড়ি মেলবার আগেই সম্প্রদায়ের সকল নারী-পুরুষের সামনে দিনের আলোতে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে হয় এই বিশেষ পবিত্র স্নানের বেদীতে। দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে হয়, দেখ আমি রক্ত ঝরাতে পারি, পুরুষের বীজ ধারণ করে জন্ম দিতে পারি আকান শিশু। আকান সম্প্রদায়ে অধিক সন্তানের জননীরা খুব সম্মানিত। যে নারীর যতো বেশি সন্তান সেই নারী ততো বেশি সম্মানিত। তবে যে কোন মায়ের দশম সন্তানকে ওরা মনে করে অভিশপ্ত সন্তান। দশম সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই তাকে হত্যা করা হয়।

আকানদের মূল আবাস ঘানায়। কথিত আছে প্রাচীনকালে অত্র অঞ্চলের সমস্ত সোনার মালিক ছিল আকান সম্প্রদায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঘানার দক্ষিণাংশে এই সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তিতে এদের একটি বৃহৎ অংশ পার্শ্ববর্তি দেশ আইভরিকোস্টের দাউক্রুতে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ঘানিয়ান এবং আইভরিয়ানরা এখনো বিশ্বাস করে আকানদের কাছে সোনার বিশাল ভান্ডার মজুত আছে। আর আকান গোত্রপতিরা বিভিন্ন উৎসব-পার্বনে আজো সারা গায়ে সোনার অলঙ্কার, সোনার মুকুট, ঘুঙুর এবং সোনার শেকল পরে রক্ষা করে চলেছে পরম্পরা। দক্ষিণ ঘানা এবং আইভরিকোস্ট সীমান্তবর্তী এলাকায় আকান সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু মৃতশিল্প এবং মেটাফোরিক টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া গেছে। এইসব শিল্পকর্মের কারুকার্য এবং আকার আকৃতি দেখে ধারণা করা হয় আকান সম্প্রদায় নেহায়েতই অশিক্ষিত কিংবা আফ্রিকার অন্য অনেক সম্প্রদায়ের মতো বর্বর ছিল না। তাদের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ছিল এবং তা বেশ উঁচুমানের। শেষকৃত্যানুষ্ঠানে ব্যবহৃত এইসব এনশিয়েন্ট মৃতশিল্প এবং মেটাফোরিক টেরাকোটা মূর্তিসমূহ ষোড়শ খৃষ্টাব্দে নির্মিত বলে অনুমান করা হচ্ছে। আকান সম্প্রদায় আজো তাদের এনশিয়েন্ট প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনসমূহের অনুকরণে শিল্পকর্ম তৈরী করছে এবং বিভিন্ন উৎসব-পার্বনে অবিকল রীতিতে ব্যবহার করছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আকান সম্প্রদায় অত্র অঞ্চলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাত ছিল। ঘানা এবং আইভরিকোস্টে বর্তমানে আকান সম্প্রদায়ের মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ।

১২ জুলাই ২০০৬। দাউক্রু থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে একটি ছোট্ট শহর, বায়াক্রু। এই শহরের একটি আঁতুরঘর থেকে ভেসে আসছে এক অসহায় মায়ের আর্তচিৎকার। আকাশে ঘন-কালো মেঘ। এক্ষুণি বন-বাঁদাড় ভেঙে নেমে আসবে ঝড়-বৃষ্টি। মাতৃত্বের কোন আনন্দ নেই শান্তালের চোখে মুখে। ও জানে যে শিশু ভূমিষ্ট হবে আজ, তার জন্য এক ফোটা দুধ নেই, এক চিলতে বিছানা নেই, এক ফোটা বাতাস নেই, আছে কেবল হত্যাকারীর উদ্যত মাশেইদ। তারপর কবরের অন্ধকার, খন্ডিত দেহ নিয়ে শুয়ে পড়বে শান্তালের নাড়ি ছেঁড়া ধন। এক অন্ধকার পৃথিবী থেকে আরেক অন্ধকার পৃথিবীর পথের যাত্রী আজ এ শিশু। আঁতুরঘরের বাইরে শান্তালের মা, বাবা, আট ভাই, চার বোন, ক'জন পড়শি আর একটি উন্মুক্ত মাশেইদ হাতে জল্লাদের মতো দাঁড়িয়ে আছে ওর বড় চাচা তুরে কোনা। আঁতুরঘর থেকে ভেসে আসছে এক নবজাতকের চিৎকার। এইমাত্র ভুমিষ্ট হয়েছে শান্তালের নাড়িছেঁড়া ধন। বেরিয়ে এসেছে অন্ধকারের ঢাকনা খুলে আলোর পৃথিবীতে। চারপাশ প্রকম্পিত করে কাঁদছে এ শিশু। ও কি টের পেয়েছে সমূহ বিপদ? আর সেজন্যই কি এই সুতীব্র চিৎকার? কি বলতে চায় এ নিষ্পাপ শিশু? এই চিৎকারের কি কোন ভাষা আছে? ও কি বলতে চাইছে আমাকে মেরো না। আমারও আছে বাঁচবার অধিকার। এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি বাঁচতে এসেছি, আমাকে বাঁচতে দাও।

দূরে, পাহাড়ের ওপরে, রাবারের বন ঢাকা পড়েছে কলো মেঘের নিচে। বাইরে অস্থিরতা। আর দেরী করা ঠিক হবে না। এই অশুভ চিৎকার যার কানে যাবে তারই অমঙ্গল হবে। অমঙ্গলের শেকড় যতো তাড়াতাড়ি কেটে ফেলা যায় ততোই ভালো। ঘন-কালো মেঘ দেখে উল্লাসে দাঁত বের করে হাসছে অপেক্ষমান আকান নারী-পুরুষ। সম্প্রদায়ের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ওরা অপেক্ষা করছে আঁতুরঘরের বাইরে। এখনি বৃষ্টি হবে। তার আগেই সেরে ফেলতে হবে পবিত্র কাজ। অশুভ রক্তের দাগ ধুয়ে নিয়ে যাবে কল্যাণের বারিধারা। এক মহাঅভিশাপ থেকে মুক্ত হবে আকান সম্প্রদায়।

দু'জন বয়স্ক আকান নারী বেরিয়ে এলো আঁতুরঘর থেকে। আর তখনি একটি বিকট গোঙানি এসে আছড়ে পড়ে বায়াক্রুর আকাশে বাতাসে। না, নিও না। শান্তালের এই আর্তি কেউ শোনে না। এমনি হাজারো আকান নারী তাদের প্রথম সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য যুগে যুগে কেঁদেছে। কেউ শোনেনি তাদের কান্না। দু'জন বয়স্ক নারীর একজনের কোলে এই অভিশপ্ত শিশু।

কে এই নারী ঝামেলা করছে বাড়ির সদর দরোজায়? না, ওকে মারবে না। আমি নেবো, আমি নেবো। ওকে আমি আবিদজান নিয়ে যাবো। ক্যাথেরিন ওর নাম। কাপড়ের ব্যাবসা করে। কাপড় বেঁচতে এসেছে বায়াক্রুতে। ক্যাথেরিনের মাতৃহৃদয় কেঁদে ওঠে। কোলে তুলে নেয় শিশুটিকে। কোলে নিয়েই বলে, এ শিশুর নাম গ্রেস। এ শিশু ঈশ্বরের আশির্বাদ।

আজ ৮ নভেম্বর ২০০৬। আমার সাথে কর্নেল দিদার। আমরা দেখতে যাই গ্রেসকে। একটি বেবিকটে শুয়ে কি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে গ্রেস, এক নিষ্পাপ শিশু। চারমাসের এ শিশুর খাটের পাশে এক পবিত্র হাসিতে উদ্ভাসিত ক্যাথেরিন। কেন আপনি এ শিশুকে বুকে তুলে নিলেন? এ রকম ক'জনের জীবন আপনি বাঁচাতে পারবেন? ক্যাথেরিনের উদ্ভাসিত হাসি ঝলমল করে ওঠে, আমি একজন আকান পুত্রবধু। আমার স্বামী ত্রোরে কারিম ছিলেন এদেশের একজন মন্ত্রী। আপনি হয়ত জানেন না আইভরিকোষ্টের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট উফুয়ে বৈগনিও ছিলেন আকান সম্প্রদায়ের মানুষ। বৈগনির মৃত্যুর পর দেশের প্রেসিডেন্ট হন হেনরি কোনা বেদি। তিনিও একজন আকান। শুধু তাই না আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শার্লস কোনান বানিও আকান সম্প্রদায়েরই মানুষ। এদের নাম এজন্য বললাম, এই সম্প্রদায়ে এতো বিখ্যাত এবং ক্ষমতাধর মানুষের উৎপত্তি সত্বেও শিশু হত্যার এই কুসংস্কার আজো বন্ধ করা যায়নি। কারণ এর শেকড় অনেক গভীরে। প্রতিটি আকানের রক্তে, মজ্জায়। আমিও কি এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি? করছি না। সেই শক্তি আমার নেই। প্রেসিডেন্ট উফুয়ে বৈগনি কিছু কাজ করেছিলেন। তিনি এরকম শিশুদের উদ্ধার করে এনে রাজপ্রাসাদে লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আইভরিকোস্টের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী দুক সাগা বৈগনির রাজপ্রাসাদে লালিত শিশুদেরই একজন। প্রেসিডেন্ট বৈগনির মতো মানুষও এই প্রথা বন্ধ করতে পারেননি।

ক্যাথেরিনের বাসা থেকে আমরা যখন বের হয়ে আসি তখন রাত দশটা। আবিদজান শহরের নাইটক্লাবগুলো এখন নিশ্চয়ই জমে উঠতে শুরু করেছে। রঙিন আলোর ফোয়ারায় ভাসছে এই শহর। হয়ত এখন দাউক্রু বা বায়াক্রুর কোন অন্ধকার গ্রামে জন্ম নিচ্ছে গ্রেস-এর মতো কোন অভিশপ্ত শিশু। আর আঁতুরঘরের বাইরে উদ্যত মাশেইদ হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক আকান পুরুষ, সভ্যতার জল্লাদ।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১০ নভেম্বর, ২০০৬

পাখিসখ্য

আজ সকালে পিয়াকাকে মুক্ত করে দিলাম।

পিয়াকা অগ্নির পোষা টিয়া পাখি। ওরা যখন তিনমাসের জন্য আবিদজানে বেড়াতে এসেছিল, অগ্নি বায়না ধরলো পাখি পোষার। পিয়াকাকে ও কথা শেখাবে, প্রবাসের নিঃসঙ্গতা কাটাতে ওরওতো একজন বন্ধু চাই। অগ্নি চলে গেছে, পিয়াকা এখন একা। দু'দিন আগে সাজাহান ভাইয়ের (সাজাহান সরদার) ই-মেইল পেলাম, পাখিবরণ উৎসবের জন্য লেখা চাই। রোজ সকালে মারকোরির বারান্দায় বসে পিয়াকার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কি লিখবো? পিয়াকাও আমার অসহায়, নিঃসঙ্গ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর কি যেন বলে চেচামিচি করে। এই টিয়া পাখিটি আমাদের দেশের টিয়া পাখির মতো না। ওর গায়ের রঙ ধুসর কিংবা অনেকটা কালোর কাছাকাছি। জালালি কবুতরের মতো। ঠোটের রঙটাও কালো। ভু-গোল বদলের সাথে সাথে শুধু মানুষেরই না, পাখিদেরও গায়ের রঙ বদলে যায়, চরিত্র বদলে যায়। যখন রিভিয়েরাতে থাকতাম তখন রোজ ভোরে আমার ঘুম ভাঙতো একদল পাখির ডাকে। ছোট ছোট পাখি। ঠিক আমার মাথার কাছে যে জানালাটা ছিল, ওটা প্রায় পুরোটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এলোমেলো বেড়ে ওঠা কতগুলো আরমেন্দা ফুলের ডালে। আরমেন্দার সরু, লম্বা পাতা আর হলুদ ফুলের রাজ্যে বসে একঝাক নাম না জানা পাখি ফর্শা হবার আগে থেকেই প্রকৃতির এক অপূর্ব টিউন বাজিয়ে আমার ঘুম ভাঙাতো। এমন মধুর, সুরেলা আর রিদমিক পাখির ডাক আমি খুব কমই শুনেছি।

এখনো আমার ঘুম ভাঙে পিয়াকার ডাকে। পিয়াকা নানান ভঙ্গিতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব সুর করে ডাকে। এক এক বেলায় ওর কণ্ঠে একেক রকমের সুর। ভোরবেলা ও আমার ঘুম ভাঙায় বেশ কর্কশ কণ্ঠে। যেন আমার স্কুলের দেরী হয়ে যাচ্ছে, ও আমার অভিভাবক, ধমকের সুরে বলছে, জলদি ওঠো। আমিও ধরফর করে উঠি। গিয়ে দেখি পানির পেয়ালাটি উল্টে ফেলে দিয়েছে অথবা বাদামগুলো খেয়ে খোসার মধ্যে পা দিয়ে খোচাখোচু করছে। বুঝতে পারি ওর ক্ষুধা লেগেছে, পিপাসা লেগেছে। আমি ওকে বাদাম দিই, পানি দিই। এইভাবে ওর সঙ্গে আমারও একটা সখ্য গড়ে ওঠে। বিকেলবেলা যখন পিয়াকা ডাকে তখন ওর কণ্ঠে ঝরে পড়ে সুমধুর সুর। এতো সুরেলা কী করে হয় টিয়াপাখির ডাক? সুরটিকে ও টেনে ওপরে তুলে তারপর আস্তে আস্তে ছাড়ে। এই সময়ে ওর ডাকের মধ্যে একটা একাগ্রতা এবং সাধনার বৈশিষ্ট ফুটে ওঠে। যেন কোন এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসে গান করছে। সামনে ওর লক্ষ লক্ষ শ্রোতা, দর্শক। আবার সন্ধ্যার পরে ও ডাকে অনেকক্ষণ পর পর। হঠাৎ একটা ডাক দেয়। সেই ডাক দ্রুতগামী গাড়ির হঠাৎ ব্রেক কষা চাকার ঘর্ষণের শব্দের মতো। শুনলে বিশ্বাসই হয় না যে এটা পাখির ডাক। এক যান্ত্রিক শব্দ বেরিয়ে আসে ওর কণ্ঠ থেকে। পাখিটার গায়ের রঙে কোন বৈচিত্র না থাকলেও ওর চরিত্রটি খুবই বৈচিত্রপূর্ণ।

অগ্নি যখন পাখিটি কিনে আনে তখন ওর মা খুব রাগ করেছিল। আমার প্রশ্রয়েই ও এটা করতে পেরেছে। অগ্নি হয়েছে আমার মতো। ছেলেবেলায় আমিও পাখিদের ওপর খুব ভালোবাসাময় অত্যাচার করেছি। বন্যাগাছের খোড়লে হাত ঢুকিয়ে চুরি করে এনেছি বালিহাঁসের ডিম। সেই ডিম মুরগীর ওমে একুশ দিন রেখে বের করে এনেছি বালিহাঁসের বাচ্চা। কতো যে বকের ছা বাঁশবন থেকে ধরে এনেছি তার কোন হিসেব নেই। প্রতি বছর কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে বার্ষিক পরীক্ষার পরে স্কুল ছুটি হলে গ্রামে চলে যেতাম। একটা লম্বা সময় গ্রামে কাটাতাম। তখন বাঁশঝাড় থেকে বকের ছা জোগাড় করতাম। ওকে মাছ খাওয়াতাম, শামুক খাওয়াতাম। গোপাটে নিয়ে গিয়ে উড়াল শেখাতাম। ক'দিন খাঁচায় রেখে তারপর ছেড়ে দিতাম। কিন্তু ততোদিনে ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যেত। ও আর কিছুতেই উড়ে যেত না। নারকেল গাছের পাতার ওপর বসে থাকতো। আমি 'আয় আয়' বলে ডাক দিলে ও এসে আমার মাথায় বসতো, কাঁধে বসতো। নানী বলতেন, এই বগায় তর চোখ নিবো। তুই কানা অবি। আমি কানা হইনি। আমার ছুটি শেষ হয়ে যেত। আমি ঢাকায় চলে আসতাম। নিষ্ঠুর মানুষেরা তখন আমার অসহায় বকটিকে কানা করে দিত। কোচ দিয়ে গেঁথে ফেলতো। সবাই জানতো এটা বাদলের বক। বুনো বক মানুষের এতো কাছে আসে না। তা সত্বেও ওরা এটা করতো। আমার কাছে খবর আসতো। বড় মামা পিঠা নিয়ে, ডোবার কৈ মাছ নিয়ে ঢাকার আসতেন। তারপর আমাকে কাছে ডেকে বলতেন, তর বগাডা নাই। হাসন মোল্লার পুতে কোচ দিয়া ধৈরা খাইয়ালাইছে। আমি তখন বাথরুমের দরোজা বন্ধ করে কাঁদতাম। কান্নার হেচকি উঠে যেত। কিছুতেই বুঝতাম না মানুষের লোভ কি করে স্নেহ-মমতাকে ছাড়িয়ে যায়। কি করে সুন্দরকে হত্যা করে কেবল খাওয়ার জন্য। ইচ্ছে হতো তক্ষুণি ছুটে যাই খাগাতুয়া গ্রামে। গিয়ে সেই হত্যাকারীর টুটি চেপে ধরি।

পরের বছর আবার গ্রামে যেতাম। আবার আরেকটি বকের ছা জোগাড় করতাম। সেটারও একই পরিনতি হতো। বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম সারাদিন। পাখিদের পিছু নিতাম। ভোরবেলা তিলা ঘুঘু ডাকতো, 'আতিথি ফু...র ফু...র' বলে। শেষ বর্ষায় 'টুব, টুব' করে ডাহুকী ডাকতো কচুরীপানার দামের ভেতর থেকে অথবা পুকুরের পাড়ে গড়ে ওঠা শত বছরের পুরোনো কোন ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর থেকে। 'পুত পুত পুত' করতে করতে কতোবার দেখেছি পুত্রশোকে আইড়াকুপিকে আঁড়ার ভেতরে ঢুকে যেতে। দোয়েল তখন শিষ বাজাতো সীমফুলের মাচায় বসে। শালিখকে আমাদের অঞ্চলে বলে

বাতল খা। আর যেটার ঠোঁট বেশি হলুদ, দেখতে কিছুটা কুৎসিত, কাচা পায়খানায় বেশি দেখা যায় খুটে খুটে পোকা খেতে, ওটার নাম গুঅল খা। বাতল খা ছিল দুই রকমের। একটার নাম চটি বাতল খা। চটি বাতল খা আকারে একটু ছোট, মাথায় চমৎকার ঝুটি। এই পাখিটা পোষ মানে এবং অতি দ্রুত মানুষের মতো কথা বলা শিখে ফেলে। বালাপাড়ার দিলা সবসময় চটি বাতল খা পুষতো। কতোদিন দেখেছি মাছরাঙা ওর রঙিন ঠোঁট নিয়ে ঝুপ করে পুকুরে ঝাপিয়ে পড়ে মাছ শিকার করছে। মাঝে মাঝে আমি পুটিমাছ দিয়ে বড়শি পাততাম শোল-বোয়াল মাছ ধরার জন্য। কতোদিন যে দুষ্টু মাছরাঙা আমার বড়শির পুটিমাছ চুরি করে খেয়েছে। পুকুরের পাড়ে মাটির গর্তে খড়-কুটো জড় করে মাছরাঙারা গড়ে তুলতো ওদের নিবাস। বড়ুই গাছে ছোট্ট টুনটুনি গড়ে তুলতো অদ্ভুত শৈল্পিক বাসা। সুলতান মিয়ার তালগাছ থেকে ঝড়ের দিনে একটা-দুইটা বাবুইয়ের বাসা খসে পড়তো। আমরা প্রতিযোগীতা করে ঝড়ের দিনে তালগাছের তলায় গিয়ে হাজির হতাম বাবুইয়ের বাসা সংগ্রহের জন্য। যে একটা বাবুইয়ের বাসা পেত আমরা তাকে বলতাম সৌভাগ্যবান। এতো শৈল্পিক বাসা এত্তুটুন পাখি কি করে বানায় আমরা এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতাম। গরুর চোচে অথবা বোয়ালিয়া বড়শির ছিপের মাথায় বসে কুচকুচে কালো ফিঙে সারাক্ষণ কি ভাবতো কখনোই বুঝতে পারতাম না। আমরা ফিঙেকে বলতাম পাখির রাজা। ও মাঝে মাঝে শিকারী চিলকেও যুদ্ধে হারিয়ে দিত। একটা কাঠঠোকরা 'পরিস্কার' খালার বুড়ো আমগাছের শরীরে ঠকঠক করে ঠুকরে ঠুকরে খোড়ল বানাতো। আর আমার নানীর ধানের খোলায় ঝাকে ঝাকে চড়ুই পড়তো দুপুরের রোদে। নানী বলতেন, বাদল চড়ুইগুলি লড়া। আমি ওদেরকে তাড়াতাম না, যতক্ষণ না নানী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন। তিনি রেগে গিয়ে বলতেন, ধুরো গোলাম, পৈখে ধান খাইয়া শেষ করলে আমরা খামু কি? হেমন্তকালে দেখতাম খুব ভোরে বাঁশবনের একেবারে চূড়ায় বসে লাউয়া ঘুঘু দম্পতি মনের সুখে 'ঘু ঘুউউউ ঘু' সুরে একেবারে নির্ভুল ছন্দে ডাকতো। কবিতায় আমি যে ছন্দ ব্যবহার করি। এই ছন্দ আমি পাখিদের কাছ থেকেই শিখেছি। পাখির চেয়ে বড় ছন্দের শিক্ষক আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

ঘুঘুর ডাকের মধ্যে আমি সবসময় একটা বিরহের সুর শুনি। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে যখন সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে মেসিডোনিয়ার রাজধানী স্কোপিয়ে গিয়ে হাজির হই। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। ঝাউগাছের ছায়াগুলো ক্রমশ লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ফসলের মাঠে। তখনো ঘুঘুর ডাক শুনেছি, অবিকল সুরে। আবিদজানেও মাঝে মাঝে ঘুঘু ডাকে। সেই একই সুর, একই ছন্দ। আর একই বিরহের আর্তি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কাক আছে। তবে সব দেশের কাকের রঙ এবং চরিত্র এক রকম না। কসোভোর আকাশে যে কাক উড়ে বেড়ায় ওরা আকারে অনেক ছোট এবং গায়ের রঙ শুভ্র-ধুসর। ওরা কখনো একা একা ওড়ে না। ওড়ে দল বেধে। যেমন আমাদের দেশে পরিযায়ী পাখিরা শীতকালে দলবেঁধে উড়ে আসে ঠিক সেই রকম। কসোভোর আকাশে বিকেলের সোনারোদে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় হাজারো কাকের ঝাঁক। কখনো মালার মতো, কখনো মেঘের মতো, আবার কখনো রঙধনুর মতো অর্ধবৃত্ত তৈরী করে উড়ে বেড়ায় ওরা। সাধারণত বিকেলের দিকেই ওদেরকে এরকম দলবেঁধে উড়তে দেখা যায়। কসোভোর কাকেদের শরীরও খুব মসৃণ এবং কাকগুলি মোটেও নোঙরায় নামে না। ওরা কা কা শব্দেও ডাকে না। ওরা ডাকে চিঁহি চিঁহি ধরণের শব্দ করে। আইভরিকোস্টের কাকগুলি আকারে বড়। দাঁড়কাকের সমান। তবে গায়ের রঙ কালো নয়। এখানকার কাকগুলি অবিকল পেঙ্গুইনের মতো। বুক এবং গলা শাদা। ডানা এবং পিঠ কালো। কোট পরা ভদ্রলোকের মতো, ওরাও দলবেঁধে চলাফেরা করে। আইভরোকোস্টের কাকদেরও আমি কখনোই ময়লার বিনে নামতে দেখিনি। বরং এখানকার ধবল বকগুলি সারাদিন শহরের ময়লার বিনগুলিতে পড়ে থাকে। আমার কাছে মনে হয় কালো মানুষের দেশ আইভরিকোস্টের প্রকৃতি শাদাদের তৈরী বর্ণবৈষম্যের শোধ নিচ্ছে এখানে। শাদা বকদের দিয়ে সাফ করাচ্ছে শহরের নোংরা আবর্জনা।

শুধু পিয়াকার ডাক নয়, বারান্দার গোলাপের ডালে, গন্ধরাজের ডালে বসে আরো অনেক পাখি ডাকে। ওপাশের বাড়িতে একটি কাজু বাদাম গাছ। ওটার ডাল থেকে রোজ বিকেলে ভেসে আসে ঘুঘুর ডাক। পান্থনিবাসের বিশাল পাতার ওপরও বসে বসে নাম না জানা কতো পাখি ডাকে। অগ্নির সে সুযোগ কোথায়? আটপৌরে ঢাকা শহরের চারদেয়ালে বন্দী ওদের জীবন। প্রকৃতির মধ্যে ওড়ে বেড়ানো মুক্ত স্বাধীন পাখির ডানায় যে স্বতস্ফুর্ততার আনন্দ তা ওরা দেখতে পায় না। তাই ওরা বন্দী পাখির খাঁচার দিকে তাকিয়ে থেকে কল্পনা করে বিস্তৃত ডানার উড়াল। এই প্রজন্মের শিশুরাও তাই নিজেদেরকে ক্রমশ বন্দী করে ফেলছে কম্পিউটারের বাক্সে। অগ্নি হয়ত শুনে কিছুটা মনক্ষুণ্ন হবে, কিন্তু আমি কিছুতেই পিয়াকাকে খাঁচার ভেতরে আটকে রেখে পাখির ওপর কিছু একটা লিখতে পারছি না।

বিকেলে বাসায় ফিরে দেখি খাচার চারপাশে ঘুরঘুর করছে পিয়াকা, সাথে ওর এক নতুন সাথী। নতুন সাথীটি বেশ হৃস্ট-পুস্ট তবে ভিতু। আমাকে দেখেই উড়ে পালালো।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১০ নভেম্বর, ২০০৬

উত্তরের জীবন

পূর্ব-পশ্চিমে একটা রেখা টেনে আইভরিকোস্টকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই রেখার নাম জোন অব কনফিডেন্স। জোন অব কনফিডেনন্স পার হওয়ার সময় গা ছমছম করে উঠলো। গত বছর এই নিষিদ্ধ সীমা লঙ্ঘন করতে গিয়ে জাতিসংঘের সৈনিকদের হাতে বন্দী হয় সরকারী মিলিশীয়াবাহিনী ইয়াং পেট্রিয়টের একটি দল। জাতিসংঘের সৈনিকরা তাদের সাথে মধুর ব্যবহার না করে যদি গুলি করে মেরেও ফেলতো তাতে কারো কিছু করার ছিল না। আইভরিকোস্টের মানচিত্রে জোন অব কনফিডেন্সকে দেখানো হয়েছে একটি শাদা রেখা হিসাবে। এর মানে হলো এটি শান্তির রেখা। এই রেখা অতিক্রমকারীই অশান্তি সৃষ্টিকারী। আমরা অশান্তি সৃষ্টিকারী না, শান্তির রক্ষক। আমরা বেড়াতে যাচ্ছি শান্তিরেখা ছিন্ন করে ঐপারে, শান্তির বারতা পৌছে দিতে।

জোন অব কনফিডেন্সের উত্তরাংশ গেরিলা নেতা গুইলামো সরোর দখলে। তাকে রাজনৈতিক সমর্থন দিচ্ছেন আইভরিকোস্টের বিদ্রোহী নেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী আলাসান উয়াত্তারা। উত্তরাংশ মূলত মুসলমান এবং অভিবাসীদের আবাসস্থল। এইসব অভিবাসীরা বেশীরভাগই এসেছে বুরকিনা ফাসো, নিজার এবং মালি থেকে। আলাসান উয়াত্তারা নিজেও হাফ বুরকিনা। তার মা ছিলেন বুরকিনা ফাসোর রাজকন্যা, যিনি ২০০৫ এর শেষের দিকে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত আইভরিকোস্টের লক্ষ লক্ষ মানুষ শোক প্রকাশ করতে নেমে এসেছিল রাজপথে। মূলত এরা সবাই মুসলমান, উয়াত্তারার প্রতি সমর্থন প্রদর্শনই ছিল এই নেমে আসার উদ্দেশ্য। দেশের সমস্ত মসজিদে বিশেষ মুনাজাত এবং ভোজসভার আয়োজন চলে সেই সময়। এতে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেন আলাসান উয়াত্তারা।

ভেবেছিলাম জোন অব কনফিডেন্স এক চিলতে একটা রেখা। সাঁই করে পার হয়ে যাবো। কিন্তু রেখাটি পার হতে গিয়ে টের পেলাম প্রায় দশ কিলোমিটার প্রশস্ত এই রেখা, যার দু'পাশে রয়েছে সুসজ্জিত চেকপোস্ট। জাতিসংঘের গাড়ি এবং ভেতরে দু'জন ইউনিফর্ম পরা সামরিক কর্মকর্তা দেখে চেকপোস্টের মরক্কান সৈনিকরা তেমন কিছুই চেক করলো না। ওরা শুধু হাত তুলে সেল্যুট ঠুকলো, জবাবে আমরাও হাত তুলে তার জবাব দিলাম। শেষ চেকপোস্টটি পার হবার

কয়েক মিনিটের মাথায়ই আরেকটি চেকপোস্ট। ভাঙা নড়বড়ে একটা কাঠ-পাতার ঘর। লাঠি হাতে ছেড়া ইউনিফর্ম পরা দু'জন সৈনিক। আমি ভেবেছিলাম বুঝি লাঠি হাতে পাগল-টাগল হবে। পাগলদের প্রধান কাজই হলো ট্রাফিক কন্ট্রোল করা। পরে বুঝলাম এরা সরোর লোক। আমাদের গাড়ি দেখে একজন গেরিলা সৈনিক দৌড়ে গাড়ির কাছে আসতে গিয়ে তার মাথা থেকে কমবেট টুপিটি খসে পড়লো। দ্বিতীয় সৈনিকটি ছুটে এসে খেলাচ্ছলে সেই টুপিতে লাথি মারলো। গেরিলা সৈনিকদের পক্ষেই কেবল এ জাতীয় আচরণ করা সম্ভব, কোন সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সৈনিকেরা কমবেট টুপি নিয়ে এরকম রসিকতা করবে বলে আমার মনে হয় না। আমরা গেরিলা নিয়ন্ত্রিত আইভরিকোস্টের উত্তরাংশে ঢুকে পড়েছি। উত্তরাংশে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পরিবর্তনের ধাক্কা লাগে। পথে-ঘাটে লোকজন খুব কম। কর্মচাঞ্চল্যের তেমন কোন আভাস নেই। মানুষ, এমন কি পশু-পাখিদের মধ্যেও তেমন কোন গতি নেই। যারা হাঁটছে, তারা হাঁটছে কি হাঁটছে না এমন একটা গতি। যেন উদ্দেশ্যহীন পথিক, কোথায় যাবে সে নিজেও জানে না। দেশের গেরিলা নিয়ন্ত্রিত অংশটির সামগ্রীক চিত্র এইসব উদ্দেশ্যহীন পথিকগুলোর মতোই। কাজ নেই, কর্ম নেই, খাবার নেই, জীবন নেই, একটা সম্পূর্ণ স্থবিরতা সর্বত্র। এই স্থবিরতা থেকে কবে যে দেশটি বেরিয়ে আসবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। মানুষের চোখে-মুখে তেমন কোন স্বপ্নের ছিটেফোটা নেই। সবাই যেন আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। হাল-বৈঠাহীন একটি নৌকা, মাঝ-দরিয়ায় ভাসছে। আর নৌকার আরোহীরা বলছে, যারে নৌকা যা, যেদিক খুশি সেদিক যা।

রাস্তার দু'ধারে এলো-পাতারি গাছপালা বেড়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও দু'পাশের নল-খাগড়া আর লতাগুল্মের দল রাস্তার ওপরে এসে এমনভাবে হামাগুড়ি দিয়ে পড়েছে যে রাস্তাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, পুরো রাস্তা গিলে খেয়েছে সবুজ গাছ-লতা। এ সময় একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। হঠাৎ হঠাৎ দু'একজন পথচারী বা সাইকেল আরোহীকে দেখা যায় হাইওয়ের একপাশ দিয়ে হাঁটছে বা সাইকেল চালাচ্ছে। গাড়ির শব্দ শুনে ওরা আচমকা কোথায় যেন উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই আছে তো এই নেই। ভূত নাকি? পরে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ওরা আসলে গাড়ির শব্দ শুনলেই পথের দু'পাশের ঘন-অরণ্যের ভেতর সুড়ুৎ করে ঢুকে যায়। এতো ঘন জঙ্গল, আস্ত একটা সাইকেল নিয়ে তার ভেতরে ঢোকে কিভাবে? সব এলাকাতেই কিছু লাগসই স্থানীয় প্রযুক্তি থাকে। এটাও তেমন একটা লাগসই প্রযুক্তি।

আরেকটা লাগসই প্রযুক্তির কথা বলি। আইভরিকোস্টের সর্বত্রই এটা দেখতে পাওয়া যায়। হাইওয়েতে গাড়ির স্বাভাবিক গতি ১৫০ কিলোমিটার। এই গতির একটা গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করা মানে ডিগবাজি খেয়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়া। বাংলাদেশী মিলিটারির একটি থ্রি-টন এই কাজ করতে গিয়েই ৬ জন সৈনিকের জীবনাবসান ঘটেছে। কিন্তু পথের ওপর যদি কোন বেরিয়ার থাকে, তাহলে কি করা যাবে? থামতেতো হবেই। সে জন্য প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই এর সঙ্কেত পাওয়া। আইভরিয়ানরা যদি কোন গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে অন্তত আধা কিলোমিটার আগে থেকেই আশ-পাশের জঙ্গল থেকে লতা-পাতা ছিঁড়ে এনে পথের ওপর দশ/বার হাত পর পর বিছিয়ে দেয়। এই সঙ্কেত এখানকার সবাই বোঝে। পথের ওপর সবুজ পাতা দেখতে পাওয়া মানে সামনে একটা বেরিয়ার আছে। কাজেই গাড়ির গতি কমাতে হবে, গাড়ি থামাতে হবে। আমরা যখন বলাবলি করছিলাম এই প্রযুক্তিটা বাঙালীদের শেখানো দরকার। দেশে কাজে লাগবে। তখনি খেয়াল হলো আমাদের হাইওয়ের দু'পাশে সবুজ বনানী কই যে পাতা ছিঁড়ে এনে সঙ্কেত দিব? শুধুতো খা খা বিরান ভূমি। অথচ ছোটবেলায় যখন পড়তাম, পৃথিবীর সবচেয়ে সবুজ দেশের নাম বাংলাদেশ। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি/সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি'। কি আনন্দেই না লাফিয়ে উঠতাম। গর্বে বুক ফুলিয়ে হাঁটতাম।

যেতে যেতে আশপাশের গ্রামগুলোর দিকে তাকাচ্ছি। বন-জঙ্গল, ফাকা মাঠ-প্রান্তর পেরিয়ে যখনি কোন লোকালয়ে এসে ওঠে হাইওয়েটি তখনি দেখি রাস্তার পাশে সুপরিকল্পিত একটি সাইনবোর্ড, তাতে লোকালয় বা গ্রামটির নাম লেখা। আমরা এখন লুকাসো নামের একটি বড় গ্রাম পার হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেকটি গ্রাম, এর নাম আল্লাকু।

আইভরিকোস্টের গেরিলা নিয়ন্ত্রিত অংশের রাজধানী বুআকে এসে যখন পৌছলাম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। সূর্য্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। বিকেলের সোনালী রোদ এসে পড়েছে কৃষ্ণচূড়ার আগুনলাগা ডালে। নেতানো বিকেলটা হঠাৎ যেন যৌবন ফিরে পেয়ে ঝকমক করে উঠছে। বুআকের পথে-প্রান্তরে, পাহাড়ের ঢালে, খাঁজে সর্বত্রই আকাশ ছোঁয়া একেকটি বৃক্ষ হাত-পা ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিশনের আঞ্চলিক সদর দফতরের কম্পাউন্ডের ভেতরেই বাংলাদেশ মিলিটারীর সিগন্যাল কোম্পানীর একটা ক্যাম্প আছে। ক্যাম্পপ্রধান মেজর মোজাক্কের আমাদের রিসিভ করার জন্য তার দলবল নিয়ে এগিয়ে এলেন। মধ্যাহ্নভোজন আমরা সেরে এসেছি ইয়ামুসুক্রো থেকে। কাজেই খাওয়া-দাওয়ের তেমন কোন ঝামেলা নেই। হাতমুখ ধুয়ে মিনিট দশেকের একটা টি-ব্রেক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বুআকে দর্শনে। এরি মধ্যে বাংলাদেশী ফর্মড পুলিশ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার এডিশনাল এসপি আশরাফ টেলিফোন করে ওর ওখানে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করলেন।

নিমন্ত্রণ গ্রহন করে আমাদের ক্লান্ত টয়োটা প্রাডো দুটোকে আবার স্টার্ট দিলাম। ছুটলাম উত্তরের দিকে। মোজাক্কেরের নেতৃত্বে আমরা এসে পৌছলাম একটি বিশাল খোলা বাজারের মতো জায়গায়। বড় বড় কয়েকটি আধা-পাকা প্রশস্ত রাস্তা। দু'পাশে শত শত দোকানের পশরা। এখানে অর্ধেক দামে সিগারেট, পারফিউম এবং নানান রকমের জুতো পাওয়া যায়। কিছুদূর এগিয়ে দেখি একটা অংশে পুরোনো জুতো এবং কাপড়ের বিরাট মার্কেট। খোঁজ নিয়ে জানলাম এর অধিকাংশই চোরাই মাল। মূলত এই সুবিশাল মার্কেটের পুরোটাই চলছে স্মাগলিং এবং চোরাই মালামালের ওপর ভিত্তি করে। লাইবেরিয়া থেকে এইসব চোরাই মাল গেরিলা নিয়ন্ত্রিত আইভরিকোস্টের বর্ডার দিয়ে ঢুকে পড়ছে। কোন ট্যাক্স-ফ্যাক্সের বালাই নেই। এটাই কি তাহলে যুদ্ধকালীন সময়ের একটি দেশের প্রকৃত চিত্র? কর্নেল খালেক দুই জোড়া জুতো কিনলেন, সবাই বেশ কয়েক কার্টন করে সিগারেট কিনে নিলেন। এতো সস্তা, নিজে খাই বা না খাই বন্ধুদের উপহার দেওয়া যাবে। এইরকম একটা অভিব্যক্তি সকলের চোখে-মুখে। আমি অবশ্য কিছুই কিনলাম না। এরপর মোজাক্কের আমাদের নিয়ে গেল আরো একটি বাজারে। ওখানে মূলত কুটির শিল্পসামগ্রী পাওয়া যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জায়গাটা বেশ খোলা আর বিরান ভূমি। বাজারের একপাশে পাতা মোড়ানো ছোট্ট একটা ন্যাড়ামুন্ডু গাছ দাঁড়িয়ে আছে। আশ-পাশে আর কোন সবুজের চিহ্নমাত্রও নেই। সারা আইভরিকোস্টেই এমন ড্রাই স্থান আমি আর দেখিনি।

একজন অশীতিপর বৃদ্ধ পাইথনের চামড়া ট্যান করছে। পাশে এক বৃদ্ধা রমনী, সম্ভবত বুড়োর স্ত্রী, কুমীরের চামড়ার ভেতরের অংশ থেকে কেটে কেটে কাঠ চাছার মতো করে চামড়ার গায়ে লেগে থাকা সাদা সাদা ফ্যাট এবং মাংস বের করছে। দু'জন ছোকরা তখন দোকানের ভেতরে, একটি সরু কাঠের মধ্যে লাগিয়ে দুই হাতে দুইদিকে টেনে সাপের চামড়া মসৃণ করছে। দলের অন্যরা এ সময়ে সাপের এবং কুমীরের চামড়ার ব্যাগ, বেল্টসহ অন্যান্য হস্তশিল্পসামগ্রী কেনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেও আমি বুড়োটার পাশে বসে পড়লাম ভিন্ন কৌতুহল নিয়ে। প্রথমত আইভরিকোস্টে বুড়ো মানুষ খুঁজে পাওয়া একটা বিরল ঘটনা। তার ওপর এই বুড়ো তৈরী করছে হিংস্র প্রাণীর চামড়া দিয়ে সুদৃশ্য, নয়নাভিরাম হস্তশিল্পসামগ্রী। শীর্ণকায়, পাঁচফুটেরও কম উচ্চতা, চিবুকে একগাছি দাড়ি, মাড়িতে কোন দাঁত নেই বুড়োর। আর্থিক দৈন্যতার চিত্রটি ওর উদোম গায়ে বেশ ভালো করেই ফুটে উঠেছে। এই মুসলিম বৃদ্ধের নাম আবুবকর। সাপ-কুমীরের চামড়া দিয়ে হস্তশিল্প তৈরী ওদের পারিবারিক পেশা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এই দোকানের কর্মচারী? বুড়ো তখন ক্ষেপে গেল। ওর ছোট্ট কালো বুকটা ফুলিয়ে জানালো ও-ই শেফ, মানে মালিক। দোকানের বাকী কর্মীরা সবাই ওর পরিবারের সদস্য। যে দুয়েকটা ফরাসী বাক্য শিখেছি, তার একটি হলো, কেল আজ এ তু? মানে, তোমার বয়স কত?

বুড়ো জানালো ৭২ বছর। শুনে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। মাসিক আয় কত হয় জানতে চাইলেই বুড়ো একেবারে চিমসে গেল। একটা ফিকে হাসি ওর মুখে, ফোকলা দাঁতের ফাঁকে। খরচপাতি বাদ দিয়ে হাজার কুড়ি সিফা, মানে বাংলাদেশী টাকায় ২ হাজার টাকা।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কোন আইন আইভরিকোস্টে আছে কি-না জানি না। তবে দেশের সর্বত্রই সাপ-কুমীরসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর চামড়া, দাঁত, হাঁড় দিয়ে তৈরী শিল্পসামগ্রী পাওয়া যায়। হাতির দাঁতের সামগ্রীর জন্যতো আইভরিকোস্ট বিশ্বসেরা। যে একগাছি হাতির দাঁতের চুরি আমি রাঙামাটিতে দেখেছি ৮/৯ হাজার টাকা, সেটা এখানে পাওয়া যায় ৪/৫ 'শ টাকায়। এইসব সামগ্রী যারা তৈরী করেন সেসব শিল্পীরাও বেশ দক্ষ, ওদের কারুকর্ম বেশ নিখুঁত। তবে এ জাতীয় শিল্পকর্মের সাথে জড়িতদের প্রায় সবাই অভিবাসী। সেনেগাল, বুরকিনা ফাসো, টোগো, নিজার কিংবা মালি থেকে আসা মুসলমানেরাই এই কাজগুলো করে। খাঁটি আইভরিয়ানদের এ জাতীয় কাজ করতে তেমন একটা দেখা যায় না। আইভরিকোস্টের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে উর্বর ভূমি আইভরিকোস্টে সুপ্রাচীনকাল থেকেই মালি, নিজার, টোগো, সেনেগাল, লাইবেরিয়া এবং ঘানা থেকে দলে দলে লোক আসতো কৃষিকাজ করতে এবং কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা করতে। আজ আইভরিকোস্টের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই মাইগ্রেটেড পপুলেশন।

সন্ধ্যার পরপরই আমরা আশরাফের এফপিইউ ক্যাম্পাসে পৌছে গেলাম। আশরাফ সাহেব আমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার সুবিশাল ক্যাম্পাস দেখালেন। লাল শাক, লাউ, করল্লা আর মুলা শাকের ক্ষেত দেখে আমরা আনন্দে আত্মহারা। কি আশ্চর্য, তের হাজার কিলোমিটার দূরে বাংলার লাউ ঝুলছে আইভরিকোস্টের মাচায়। সাবাস বাঙালী। আমগাছগুলোতে আঙুরের থোকার মতো ঝুলে আছে নানান আকার ও আকৃতির আম। শত শত আম মাটিতে পড়ে বিছিয়ে আছে, ছোবারও লোক নেই। আইভরিকোস্টে বারো মাসই আম হয়। আমের ভারে পথের ওপর নুয়ে পড়ে গাছগুলো। তবে এখানকার আমে আমাদের লেংড়া আমের স্বাদ কিছুতেই খুঁজে পাই না। আমার ধারণা যে একবার রাজশাহীর লেংড়া আম খেয়েছে তার মুখে অন্য আম আর রুচবে না। প্রচুর পেপে হয় এখানে। স্বাদের দিক থেকে অসাধারণ, ভীষণ মিষ্টি। ছোট ছোট এক প্রজাতির পেপে আছে আইভরিকোস্টে, যেগুলো শুধু মিষ্টিই না, মুখে দেওয়ার সাথে সাথে এক ধরণের সুঘ্রাণে মন ভরে যায়।

নৈশভোজার বিশাল আয়োজন। যতরকমভাবে অতিথি আপ্যায়ন করা যায় তার কিছু একটু কম করেননি আশরাফ সাহেব আমাদের জন্যে। তবে সবচেয়ে বড় চমকটি তখনো অপেক্ষা করছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের তিনি নিয়ে গেলেন একটা খোলা চত্বরে, যার একপাশে দুই ফুট উঁচু একটি অন্ধকার মঞ্চ। থিয়েটার হবে নাকি? আয়োজনটাতো সে রকমই। মঞ্চের বাতি জ্বলে উঠলো। সব ধরণের আধুনিক বাদ্যযন্ত্রসহ একটি পূর্ণাঙ্গ মঞ্চ, তৈরী হয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায়। কমান্ডার হুকুম করলেই শুরু হয়ে যাবে বাঙলা গানের এক আনন্দময় জলসা। কমান্ডার আশরাফ শুধু হুকুমই করলেন না নিজেও উঠে গেলেন এই সান্ধ্য মঞ্চে আমাদের গান শোনাতে। প্রায় দুই ঘন্টা আমরা বুঁদ হয়ে ডুবে রইলাম বাংলা সঙ্গীতের এক প্রাণবন্ত আয়োজনের মধ্যে, দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে যুদ্ধবিধ্বস্ত জনপদের এক গেরিলা নিয়ন্ত্রিত রাজধানীতে।

সেই রাতে আমি আর ঘুমুতে পারলাম না। পার্থক্যগুলো খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম উত্তর আর দক্ষিণের। দক্ষিণে দেশের সর্ববৃহৎ এবং আধুনিক শহর আবিদজান অবস্থিত। যে শহরে বসবাস করে দেশের মোট এক কোটি আশি লক্ষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। আবিদজানের মানুষ জীবনের জটিল যন্ত্রণা কাধে নিয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি। আর উত্তরের মানুষের মধ্যে নেই কোন তাড়াহুড়ো, জীবনে নেই তেমন কোন জটিলতা। সামান্য আয়ের মধ্য দিয়ে জীবন চালানোর কৌশলটা ওদের জানা। ওদের চোখে-মুখে তেমন কোন হতাশার ছাপ নেই। তেমন কোন স্বপ্নের ফেনাও নেই চোখে-মুখে। শুধু আবুবকর নয়, বুআকের রাস্তায় নামাজের আগে-পরে তিন-চারজন বুড়ো মানুষের বেশ অনেকগুলো ছোট ছোট দলই চোখে পড়লো। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসন যে এইডস প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় এবং কার্যকর পদ্ধতি, বুআকের রাস্তায় এই বুড়োদের সরব উপস্থিতি তারই একটি ইন্ডিকেটর। অপেক্ষাকৃত খ্রীস্টান অধ্যুষিত আবিদজান শহরে মাসেও একজন বুড়ো মানুষ চোখে পড়ে না। এই শহরের মানুষকে জল-বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কোন পয়সা দিতে হয় না। কে বিল নেবে? এখানে নেই কোন সুসংগঠিত অফিস, নেই কোন ব্যাংক, নেই কোনরকম আর্থিক লেন-দেনের প্রতিষ্ঠান। মাঝে মাঝে গেরিলা নেতাদের লোকজন অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। ওদের হাতে কিছু ধরিয়ে দিতে হয়। গেরিলাদের আয়ের একমাত্র প্রকাশ্য উৎসই হলো চাঁদাবাজি। অপ্রকাশ্য অনেক উৎস আছে। এই দেশের সরকারী বিরোধী দুই দলেরই শেকড় ফ্রান্সে। ফ্রান্সের এক পার্টি আইভরিয়ান সরকারকে সমর্থন করলে অন্য পার্টি সমর্থন করে গেরিলাদের। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই বৃহৎ পরাশক্তি ফ্রান্স তাদের সবচেয়ে উর্বর

উপনিবেশ আইভরিকোস্টে জিইয়ে রেখেছে রক্তক্ষয়ী সংঘাত। ফরাসী জাতীয় আয়ের ৩১ শতাংশ আসে আইভরিকোস্ট থেকে, এইরকম একটা কথা এদেশে প্রচলিত আছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা বেশ দ্রুত তৈরী হয়ে নিলাম। সময় নষ্ট করা যাবে না। আজ আমরা যাবো এখান থেকে আরো ৫০ কিলোমিটার উত্তরে, কাতিওলায়। বেশ অনেকদিন আগেই আবিস্কার করেছিলাম, এক বাংলাদেশী যুবক অনেক বছর আগে এই দেশে এসে স্থায়ী আবাস গেড়েছেন। এখন তিনি আর একা নন, ডাল-পালা বিস্তার করে শেকড় গেঁড়েছেন আইভরিকোস্টে। সেই যুবকের নাম মনির, মনিরুজ্জামান। কাতিওলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম সকাল দশটায়। সহযাত্রীরা হলেন কর্ণেল খালেক, কর্ণেল দিদার, মেজর মোজাক্কের এবং আমাদের জিআইএস ইউনিটের জহুরুল ইসলাম। মনির সাহেবের সাথে ফোনে কথা হয়েছে, তাঁর ওখানে দুপুরে খাবো। চমৎকার পিচঢালা প্রশস্ত সড়ক, সুঁইয়ের মতো সোজা। রাস্তায় তেমন খানাখন্দও নেই। গত পাঁচ বছরে এসব রাস্তায় কোন কাজ করা হয়নি। আশ্চর্য ব্যাপার, এতো স্মুথ থাকে কি করে? একটা কারণ হতে পারে যে রাস্তাগুলো তেমন বিজি না। আমরা গাড়ি চালাচ্ছি প্রায় দশ মিনিট ধরে এখনো পর্যন্ত অন্য কোন গাড়ির সাথে দেখা হয়নি। তাই বলে এতো ভালো থাকবে? ঝড়-বৃষ্টিতো হচ্ছে। যতো উত্তরে এগুচ্ছি, ল্যান্ডস্কেপ ততোই পাহাড়ি হয়ে উঠছে। পাহাড়ি রাস্তা হবার কারণে বৃষ্টির পানি রাস্তার ওপর জমে থাকে না। রাস্তা ভালো থাকার এটাও একটা কারণ। তবে কারণ যতোই থাকুক মূল কারণ একটাই, ওদের কাজের মান অনেক ভালো। কোন ফাঁকি-ঝুকি আছে বলে মনে হয় না।

পথের দুপাশে ঘন অরণ্য। তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া রাস্তা ধরে আমরা ছুটে চলেছি। সেগুন, মেহগনি, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমুল, জারুল, কাকাও, পাম, রাবারসহ আরো শত শত জাতের গাছ-গাছড়ায় সমৃদ্ধ এইসব বনাঞ্চল। আর আছে শত শত বুনো আমগাছ, পাতার চেয়ে আমের সংখ্যা বেশি। থোকা থোকা আম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমগাছগুলিকে দেখলে মনে হয়, ওরা যেন কদাচিৎ গাড়ি নিয়ে আসা পর্যটকদের মিনতি করে বলছে, দুটো আম ছিঁড়ে আমাকে ভারমুক্ত কর হে মানুষ। অনেকক্ষণ পর একটু সমতলে এসে পড়লাম। আর সাথে সাথে চোখে পড়লো একটি সুবিশাল মহিষের পাল। তাদের ভিড়ে এক রাখাল পুরুষ, মিশে আছে ওদেরই রঙের ভেতর। সমতলে নেমে আসতেই একটা দিগন্ত বিস্তৃত আনারসের মাঠ দেখতে পেলাম। আইভরিকোস্টের আনারস বিশ্বখ্যাত। আনারসকে ওরা বলে আনানা। এতো সুমিষ্ট আনানা দুনিয়ার খুব কম দেশেই উৎপন্ন হয়। এখানকার চাষাবাদ প্রক্রিয়াটিও অত্যন্ত আধুনিক। চাষাবাদের জন্য ওরা কাঠের লাঙ্গল আর গরু-মহিষ ব্যবহার করে না। ব্যবহার করে আধুনিক যন্ত্রপাতি। যে কারণে এক একটি ফসলের মাঠ মাইল মাইল দীর্ঘ এবং মাঝখানে নেই কোন ছোট ছোট আইল জাতীয় বেরিয়ার।

অরণ্যের ভেতর হঠাৎ জেগে উঠলো একটি ধূলিমলিন শহর। যে শহরের প্রায় সবগুলো দালানের রঙই হলুদ। আর হলুদ রঙটা ডুবে আছে ধুসর ধুলার আবরণের ভেতর। দালানের সংখ্যাও হাতে গোনা কয়টি, বাকী সব মাটির বাড়ি-ঘর। বিস্তীর্ণ সবুজের প্রচুর্য পেরিয়ে যখন একটি দরিদ্র গোছের কিন্তু বেশ বড়সড় লোকালয়ে এসে পৌছলাম, তখন আন্দাজ করছি আমরা কাতিওলায় এসে গেছি। সামনের গাড়ি থেকে মেজর মোজাক্কের অয়্যারলেসে জানালেন, এটাই কাতিওলা।

বাড়ির সামনে তিনটা বড় বড় আকিস গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে, বাড়ির আঙিনায় আকিস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পের বেশ বড়-সড় একটি ফ্যাক্টরি। মনির সাহেবের ছোট ভাই আমাদের রিসিভ করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। হাসিতে উদ্ভাসিত মনিরুজ্জামান বসে আছেন লিভিংরুমের হুইল চেয়ারে, পাশে তার সুন্দরী, উচ্ছল, প্রাণবন্ত স্ত্রী। খরগোশের বাচ্চার মতো সারাঘর লাফিয়ে বেড়াচ্ছে একটি ছয় বছরের শিশু, ওদের একমাত্র কন্যা। বাংলাদেশের বরগুনা জেলার অধিবাসি মনিরুজ্জামান এদেশে আসেন নব্বুয়ের দশকের গোড়ার দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পাঠ শেষ করে উন্নত জীবনের সন্ধ্যানে এক বন্ধুর হাত ধরে পাড়ি জমান কেনিয়ার নাইরোবিতে। কিন্তু ওখানে তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। এতে দমে যাননি মনির। বাংলাদেশী তৈরী পোষাকের কিছু নমুনা নিয়ে চলে যান তানজানিয়ায়। ভালোই ব্যবসা চলছিল তানজানিয়ায়। কিন্তু বিধি বাম। ওখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তাকে ব্যবসা ফেলে চলে যেতে হয়। কিছুদিন দেশে বেকারত্বের বোঝা কাধে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। তারপর আবার ফিরে আসেন কেনিয়ায়। নতুন উদ্যমে শুরু করেন গার্মেন্টস-এর ব্যবসা। এ সময়ে তাকে সহযোগীতা করেন কেনিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর ডালিম। কিন্তু তেমন একটা সুবিধা হচ্ছিলো না, কিছুতেই ভাগ্যদেবী ধরা দিচ্ছিলো না। এক সন্ধ্যায় বিষণ্ন মনির বসে আছেন নাইরোবির এক রেস্টুরেন্ট-এ। সামনের টেবিলে এক কানাডিয়ান বুড়ো। উৎসাহী মনির এগিয়ে যায়। পরিচয় হয় কানাডিয়ানের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে মনির বলে তার উচ্চাকাংখার কথা, তার সফলতা ব্যর্থতার কথা। বুড়ো দেখে এই যুবক খুব আত্মবিশ্বাসী, তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

শোন, আটলান্টিকের ওপারে জ্যামাইকাতে একটা ফল উৎপন্ন হয়, এর নাম আকিস। আমি সেই ফল প্রক্রিয়াজাত করে আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপের বাজারে বিক্রি করি। ভাল ব্যবসা, প্রচুর লাভ। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী জ্যামাইকার বাগানে ফল উৎপন্ন হয় না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি আকিসের জন্মস্থান হলো আফ্রিকার কোন একটি দেশে। অনেক বছর ধরে আমি আফ্রিকার নানান দেশে ঘুরছি কিন্তু আজো খুঁজে পাইনি কোথায় সেই আকিসের খনি। আমি নিশ্চিত এই মহাদেশেই এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শত শত মাইল এলাকা জুড়ে আছে আকিসের অরণ্য। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, উদ্যম হারিয়ে ফেলছি। তুমি কি আমার অসমাপ্ত কাজটা করবে? খরচপাতি সব আমি দেব।

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায় মনির। শুরু হয় নতুন জীবন। আকিসের সন্ধ্যানে আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এক বাংলাদেশী যুবক। ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে হাজির হয় ঘানার রাজধানী আক্রায়। ঘানার এক লোক বলে, আমি সম্ভবত আইভরিকোস্টে এইরকম গাছ দেখেছি। ব্যাস, মনির ছোটেন আইভরিকোস্টের উদ্দেশ্যে। আবিদজানে এসে তিনি এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নেন, যাবেন কোন এক হোটেলে। ড্রাইভার জানতে চায় হোটেলের নাম আর আকিস আবিষ্কারের উত্তেজনায় অস্থির মনির বলে আকিসের কথা। ড্রাইভার ছবি দেখে বলে, আমি চিনি এই গাছ। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাতে বলে মনির। রাস্তার ওপর গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে দেখাতে শুরু করে আকিসের ভিডিওচিত্র। ড্রাইভার বলে, আমার বাড়ি উত্তরে, কাতিওলায়। ওখানেই আছে এই জংলা গাছ। এই গাছের গোটা খেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। তুমি এই পাগলা গোটা খুঁজছো কেন?

তখনি, এই ট্যাক্সি নিয়েই, মনির ছোটে কাতিওলার উদ্দেশ্যে।

জীবনের এই সাফল্যের গল্প বলতে বলতে চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে মনিরুজ্জামানের। আমরা আরো জানতে চাই। এরপর কি হলো?

আমি ফোন করি সেই কানাডিয়ান বুড়োকে। ঘুরে ঘুরে আকিসের বাগান দেখি। কিছু ফল, পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ছুটে যাই নাইরোবিতে। তিনি নিশ্চিত হন, এটাই সেই ফল যা তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন বহু বছর ধরে। এরপর আমরা আবার আসি কাতিওলায়। শুরু করি এখানে আকিস প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন। প্রায় দেড় বছর ধরে ফ্যক্টরী স্থাপন করি। এরপর প্রোডাকশনে যাই।

তিনি জানান, প্রতি ক্যান আকিসের উৎপাদন খরচ পড়ে এক ডলার আশি সেন্ট, কানাডিয়ান বুড়ো তাকে দেয় দুই ডলার। এতে করে তার মাসে প্রায় ৫ হাজার ডলার আয় হয়। উৎপাদন আরো বাড়াতে পারলে আয় আরো বাড়বে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং কানাডার মার্কেটে এর রয়েছে বিশাল চাহিদা। সাপ্লাই যতো খুশী বাড়ানো যাবে, চাহিদা ব্যাপক। পাঁচ বছর আগে মনিরুজ্জামান সাহেব আইভরিয়ান সরকারের কাছ থেকে ১০০ হেক্টর জমি লিজ নিয়ে আকিসের চারা বুনেছেন। সেগুলিতে এখন ফল আসতে শুরু করেছে। এই বাগান থেকে পুরোমাত্রায় ফল আহরণ করতে পারলে ওর মাসিক আয় দাঁড়িয়ে যাবে বিশ হাজার ডলার।

মনির-সাফল্যের একটি করুণ ট্রাজেডি আছে। সবকিছু গুছিয়ে এনে তিনি যখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ঠিক তখনি তার জীবনে নেমে আসে এক অন্ধকার অধ্যায়। সেই অপয়া বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি কয়েক মাইল দূরের একটি বাগানের দিকে যাচ্ছিলেন। বৃষ্টির পানিতে ডুবে থাকা একটি গর্তে পড়ে গাড়ি উল্টে যায়। তখন থেকেই তিনি পঙ্গুত্বের শিকার। এখন তার জীবন কাটে হুইল চেয়ারে বসে। শুধু তাই না, নিজের হাতে তুলে খেতেও পারেন না। ভাবী তাকে ছায়া দিয়ে রাখেন সারাদিন। সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম, ফ্যক্টরীর তদারকী করেও স্বামীর পাশে তিনি অবধারিত এক ছায়ামানুষ।

দুপুরে খেতে বসে বহুদিন পর এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে এক প্রকৃত বাংলা খাবারের সুঘ্রান পাই। পাবদা মাছ, ইলিশের মতো এক রকমের মাছ রান্না করেছেন ভাবী কচু দিয়ে, ডাল, কয়েক রকমের ভর্তা, বেগুন ভাজা, মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘন্ট, তারপরে সবশেষে দুধভাত। খাওয়ার পরে আম-কাঁঠালের এক মহাসমারোহ।

আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম একটি গ্রাম দেখতে। সেই একই চিত্র। এই গ্রামে বিদ্যুৎ আছে কিন্তু পানি নেই। এক খা খা মরুভুমি। পানির একমাত্র উৎস কিছু গভীর কুয়ো আর দূরের নদী। কিন্তু এসব নিয়ে

তেমন পরিকল্পিত কোন ক্ষোভ নেই। এই গ্রামের শিশুরা কেউ স্কুলে যায় না। ছোট ছোট মাটির ঘর, একটার সাথে আরেকটা গায়ে গায়ে লাগানো। বাড়ির আঙিনায় আম আর পেপে ছাড়া অন্য কোন গাছ-গাছড়া নেই। আমার মনে হলো আফ্রিকার মানুষেরা বুঝি গাছপালাকে ভয় পায়। যেখানে লোকালয় সেখানে বিরাণভুমি, তাছাড়া সারাদেশ বন-জঙ্গলে ঢাকা।

একদল শিশুর সাথে কথা বললাম। জানতে চাইলাম, তোমরা আনন্দ-উল্লাস কর না? ওরা জানালো কেউ মারা গেলে উৎসব হয়, গান-বাজনা হয়, সারারাত নাচ হয়। যুবক পুরুষেরা দাঁত বের হরে হাসে এ সময়, বলে স্থানীয় মদের কথা। শেষকৃত্যনুষ্ঠানে ওরা সারারাত মদ্যপান করে মৃতের রেখে যাওয়া টাকায়। এটাই আইভরিকোস্টের ট্রেডিশন। শহরের লোকেরা এইসব না মানলেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এখনো এই ট্রেডিশন পালন করা হয়। একটি পূর্ণরাত মৃতদেহকে উঠানের মাঝখানে রেখে চারপাশ ঘিরে গ্রামবাসীরা নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় করে আর স্থানীয় চোলাই মদ পান করে। মৃতের রেখে যাওয়া টাকায় খাওয়া-দাওয়া আর মদ্যপান হয়। উত্তরাধিকারের কোন সিস্টেম এখানে নেই। ওদের মূল খাবার কাসাবা। সাথে মাছ খেতে পছন্দ করে তবে বেশীরভাগ গ্রামবাসীই জানায় মাছ তেমন একটা মিলে না। লাল মরিচের ভর্তা দিয়ে কাসাভা সেদ্ধ খেয়েই গ্রামের লোকগুলোর স্বপ্নহীন সাদা-কালো জীবন কেটে যায়। তাই বলে কাউকে অসুখী মনে হলো না। এই জীবনের বাইরেও যে একটা সুন্দর জীবন থাকতে পারে সে সম্পর্কে ওদের কোন ধারণাই নেই। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম আবিদজানে গিয়েছেন কখনো? ওরা মাথা নেড়ে জানালো, যায়নি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ওরা বলতে চাইছে আবিদজানে যাওয়া কোন জরুরী বিষয় না।

পরদিন ভোরে আবিদজানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ফিরে যেতে হবে ৪০০ কিলোমিটার পথ ড্রাইভ করে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৭ নভেম্বর, ২০০৬

হুতু তুতসি তোয়া

জ্ঞান হবার পর থেকেই শুনে আসছি হুতু এবং তুতসিদের কথা। প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার এথনিসিটি বলতে হুতু তুতসি ছাড়া আর কারো সম্পর্কে আমার তেমন কোন ধারণাই ছিল না। হুতু এবং তুতসিদের নিবাস পূর্ব আফ্রিকার ছোট্ট একটি দেশ রুয়ান্ডায়। ইগিতিকুইনোয়িনি গাছের ছায়ায়, নিয়াবারোঙ্গা নদীর তীরে বসবাস এই দুই সম্প্রদায়ের। ফরাসী কুটনৈতিক মিশনকে দেশ থেকে বহিস্কার ও ফ্রান্সের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্প্রতি হুতু-তুতসিদের দেশ রুয়ান্ডা আবার উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে।

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো রুয়ান্ডায়ও ছিল রাজতন্ত্র। রুয়ান্ডার সর্বশেষ রাজা কিগেরি-৫ এখনো বেঁচে আছেন, নির্বাসিত জীবন-যাপন করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৬০ সালে রুয়ান্ডার উপনিবেশিক প্রভূ বেলজিয়ামের ওয়ালন সম্প্রদায়ের সহায়তায় দেশের মেজরিটি জনসংখ্যা হুতু সম্প্রদায় এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করেন তুতসি রাজা কিগেরিকে। ২৬,৩৩৮ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট একটি দেশ রুয়ান্ডা। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী হলেও বাংলাদেশের সাথে তুলনা করলে তা নিতান্তই নগন্য। গড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে মাত্র ৩২৮ জন। দেশের মোট জনসংখ্যা ছিয়াশি লক্ষ।

সমতল থেকে ৫ হাজার ফুট ওপরে, ভিরুঙ্গা পর্বতশৃঙ্গের ভেলিতে, হঠাৎ সমতলে, গড়ে ওঠা লোকালয় আর অগণিত পাহাড়, নদী, অরণ্যের দেশ রুয়ান্ডার ইতিহাস মোটেও কিভু লেকের সুশীতল নীল জলের মতো শান্ত নয়, বরং পাহাড়ী নদী নিয়ারাবোঙ্গার মতো খরস্রোতা। আজ যারা রুয়ান্ডার পিগমি উপজাতি, সেই অরণ্যমানুষ তোয়া সম্প্রদায়ই ছিল এই ভূখন্ডের মূল আধিবাসী। একাদশ শতাব্দীর শুরুতে হুতুরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে তুতসিরা রুয়ান্ডায় মাইগ্রেট করতে শুরু করে। তুতসি সম্প্রদায় ছিল রণবিদ্যায় পারদর্শি। তারা অল্পদিনের মধ্যেই তোয়া এবং হুতুদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এক একটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। বর্তমান রুয়ান্ডার

প্রায় পুরোটাই অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে একটি অখন্ড তুতসি রাজ্যে পরিণত হয়। একক তুতসি মোয়ামির (রাজা) অধিনেই শাসিত হতে থাকে রুয়ান্ডা। সেই সময়েও, এবং আজো রুয়ান্ডায় হুতুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ হুতু, ১৪ শতাংশ তুতসি এবং ১ শতাংশ তোয়া। ১৮৫৩ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত তুতসি রাজা কিগেরি-৪ এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে রাজা মুতারা-২ রুয়ান্ডা শাসন করেন। এই সময়ে তুতসি রাজারা সশস্ত্র আর্মি সংগঠিত করে এবং পূর্ব আফ্রিকান করিডোর দিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করে। রাজা মুতারা এবং রাজা কিগেরি, দু'জনের শাসনামলেই অধিকাংশ বিদেশীর রুয়ান্ডায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

আমার রুয়ান্ডিজ সহকর্মী ওয়েলার্স রিভুজি কোন সম্প্রদায়ের তা আমি জানি না। তবে অনুমান করছি তিনি তুতসিই হবেন। ওয়েলার্স বলেন, বিদেশীরাই আমাদের মধ্যে এই জাতিগত সংঘর্ষের বীজ বুনে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৬) বেলজিয়ানরা রুয়ান্ডা দখল করে নেয়। বেলজিয়ামে দুটি সম্প্রদায় আছে। ফ্লেমিশ এবং ওয়ালন। এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক হুতু-তুতসিদের মতোই। ওরা কখনোই এক টেবিলে বসে চা-ও খায় না। ফ্লেমিশরা বেলজিয়ামের বনেদি গ্রুপ, ওয়ালনরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু অবহেলিত। বেলজিয়ানরা রুয়ান্ডা দখল করে দরিদ্র ওয়ালনদের পাঠাতো আমাদের দেশে বসবাসের জন্য। ওয়ালনরাই এই জাতিগত বিদ্বেষের বীজ বুনতে শুরু করে। ওরা হুতুদের উসকে দেয়। বলে তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ দেশের রাজা তুতসি, এটা অন্যায়। ১৯৬০ সালে তুতসি রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে হুতুরা দেশের ক্ষমতায় চলে আসে। এসময় রাজা কিগেরি-৫ এর সাথে প্রায় এক লক্ষ তুতসি দেশ থেকে পালিয়ে যায়। আর বেলজিয়াম তাদের দোসর হুতুদের কাছে ক্ষমতা দিয়ে ১ জুলাই ১৯৬২ সালে রুয়ান্ডাকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের মর্যাদা দিয়ে দেয়। হুতু নেতা কায়িবান্দা ১৯৬২ সালে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে তিনি ১৯৬৫ এবং ১৯৬৯ সালে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট কায়িবানা তার সময়কালে প্রচুর তুতসি হত্যা করেন। তুতসিরা এ সময়ে ধীরে ধীরে উগান্ডা, কঙ্গো, তানজানিয়া এবং বুরুন্ডিতে পাড়ি জমাতে থাকে।

পালিয়ে যাওয়া তুতসিরা গেরিলা বাহিনী তৈরী করে এবং বিভিন্ন সময়ে রুয়ান্ডায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালায়। ১৯৭১-৭২ সালে উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইদি আমিনের সাথে রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট কায়িবান্দার সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। প্রেসিডেন্ট কায়িবান্দা অভিযোগ করেন, ইদি আমিন তুতসিদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে হুতুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। ১৯৭৩ সালে আভ্যন্তরীন তুতসিদের সাথে হুতুদের আবার যুদ্ধ শুরু হয় এবং ৬০০ তুতসি গেরিলা এ সময় উগান্ডায় পালিয়ে যায়। ১৯৭৩ সালের ৫ জুলাই সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপ এক সফল সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কায়িবান্দাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং মেজর জেনারেল জ্যুভেনাল হাবিয়ারিমানাকে ক্ষমতায় বসায়, যিনি ছিলেন বেশ মডারেট হুতু। ১৯৭৮ সালে দেশের সংবিধান সংশোধন করা হয় এবং জেনারেল হাবিয়ারিমানা তার ইউনিফর্ম খুলে গণতন্ত্রের লেবাস পরে ফেলেন এবং নির্বাচনের বৈতরণী পেরিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে ১৯৮৩ এবং ১৯৮৮ সালের নির্বাচনেও তিনি পুনর্নির্বাচিত হন। তার সময়কালে ৫০ হাজারেরও অধিক তুতসি শরণার্থি উগান্ডা এবং বুরুন্ডি থেকে দেশে ফিরে আসে।

দুই বছর পর তুতসি রিফিউজিদের গেরিলা বাহিনী রুয়ান্ডান পেট্রিয়টিক ফ্রন্ট (আরপিএফ) উগান্ডার সহযোগীতায় দেশের ভেতরে ঢুকে পরে এবং রুয়ান্ডার ক্ষমতার অংশিদারিত্ব দাবী করে। ১৯৯৩ সালে হাবিয়ারিমানা তুতসিদের সাথে ক্ষমতার অংশিদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এরপর তুতসিরা ক্রমশ ভায়োলেন্ট হতে শুরু করে এবং রাজধানী কিগালিতে বিশাল ডেমোনেসট্রেশন করে। হাবিয়ারিমানা শান্তি প্রতীষ্ঠায় প্রাণান্তকর চেষ্টা চালান। আঞ্চলিক সহযোগীতার আহবান জানান, আমন্ত্রণ জানান জাতিসংঘকে একটি শান্তিমিশন স্থাপনের।

সত্তরের দশকের ক্রাইসিসের সময় রুয়ান্ডিজ সরকার ফরাসীদের আমন্ত্রণ জানায় সহযোগীতার জন্য। তখন হুতু সরকারের ধারণা ছিল আমেরিকা তুতসিদের অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তখনি ফরাসীরা রুয়ান্ডায় ঢুকে পড়ে এবং একটি সেমি-উপনিবেশ গড়ে তোলে। ফরাসীরা এ সময় সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ইন্তেরাহাম নামের একটি সরকারী মিলিশিয়াবাহিনী তৈরী করে। এই বাহিনীর একমাত্র কাজই ছিল তুতসি নিধন।

৬ এপ্রিল ১৯৯৪। কিগালি বিমানবন্দরে ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছে হাজার হাজার মানুষ। হুতু-তুতসি সংঘাতের অবসানকামী দুই নেতা, রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট হাবিয়ারিমানা এবং বুরুন্ডির প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমানটি কিগালির রানওয়ের মাটি ছুঁয়েছে। একি! গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে কেন? কোত্থেকে এই গুলি আসছে? এতো সুরক্ষিত, সুনিরাপত্তা নিশ্চিতকৃত বিমানবন্দরের রানওয়ের ভেতর! হতভাগ্য বিমানটি মুখ থুবড়ে পড়লো আর জীবনাবসান ঘটলো দুই প্রেসিডেন্টের। সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ঘি পড়ে। জ্বলে ওঠে হুতুরা। আর এক মুহূর্তও নয়। নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে তুতসি

হারামীদের। এ কাজ ওরাই করেছে। জ্বলে ওঠে বুরুন্ডিও। এ নিশ্চয়ই তুতসিদের কাজ। আমাদের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করেছে। কিন্তু এতো কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে বিমানবন্দরের রানওয়েতে তুতসি গেরিলারা এলো কি করে? আর ওরা গেলই বা কোথায়? একজনওতো ধরা পড়লো না। নিকটতম তুতসি ঘাটি দেড়'শ কিলোমিটার দূরে। তাহলে কি অন্য কেউ? কোন বিদেশী শক্তি? সিআইএ অথবা ফ্রান্স? হতে পারে। সন্দেহ সন্দেহই থেকে যায়।

বুগেসেরা, নিয়াম্মাতা গ্রামের সহজ সরল নিরপরাধ তুতসি মেয়েরা, ছেলেরা, বুড়োরা সারাদিনের কাজ-কর্ম সেরে মাত্র ঘরে ফিরেছে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে হয়ত একসঙ্গে খেতে বসেছে। হয়ত কোন কর্মজীবি মা সারাদিন পর তার আদরের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। হয়ত কোন নববিবাহিত দম্পতি দিনের শেষে দু'জন দু'জনকে কাছে পেয়ে আদরে-আলিঙ্গনে মনের কথাটি বলছে। কেউ কি জানালায় চোখ রাখলো? কেউ কি চিৎকার করলো? উঠানের ছাগল-ভেড়ার পালটি অমন সমবেত স্বরে চিৎকার করছে কেন? কুকুর অমন অলুক্ষুণে সুরে আর্তনাদ করছে কেন? চাকার ঘর্ষণের শব্দ খুব কাছে এসে থামে। কে এলো? শত শত রাইফেল, মেশিনগান গর্জে ওঠে। যে যেখানে ছিল, ওখানেই। গগনবিদারী চিৎকার ওঠে বুগেসেরার আকাশে, নিয়াম্মাতার আকাশে। ইগিতিকুইনোয়িনি গাছের ডাল থেকে উড়ে পালায় শত শত নীড়ে ফেরা পাখি। লাল রক্তের স্রোতে গতিময় হয়ে ওঠে নিয়াবারোঙ্গা নদী। শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে নিয়াবারোঙ্গা তুতসিদের রক্তকে পৌছে দেয় মিশরের নীল নদে, প্রাচীন সভ্যতার কোলে।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ৮ লক্ষ তুতসি ও কিছু মডারেট হুতু নিধন করে কট্টর হুতুরা মাত্র ১০০ দিনের মধ্যে। ১৯৯৪ সালের ৪ জুলাই নির্বাসিত তুতসি গেরিলা নেতা জেনারেল কাগামের নেতৃত্বে সকল তুতসি দেশে ফিরে আসে, ৩৪ বছর পর আবার তুতসিরা রুয়ান্ডার ক্ষমতা দখল করে নেয়। কাগামের দৃঢ় ঘোষণা, আর নয় হত্যাযজ্ঞ। যা হবার হয়েছে, এখন থেকে হুতু-তুতসি ভাই ভাই। সেই থেকে কাগামেই রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট।

কিন্তু এখন সমস্যাটা কি নিয়ে? এই যে তোমরা ফরাসী মিশনকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে? শুধুতো মিশন না, তোমাদের প্রেসিডেন্ট আদেশ দিয়েছেন, রুয়ান্ডায় একজন ফরাসীও আর থাকতে পারবে না। এর কারণ কি?

শোন, আমাদের প্রেসিডেন্ট অ্যাংলোফোন, তিনি ফরাসী ভাষা বলেন না, ফরাসীদের তেমন পছন্দও করেন না। ৯৪-এর জেনোসাইডে যে এক মিলিয়ন তুতসিকে হত্যা করা হয় এর পেছনে ফ্রান্সের ভূমিকা ছিল। এ বিষয়ে একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের দায়িত্ব হলো তদন্ত করে বের করা এই মেসাকারে ফ্রান্সের ভুমিকা কতখানি। ফ্রান্স এতে ক্ষেপে যায়। কিছুদিন আগে তড়িঘড়ি করে একটি ফরাসী আদালত ৯৪-এর জেনোসাইডের জন্য প্রেসিডেন্ট কাগামেকে দায়ী করে তার বিরুদ্ধে একটি ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্ট ইস্যু করে। কত বড় সাহস দেখেছো? মামলার রায় দেন ফরাসী জাজ জ্যাঁ লুইস ব্রুগুইয়ের্খ। প্রেসিডেন্ট কাগামে নিজেই একজন তুতসি। তিনি কি করে তুতসি হত্যা করেন? এটাতো পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

রুয়ান্ডায় কোন দূর্নীতি নেই। অফ্রিকার সবচেয়ে সভ্য জাতি রুয়ান্ডা। এখন আমাদের নিরাপত্তাজনিত কোন সমস্যাও নেই। আর হুতু-তুতসি সমস্যাও মিটে গেছে। আমরা অর্থনীতির মহাসড়কে এক দ্রুতগামী ট্রেন। এগিয়ে যাচ্ছি সাফল্যের শিখড়ে। কথাগুলো বলতে বলতে ওয়েলার্সের চোখে পানি এসে যায়। ও তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে বাইরে, দূরের আকাশের দিকে। যেন গলা বাড়িয়ে দেখতে চাইছে ওর প্রিয় মাতৃভূমি রুয়ান্ডার মেঘমুক্ত স্বচ্ছ নীল আকাশ। যে আকাশে কোন শকুণ নেই, আছে শত শত শান্তির পায়রা।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৮ নভেম্বর, ২০০৬

আইভরিকোস্টে সরকার-গেরিলা সমঝোতা, শান্তির নতুন ইতিহাস

একঝাক মুনিয়া পাখি বিদ্যুতের তারে সমবেত কিচির মিচিরে সকালের আলো ফোটাচ্ছে। জার্মান বুড়ো উইলফ্রেডের সাথে ছন্দময় গতিতে আমার প্রাথঃভ্রমণ শুরু। ঝিরিঝিরি হাওয়ায় কাঁপছে পান্থনিবাশ পাতার বৃত্ত। রাতে খুব গরম পড়েছিল। সকালের এই মিষ্টি হাওয়াটা শরীর ও মনে এক চনমনে ভাব জাগিয়ে তুলছে। মারকোরির সাহেব-সুবোদের এখনো ঘুম ভাঙেনি। একদল সুইপার শহরের রাস্তা ঝাড়ু দিতে দিতেই যেন অন্ধকার তাড়াচ্ছে। ধনি লোকদের গেটের সামনে বাড়ির নৈশপ্রহরীরা কানে রেডিও লাগিয়ে তন্ময় হয়ে কি যেন শুনছে। খবর হচ্ছে হয়ত। কিন্তু রোজইতো হাঁটি। আর কখনোতো ওদেরকে এতোটা মনযোগী হয়ে রেডিও শুনতে দেখি না। মনে হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছে। যে কোন সময় মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ কোন ধ্বংশযজ্ঞের খবর শুনে উল্লাসে লাফিয়ে উঠবে। ফরাসী ভাষায় রেডিওতে কথা বলছে এক পুরুষকণ্ঠ। মাথামুন্ডু কিছুই বুঝছি না। উইলফ্রেডকে জিজ্ঞেস করি, কি শুনছে? উইলফ্রেড বললো, তুমি জানো না, বাগবো এবং সরো চুক্তি সই করে ফেলেছে। তোমরা এখন নো-বডি।

গতকাল সন্ধ্যায় আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিটিতেও বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়। চুক্তি সই হয়েছে শুনেছি কিন্তু কি চুক্তি সই হয়েছে কিছুই জানতে পারিনি। আইভরিকোস্ট কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর অংশের নিয়ন্ত্রক গেরিলা নেতা গুইলামো সরো আর দক্ষিণ অংশের নিয়ন্ত্রণ প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবোর হাতে। সাপে-নেউলে সম্পর্ক দুই গ্রুপের মধ্যে। যখন-তখন অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু হয়ে যায়। পূর্ব-পশ্চিমে একটি লম্বা রেখা টেনে দেশকে দুই ভাগ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। এই রেখার নাম 'জোন অব কনফিডেনস'। বন্দুক হাতে জোন অব কনফিডেন্স পাহারা দিচ্ছে জাতিসংঘের সৈনিকেরা। এই দলে বাংলাদেশের তিন হাজার সৈন্যও রয়েছে। বিভক্তির এই নির্মম দেয়াল তুলে দেওয়া ছাড়া রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ থামানোর আর কোন উপায় ছিল না। ২০০৪ এর ডিসেম্বরে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। বাগবো ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ, তাই নির্বাচন হয়নি। জাতিসংঘ, আফ্রিকিয় ইউনিয়ন, ইওরোপিয় ইউনিয়ন সবাই মিলে ঠিক করে, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা প্রয়োজন। ২০০৫-এর মার্চ মাসে সাবেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণর চার্লস কোনান বেনিকে ডেকে আনা হয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য। বাগবোই প্রেসিডেন্ট। তবে দেশের নির্বাহী প্রধান করা হয় প্রধানমন্ত্রীকে। সেটা কেবল কাগজেই। কোনান বেনি হলেন কাগুজে বাঘ। সেই কাগুজে বাঘকেও কিছুদিন পর বাগবো আর সহ্য করতে পারছিলেন না। কথা ছিল ছয়মাসের মধ্যে গেরিলাদের নিরস্ত্রীকরণ এবং ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে এই অন্তবর্তিকালীন সরকার একটি গ্রহনযোগ্য নির্বাচন উপহার দিবে। কিন্তু এক বছর হয়ে গেল নির্বাচনের কোন নাম-গন্ধও নেই। নির্বাচনের কথা তুললেই বাগবোর মাথাগরম হয়ে যায়।

কিছুদিন আগে সকল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লরেন্ট বাগবো সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানান গেরিলা নেতা গুইলামো সরোকে। সংলাপ চলে বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায়। দীর্ঘ দুই সপ্তাহ সংলাপের পর গতকাল (৪ মার্চ, ২০০৭) দুই পক্ষ চুক্তি সই করে ফেলে। এটা আইভরিয়ানদের জন্যতো একটা ব্রেকিং নিউজই বটে। সংলাপের কপি আজ স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বাগবোর মূল উদ্দেশ্য হলো, বিশ্ববাসীকে নিজের উদারতা দেখিয়ে ক্ষমতায় ঝুলে থাকা। সরকার ও গেরিলা নেতার মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তি মতে লরেন্ট বাগবোই প্রেসিডেন্ট থাকবেন পরবর্তি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত। আর গেরিলা নেতা গুইলামো সরো হবেন দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী। সরোতো দারুণ খুশি। আগামী নির্বাচনেরও একটি সম্ভাব্য সময় তারা ঠিক করেছে, তা হলো জানুয়ারী ২০০৮। এরপর জাতিসংঘকে আইভরিকোস্ট ছাড়তে হবে। ভিনদেশী শক্তি কেন আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে, আমাদের সমস্যা আমরাই সমাধান করবো। দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধের এই পারাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন বাগবো।

এখন কথা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোনীত এবং সকল পক্ষ কতৃক গৃহীত একজন প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন দেশে। তিনি চার্লস কোনান বেনি। তাকে কিভাবে সরিয়ে গুইলামো সরোকে প্রধানমন্ত্রী করবেন লরেন্ট বাগবো? বেনি কি তাহলে আপোষেই সরে যাবেন? সেটাই এখন দেখার বিষয়। যদি সত্যি সত্যি বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে আইভরিকোস্ট সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে বিশ্ববাসীর কাছে এটা হবে এক নতুন দৃষ্টান্ত। কনফ্লিক্ট রেজুলেশনের এক নতুন ইতিহাস রচিত হবে আইভরিকোস্টের মাটিতে, যা বিশ্ববাসীর কাছে হবে অনুকরণীয়।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৫ মার্চ, ২০০৬

ঘানা জাতির ৫০ বছর পূর্তি

গেজিবো, আমাদের ছনের ঘর। আসলে ঘর না বলে বোধ হয় বলা উচিত ছনের ছাউনি। সুবিশাল ছাউনি, একসঙ্গে তিন/চার'শ লোকের সমাবেশ ঘটানো যায় এর নিচে। চারপাশ খোলা তবে কোমর সমান উঁচু কারুকার্যখচিত কাঠের রেলিঙ রয়েছে গেজিবোর চতুর্দিক ঘিরে। ফ্লোরে সুদৃশ্য টাইলস বসানো। একটি পরিচ্ছন্ন জলসাস্থল। আজ ৬ মার্চ, ২০০৭। গেজিবোতে মিলন মেলা বসেছে ঘানিয়দের। আজ ঘানা জাতির পঞ্চাশ বছর পূর্তি হলো। ত্রুটিহীন সুবর্ণ জয়ন্তির আয়োজন।

তখনো ঝকঝকে আকাশ ছিল, সকালের উজ্জ্বল সূর্যের দ্যুতি গলে গলে পড়ছে লেগুনের নীল জলে। তিন ঘানিয় কৃষ্ণ সুন্দরী আর এক যুবা পুরুষ, এবনি কাঠের মতো যার পেশিল বাহু, গেয়ে উঠলো, 'আই প্রোমিজ অন মাই অনার/টু বি ফেইথফুল এন্ড লয়াল/টু ঘানা মাই মাদারল্যান্ড।/আই প্লেজ মাইসেলফ টু দি সার্ভিস অব ঘানা,/ইউথ অল মাই স্ট্রেংথ এন্ড উইথ অল মাই হার্ট।/আই প্রোমিজ টু হোল্ড ইন হাই এস্টিম আওয়ার হেরিটেজ,/ওন ফর আস থ্রু দি ব্লাড এন্ড টয়েল অব আওয়ার ফাদার্স;/এন্ড আই প্লেজ মাইসেলফ ইন অল থিংস/টু আপহোল্ড এন্ড ডিফেন্ড দি গুড নেইম অব ঘানা।/সো হেল্প মি গড।' আর তখনি আকাশ কেঁদে উঠলো। আনন্দাশ্রু বর্ষিত হলো আবিদজানের মাটিতে। এটা কি আয়োজিত ছিল? এই বৃষ্টি? কে একজন বলে উঠলো পেছন থেকে। না, প্রকৃতি আজ ঘানিয়দের সাথে একাত্ম হয়ে এই আনন্দের সলিল ধারায় ধুয়ে নিচ্ছে ওদের সব দুঃখ কষ্ট, হিংসা-দ্বেষ। এ কথাই বললেন আইভরি কোস্টে নিয়োজিত ঘানার রাস্ট্রদূত জনাব আমিহির।

ভুট্টার মদ আসানা'র গ্লাস হাতে নিয়ে চিয়ার্স করলাম আমরা, ঘানা দীর্ঘজীবি হোক। পোক পোক করে ঘানিয় বিয়ার মাল্টা'র ছিপি খুলছে। গেজিবোর ঠিক মাঝখানে, একটি বিশাল টেবিলের ওপর সাজানো আছে নানান রকম আন্তঃমহাদেশীয় খাবারের পাশাপাশি বিশুদ্ধ ঘানিয় খাবার, কাকলো আর ইয়াম্বো। পাকা কলা কচলিয়ে তার সাথে স্থানীয় মশলা এবং চিনি মিশিয়ে তেলে ভাজা বড়ার নাম কাকলো। আর ইয়াম্বো হচ্ছে মুগুড়ের মতো আকৃতির এক ধরণের কালো রঙের শেকড়, যার নাম ইয়াম, সাথে স্থানীয় মশলা এবং ঘি মিশিয়ে তৈরী করা রসগোল্লার মতো এক একটি বল। তিন আকারের বল সাজানো আছে টেবিলে। আমি বড়সড় দেখেই একটি তুলে নিলাম প্লেটে। সাথে দুটো কাকলো। অন্য কোন খাবারে আমার তেমন কোন আগ্রহ নেই। বেলা এগারোটা সময় কি অতো কিছু খাওয়া যায়, ওই যে ওইসব, ফ্রাইড চিকেন, ফিশ কাটলেট, আইভরিয় খাবার কুসকুস আর আলুকো? একটি কোকের বোতল হাতে নিয়ে বক্তৃতা শুনতে শুরু করলাম। আজ মঙ্গলবার, বেলা এগারোটা বাজে। পুরোদমে অফিস চলছে, ভীষণ কর্মব্যস্ত সময়, অথচ ঘানিয়রা এই সময়ে আয়োজন করেছে সুবর্ণ জয়ন্তীর ককটেল পার্টি। শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন সবাই? অন্য আর সকল অফিসের সাথে এখানেই ব্যতিক্রম জাতিসংঘের, বিশেষ করে শান্তিরক্ষা মিশনগুলোর। এখানে শত দেশের শত জাতির লোক কাজ করে। প্রত্যেকের কাছেই তার জাতীয় দিবস অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এর সাথে নানান রকম আবেগ অনুভূতি জড়িত। তাই জাতিসংঘ এই দিবসমূহ পালনের জন্য প্রতিটি কর্মীকেই উৎসাহিত করে। প্রতিটি কর্মী-সদস্যই বছরের এই বিশেষ দিনটিতে নিজের জাতীয় দিবস পালনের জন্য বিশেষ ছুটি নিতে পারে। আরো একটি বিষয় আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা আছে যার যার জাতীয় পোশাক পরে অফিসে আসার, যদি না কোন কারণে বিশেষ ড্রেস কোডের বিধান থাকে। প্রতিদিন ভোরে যখন সেব্রোকোর বিশাল হলরুমটিতে ঢুকে লিফটের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, দেখি কত দেশের মানুষ, কতো রকম তাদের পোশাক ও চুলের স্টাইল আর তখনি মনে হয়, এই হলো আমাদের জাতিসংঘ।

খুব গরম পড়েছে এখন। সূর্যদেবতা খাড়া মাথার ওপর। এক পশলা বৃষ্টি হয়েই আকাশটা যেন আগের চেয়ে আরো বেশি ঝকঝকে হয়ে উঠলো। দাবদাহের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে মাঝে মাঝে শিমুল গাছের পাতা উড়িয়ে বাতাসের ঝামটা এসে গায়ে লাগে। তখন অনুভব করি বেহেশতের আরাম। ঘানিয় সহকর্মীরা গেজিবোকে সাজিয়েছে বিয়ের দিনের মতো করে। দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওদের মানচিত্র। শুধু কি তাই, প্রতিটি ঘানিয় নারী-পুরুষ পরেছে সাদায়-সবুজে মেশানো টি-শার্ট, যার বুকে পতাকা আর পিঠে মানচিত্র। ওদের মানচিত্রটির দিকে তাকিয়েই মনে পড়লো পুরো পশ্চিম আফ্রিকার মানচিত্রগুলোর কথা। প্রতিটি দেশেরই, কারো দক্ষিণে আর কারো পশ্চিমে, আটলান্টিকের সাথে রয়েছে জলসীমান্ত। দেখে

মনে হয় নাইজেরিয়া, বেনিন, টোগো, ঘানা, আইভরিকোস্ট, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিয়ন, গিনি, গিনি বিসাউ, গাম্বিয়া, সেনেগাল এবং মৌরিতানিয়া, পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশগুলো যেন এক একটি শান্ত গিরগিটি আটলান্টিকের জলে মুখ দিয়ে চুকচুক করে পানি পান করছে। এর মধ্যে নাইজেরিয়া, মৌরিতানিয়া আর গিনি ছাড়া বাকী দেশগুলো দেখতেও গিরগিটিরই মতো। যারা এই দেশগুলোর সীমানা নির্ধারণ করেছেন তাদের বিচক্ষণতার তারিফ করতে হয়। একটি দেশকেও জলবঞ্চিত করা হয় নি। হয়ত দেশগুলোই এই বিষয়ে সোচ্চার ছিল সীমানা নির্ধারণের কালে।

ঘানিয়দের পার্টিটি বড় অদ্ভুত। একজন বক্তৃতা করলো, তারপর গান বাজনা চলছে, খাওয়া দাওয়া চলছে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আবার ঘোষণা, এবার বক্তৃতা করবেন.....আবার গান বাজনা, খাওয়া-দাওয়া, আবার হঠাৎ বক্তৃতার ঘোষণা। এবার আমাদের মিশনের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা ওয়ালেস ডিভাইনের পালা। ওয়ালেস ক্যামেরুনিয় হলেও আমেরিকায় সেটলড। তিনি প্রথমেই বললেন, ঘানিয়দের ধন্যবাদ কফি আনানের মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব উপহার দেবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে করতালিতে ফেটে পড়লো সবাই। বুঝতে পারলাম এই মানুষটির জনপ্রিয়তা ঘানায় পর্বতপ্রমাণ। কফি আনান নিজেও তা জানেন কিন্তু এই জনপ্রিয়তার মূল্য কতখানি দেন এটাই হলো ভাববার বিষয়। শুনেছি অবসর গ্রহনের পর তিনি তার শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীকে নিয়ে ইউরোপে বসবাস করছেন। ঘানার অর্থনৈতিক অগ্রগতি গত ৫০ বছরে আশানুরূপ হয়নি। এর পেছনে কারণ একটাই, দূর্নীতি। ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশ ঘানায় মাত্র সোয়া দুই কোটি লোকের বাস। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক বাস করে ৯৪ জন। আফ্রিকার অন্যান্য অংশের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি ঘানায়। এর মূল কারণ হলো গত ৫০ বছরে ঘানায় তেমন কোন জাতিগত দ্বন্দ্ব সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি। হয়নি কোন গৃহযুদ্ধ। সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলো হচ্ছে আক্রা, কুমাসি, তেমা, তামালে এবং সেকোন্দি। বিভিন্ন এথনিক দল ও উপদলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘানার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এসব এথনিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে আদাঙবে, আকুয়াপেম, আকিয়েম, আশান্তি, বোনো, দাগোম্বা, এওয়ে, ফন্তে, গা, গঞ্জা, কোয়াহু, মাম্প্রুসি এবং জিমা। সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ ঘানার দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজী হলেও আকান, জিমা, দাগবানে, গা, এওয়েসহ অন্যান্য আফ্রিকিয় ডায়ালেক্ট এবং গোত্রভিত্তিক ভাষা প্রচলিত। অন্যান্য পশ্চিম আফ্রিকিয় দেশের মতো ঘানায়ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম হলো ইসলাম। শতকরা ২০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। ধর্মহীন মানুষের সংখ্যাও কম নয় একেবারে। ২৪ শতাংশ লোক ধর্মহীন বা বিভিন্ন আদিধর্মের অনুসারী। আমাদেরকে যে পরিসংখ্যানটি বিস্মিত করে তা হচ্ছে, মোট জনসংখ্যার ৭৭ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। অথচ মাথাপিছু আয় মাত্র ৪১০ ডলার। ঘানায় দূর্নীতি আছে বটে তবে জনগণের মধ্যে তেমন অসন্তোষ নেই। এর বড় কারণ হলো বেকারত্বের সংখ্যা মাত্র ৯ শতাংশ।

আমাদের ঘানিয় সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ওদের দেশে সম্পদ ও কর্মের সুষম বন্টনের বিষয়টিকে তুলে এনে আবারো দেশপ্রেমিক ঘানিয়দের উদ্দেশে গেয়ে উঠলেন, ‘আই প্রোমিজ অন মাই অনার/টু বি ফেইথফুল এন্ড লয়াল/টু ঘানা মাই মাদারল্যান্ড।’

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৪ মার্চ, ২০০৭

বাংলাদেশ হাউস, আমাদের আপন ঠিকানা

গতকাল দিনটি ছিল অন্যরকম।

আইভরিকোস্টে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের বয়স তিন বছর পেরিয়ে গেছে, সেই সাথে আমাদের, মানে বাংলাদেশের, উপস্থিতিও। অনেকদিন ধরেই আলোচনা চলছিল, আইভরিকোস্টের রাজধানী আবিদজানে একটি ‘বাংলাদেশ হাউস’ করা যায় কিনা। প্রায় বছর দেড়েক আগে এই প্রস্তাবটি নিয়ে আমার সাথে কথা বলেন বাংলাদেশ নেভির কমান্ডার বদরুদ্দোজা চৌধুরী। আসলে যে কোন প্রস্তাবের উদ্ভব হয় প্রয়োজন থেকে। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর তখন কর্মক্ষেত্র ছিল আইভরিকোস্টের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় শহর সান পেদ্রোতে। অপূর্ব প্রাকৃতিক লীলা-বৈচিত্রের শহর সান-পেদ্রো। একদিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে আকাশে, অন্যদিকে বুনো আটলান্টিকের ফেনা ছোবল মারছে পাহাড়ের পায়ে। লম্বা উইক-এন্ড পেলেই আমরা ছুটি কাটাতে বেরিয়ে পড়ি সান-পেদ্রোর সৈকতে। সুন্দর দূর থেকেই সুন্দর। সুন্দরের ভেতরে

অবস্থান করে সুন্দরকে উপভোগ করা যায় না। তখন সকল সৌন্দর্যই ম্লান, একঘেয়ে হয়ে আসে। সান পেদ্রো আমাদের কাছে যতোই সুন্দর মনে হোক, বদরুদ্দোজার কাছে তা কেবলই একাকীত্বের একঘেয়েমী। তাই তিনি বাঙালী সঙ্গ লাভের লোভে সুযোগ পেলেই ছুটে আসেন আবিজান শহরে। শুধু বাঙালী সঙ্গলাভের লোভেই নয়, তাকে নানান কাজেও সান পেদ্রো থেকে ৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ছুটে আসতে হয় আবিদজান শহরে। স্বভাবতই আবিদজানে তার জন্য একটি নিরাপদ এবং আরামদায়ক থাকার জায়গা খুব প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন থেকেই তিনি প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। আমি সাথে সাথে তাকে সমর্থন জানাই। এরি মধ্যে নানান দেশের নানান হাউস হয়ে গেছে, যেমন রাশান হাউজ, শ্রীলংকান হাউস, নাইজেরিয়ান হাউস, ঘানিয়ান হাউস। জাতিসংঘের এই মিশনে মোট সেনা সদস্যের অর্ধেকই হলো বাংলাদেশী। আমাদের দু'টি ফর্মড পুলিশ উইনিট আছে, আছে ইউএন পুলিশ, মিলিটারি অবজার্ভার এবং ক'জন বেসামরিক কর্মকর্তাও। আর আমাদের, মানে বাংলাদেশের নামে কোন হাউস নেই? এটা হতেই পারে না। এরি মধ্যে এলেন লে. কর্ণেল দিদার আর চলে গেলেন কমান্ডার বদরুদ্দোজা চৌধুরী। কর্ণেল দিদার প্রস্তাবটা নিয়ে বেশ নারাচারা করলেন, এখানে-সেখানে কথা বললেন। কাজ তেমন এগুলো না। মিলিটেরিদের পক্ষে কিছু করা অতো সহজ নয়। কারণ ওদের প্রতিটা পদক্ষেপই অফিশিয়াল। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয় যে কোন কিছু করার আগে। বাংলাদেশী সামরিক বাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আছেন আইভরিকোস্টে। তিনিই সর্বোচ্চ পদাধিকারী বাংলাদেশী সামরিক কর্মকর্তা। যেহেতু মিলিটেরিদের কর্মকাল এক বছর, প্রতি বছরই ইউনিফর্মের ভেতরের মানুষটি বদলে যায়। প্রথম ছিলেন, ব্রিগেডিয়ার রফিকুল ইসলাম (এখন তিনি মেজর জেনারেল), এরপর এলেন ব্রিগেডিয়ার জহুর আর এখন আছেন ব্রিগেডিয়ার মঈন।

কিছুদিনের মধ্যেই দেশ থেকে এলেন লে. কর্ণেল মঞ্জুর। ধীর-স্থির, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ কর্ণেল মঞ্জুর, কথা যা বলেন, কাজ করেন তার চেয়ে অনেক বেশী। এবং কাজগুলো করেন বেশ গুছিয়ে। তিনি বদরুদ্দোজার প্রস্তাবটিকে বাস্তবায়নে মোটামুটি উঠে-পড়েই লাগলেন। তাকে পেছন থেকে সাপোর্ট দিচ্ছি আমরা সবাই। আবিদজানে বাংলাদেশের একটি সাপোর্ট কম্পানি আছে, বর্তমানে যার কমান্ডার লে. কর্ণেল মমিনুর রহমান। এই ভদ্রলোককে আমি যতদূর চিনেছি, তিনি যদি একবার বলেন, এটা করবো, তাহলে সেটা করেই ছাড়েন। ভীষণ করিৎকর্মা মানুষ। কর্ণেল মমিন এবং কর্ণেল মঞ্জুর, এই দুই 'ম' মিলে অবশেষে বাংলাদেশীদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করলেন। আইভরিকোস্টে এখন আমাদের একটি ঠিকানা হলো, যার নাম 'বাংলাদেশ হাউস'। গতকাল ছিল তার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান। আবিদজানের একটি অভিজাত এলাকা রিভিয়েরা। প্রশস্ত রাস্তা-ঘাট, নিরিবিলি, একটি প্রকৃত আবাসিক এলাকা। যেমনটি আশির দশকে ছিল ঢাকার গুলশান। রিভিয়েরা-৩ এ একটি বেশ বড়সড় ইনডিপেনডেন্ট বাসা ভাড়া নিয়ে বানানো হয়েছে 'বাংলাদেশ হাউস'। আবিজানের বাইরে থেকে আসা বাংলাদেশী অতিথিরাই শুধু নয়, বাংলাদেশের পতাকাখচিত এই বাসাটি আইভরিকোস্টে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশী নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আমরা যখন প্রবাস কারার দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠবো তখন লাল-সবুজের পতাকাখচিত এই বাংলাদেশ হাউসে এসে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে সবাই একসঙ্গে গাইবো, ***'একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গায়/যেথায় কোকিল ডাকে কুহু/ দোয়েল ডাকে মুহুর্মুহু/ নদী যেথায় ছুটে চলে আপন ঠিকানায়...'।*** আইভরিকোস্টে বাংলাদেশ হাউস যেন একটুকরো বাংলাদেশ, আমাদের আপন ঠিকানা। এই আপন ঠিকানার মর্যাদা আমরা কিছুতেই ম্লান হতে দেব না, এমন শপথই উচ্চারিত হলো সকলের কণ্ঠে, গতকাল, গৃগপ্রবেশ অনুষ্ঠানে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৫ মার্চ, ২০০৭

মমিনের দেশে ফেরা

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। সূর্য্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। নারকেল বিথীর ছায়ারা বড় হতে হতে সৈকতের নরোম বালু পেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে পড়ছে আটলান্টিকের নীল জলে। আমরা বিচ থেকে উঠে এলাম সদর রাস্তায়। এসফল্টের সুবিশাল রাস্তা আমাদের নিয়ে যাবে আবিদজান শহরে। কিছুদূর এগুতেই পথের দুপাশে অসংখ্য দোকান। দোকান নয়, যেন ওগুলো গ্যালারী। ভেতরে, বাইরে শত শত পেইন্টিংস সাজানো। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে শুরু করলাম ছবিগুলো। আফ্রিকান নারীদের গুরু নিতম্ব আর বিশাল স্তনকে উপজীব্য করেই আঁকা হয়েছে অধিকাংশ ছবি। উপাসনালয়ের গম্বুজ, ঢোল-তবলা সবকিছুতেই কালো নারীর স্তনের আদল। বেশীর ভাগই তেলরঙয়ের

কাজ, কিছু জলরঙও দেখতে পেলাম। ওরা শুধু ক্যানভাসের ওপরই কাজ করেনি। মিডিয়াম হিসাবে ব্যাবহার করেছে বোর্ড, পাটের চট, পাখির পালক, ছন, দড়ি আরো কতো কি। একটি ছবিতে দেখলাম এক নারী ঝাড়ু হাতে তাড়া করছে কাউকে, অন্য আর দশটা ছবির মতোই ওরও বুক খোলা, ঝাড়ুটিতে শিল্পী ব্যবহার করেছে থ্রি ডাইমেনশন। আর এজন্য একটি আস্ত ঝাড়ু ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটির হাতে। এত্তো এত্তো ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রাস্তার পাশে। নিশ্চয়ই খুব সস্তা হবে। দাম জিজ্ঞেস করেতো অবাক হয়ে গেলাম। বলে কি? এক একটা ছবির দাম, দেড়'শ, দু'শ ডলার! তার মানে এগুলো আজে-বাজে শিল্পীর আঁকা নয়? এক দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম। ভাই, এতো দাম কেনো? ও খুব অবাক হলো। আমাকে বললো, এগুলো পেইন্টিংস, ক্যামেরায় তোলা ছবি নয়। ও হয়ত আমাকে চিত্রকলা বিষয়ে গো-মূর্খ ভেবে থাকবে।

আমরা যখন আবিদজান শহরে ঢুকলাম তখন শহরের গায়ে অন্ধকারের কালো জামা, সেই জামার বোতাম হয়ে জ্বলছে হাজারো শহরবাতি। হঠাৎ কর্ণেল আতিক বললেন, আমার একজন রুগী আছে হাসপাতালে, চলেন যাই একটু দেখে আসি। হাসপাতাল কথাটা শুনেই স্টিয়ারিঙয়ে আমার হাত কেঁপে উঠলো। আবার কে এলো? তিনি জানালেন, ওর নাম মমিন, আব্দুল মমিন। ব্যানব্যাট-১ এর সৈনিক। ছেলেটির অবস্থা খুব ভালো নয়। সম্ভবত লিউকোমিয়া। এখনো নিশ্চিত নই আমরা, আরো কিছু টেস্ট করার বাকী আছে। এবার আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে।

হাসপাতালে গিয়ে মমিনকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। ৩০১ নম্বরে ওর থাকার কথা কিন্তু রুম ফাকা, কেউ নেই ওখানে। এর মানে কি? কর্ণেল আতিক তাকালেন আমার চোখের দিকে। এই দৃষ্টিটা আমি চিনি। একটা অজানা আশঙ্কা। আশপাশে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না যে জিজ্ঞেস করবো। হাসপাতালের সুবিশাল টানা বারান্দা। এমাথা-ওমাথা দেখা যায় না। হলুদাভ আলোর নিচে ডুবে আছে এক ভীতিকর নীরবতা। অনেকক্ষণ পর সবুজ এপ্রণ পরা এক কালো মেয়ে আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওকে ধরলাম। মেয়েটি ইংরেজী বোঝে না। আমাদের ফ্রেঞ্চও তথৈবচ। তবে ও আমাদের প্রশ্ন বুঝলো। আমাদের অঙ্গ সঞ্চালন, আর বাংলাদেশ এবং মমিন শব্দগুলোই ও পিক করলো। বললো, ৩২৭ নম্বর রুমে। আমরা ছুটলাম ৩২৭ নম্বর রুমের দিকে, করিডোরের অন্য প্রান্তে।

মমিনের হাতে স্যালাইন লাগানো। আমাদের দেখে ও বিছানা থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে গেলো, ফোজি কায়দায় সেলুট দেওয়ার ভঙ্গিতে কর্ণেল আতিককে সালাম দিলো। সালাম দিয়েই ও ব্যস্ত হয়ে পড়লো আমাদের বসার জন্য চেয়ার টানাটানিতে। আমরা যতোই বলি, তুমি বসো, আমাদের জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। ও কিছুতেই আমাদের কথা শুনবে না। একজন বাংলাদেশী মেডিকেল এসিসট্যান্ট আছে ওর সাথে, সার্বক্ষনিক এটেনডেন্ট হিসাবে। মমিন তাকে অনুরোধ করছে আমাদেরকে আপেল-কমলা দেবার জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অসুখের কথা বাড়িতে জানিয়েছ? একটা নিস্পাপ হাসিতে উদ্ভাসিত ওর মুখ, 'না স্যার'। এরপর কিছুটা লাজুকতা। 'বাচ্চার মা খুব কষ্ট পাবে। আমার অসুখ-বিসুখের কথা শুনলে খুব কান্না-কাটি করে। সামান্য জ্বর-জারি, দুই/চার দিনের ব্যাপার। আর মিশনও শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র দুই মাস। এরপরইতো ইনশাল্লাহ দেশে ফিরে যাবো।'। কর্ণেল আতিক জিজ্ঞেস করেন, তোমার অসুখটা কি জানো? 'না স্যার, ঘুষঘুষে জ্বর ছিল কিছুদিন। কিছু খেলেই বমি করে দিতাম। এখন অনেকটা ভালো। এখন খেতে পারি। বমিটা বন্ধ হয়ে গেছে। রক্তে কি-না কি একটা সমস্যা ছিল। ডাক্তার বলেছে সেটাও ভালো হয়ে আসতেছে। দোয়া করবেন স্যার'।

আমরা মমিনকে রেখে বেরিয়ে এলাম। মেডিকেল এসিসট্যান্ট জানালো, 'কেমোথেরাপি চলছে স্যার'।

সাত/আটদিন পর একটি অফিশিয়াল ব্রডকাস্ট এলো আমার মেইলবক্সে। *'বাংলাদেশী সৈনিক আব্দুল মমিন আজ সকালে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২৭ বছর। প্রাইভেট মমিন ব্লাড ক্যানসারে ভুগছিলেন।'* আমার চোখ ভিজে উঠলো। আমার গালে অশ্রুধারা। মমিন বলেছিল, আর মাত্র দুই মাস, এরপরই দেশে ফিরে যাবে। এর আগেই ও দেশে ফিরে যাচ্ছে, ওর প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে, প্রিয় স্বদেশের কাছে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৮ মার্চ, ২০০৭

লে ফ্রে কাদোগো

ডান হাতে টুনা সেন্ডুইচ, বাঁ হাতে কোকের লাল ক্যান, বসে গেলাম ছবি দেখতে। ছবির নাম 'লে ফ্রে কাদোগো'। প্রতিপাদ্য বিষয় শিশুযোদ্ধা। আফ্রিকার যেসব দেশে গৃহযুদ্ধ বিদ্যমান, এটি একটি অবধারিত চিত্র, শিশুরা স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়ছে গেরিলা যুদ্ধে। আজকের ছবি দেখার বিশেষত্ব হচ্ছে, ফরাসী ভাষায় নির্মিত এই ছবিটির পরিচালক রুয়ান্ডার নাগরিক জোসেফ মুগাঙ্গাও আমাদের সাথে বসে ছবিটি দেখবেন এবং প্রদর্শনী শেষে তিনি দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

লেখকের সাথে 'লে ফ্রে কাদোগো'র পরিচালক জোসেফ মুগাঙ্গা

আইভরিকোস্টের প্রেক্ষাপটে ছবিটি নির্মিত হলেও আফ্রিকার অন্যান্য যুদ্ধাক্রান্ত দেশের ক্ষেত্রেও এই ছবির ঘটনাসমূহ সমানভাবে প্রযোজ্য। 'লে ফ্রে কাদোগো' সম্প্রতি বুরকিনা ফাসোর ফিল্ম ফেস্টিভেলে ফেসপাকো (FESPACO) পুরস্কার লাভ করে। ৫২ মিনিটের ছবিটি শুরু হয় শীর্ষ গেরিলা নেতার উপস্থিতিতে দলে নতুন যোদ্ধা ভর্তির মধ্য দিয়ে। এসব নতুন গেরিলা সৈনিকের সকলেরই বয়স আট থেকে চৌদ্দ বছরের মধ্যে। স্কুলে স্কুলে হানা দিয়ে দরিদ্র শিশুদের খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে আনা হয় গেরিলা যুদ্ধে। বাঁধা দিতে গিয়ে এক স্কুল শিক্ষিকা ধর্ষণের শিকার হন। সেই স্কুলেরই ছাত্র জিম।

গেরিলা প্রধানের দেহরক্ষীর দায়িত্ব পায় জিম। ওখানেই ওর সখ্য গড়ে ওঠে সমবয়সী আরো দুই গেরিলা রবার্ট এবং টমের সাথে। ওরা তিনজন প্রায় সব সময়ই একসাথে থাকে। জিম হয়ে ওঠে দূর্ধর্ষ যোদ্ধা, রবার্ট কিছুটা নরোম প্রকৃতির আর টম প্রকৃতিপ্রেমিক, সুযোগ পেলেই টম ওর প্রিয় বাঁশিটি ঝোলার ভেতর থেকে বের করে বাজায়। কিছুদিনের মধ্যেই শিশুযোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য হয় গেরিলা নেতা। টম, জিম এবং রবার্ট যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে বেরিয়ে যায়। জিমকে খুব ভালোবাসতো এক বয়স্ক গেরিলা কমান্ডার। যাবার সময় কমান্ডার ওর হাতে একটি দামী রিভলবার তুলে দেন। বনে

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে রবার্ট অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে। ওকে জঙ্গলের একটি পরিত্যক্ত ভাঙা ঘরে রেখে জিম এবং টম চলে আসে লোকালয়ে, কিছু খাবার ও পানীয় সংগ্রহের জন্য। একটি সুপারমার্কেটে ঢুকে ওরা শেলফ থেকে তুলে নেয় প্রয়োজনীয় সবকিছু। কিন্তু কাউন্টারে এসেই মনে হয় ওদের কাছেতো টাকা নেই। কাউন্টারে বসা মহিলাকে পিস্তল দেখায় জিম। মেয়েটি ভয় পায়। সুযোগ নেয় জিম, বলে আমাদের ট্যাক্সি ভাড়া দাও। মেয়েটি ভয়ে ক্যাশের সব টাকা দিতে চাইলে ও শুধু ট্যাক্সি ভাড়াটাই তুলে নেয়। জঙ্গলে ফিরে এসে দেখে রবার্ট মরে গেছে। দুই বন্ধু মিলে কাঁদতে কাঁদতে রবার্টকে কবর দেয়।

শহরে এসে ওরা একটি অপরাধচক্রের সংস্পর্শে ড্রাগ ব্যাবসা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মতো ঘটনার সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে একটি মিশনারী আশ্রমের প্রধানের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ওদেরকে তুলে নিয়ে যান। সেখানে গিয়েও ওরা অন্য বাচ্চাদের মধ্যে অপরাধপ্রবনতার অনুপ্রবেশ ঘটায়। নিজেদের দল গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এক রাতে শহরের অপরাধচক্রটির সহায়তায় মিশন প্রধানের ঘর থেকে সবকিছু চুরি করে পালিয়ে যায় জিম এবং টম। পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয় টম। পরে সে মারা যায়। মারা যাবার সময় ওর প্রিয় বাঁশিটি দিয়ে যায় জিমকে।

দুই বন্ধুকে হারিয়ে জিম এই বিশাল শহরে অসহায় হয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত জিম একটি রেস্টুরেন্টে ঢোকে। রেস্টুরেন্টে টিভি চলছে। টিভিতে একটি ঘোষণায় ও আঁতকে ওঠে। গেরিলা নেতা এবং সরকারী নেতার মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেছে। ওরা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করবে কিছুক্ষণ পর। সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহনের জন্য গেরিলা নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রেসিডেন্ট প্যালেসে। বিষয়টি কিছুতেই মেনে নিতে পারে না জিম। ও মনে করার চেষ্টা করে, নেতা ওদেরকে অনুপ্রাণিত করতেন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে, তিনি সবসময় বোঝাতেন কিভাবে সরকার ওদের শোষণ করছে। আর আজ সেই নেতাই সরকারের সাথে আপোষ করতে যাচ্ছে? এটা কিছুতেই হতে পারে না।

সাথে সাথে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যায় জিম। যাবার আগে যে মেয়েটি ওর জন্য খাবার নিয়ে আসে, ওর কাছ থেকে জেনে নেয় কিভাবে প্রেসিডেন্ট প্যালেসে যাবে। জুতো কালিঅলার ছদ্মবেশে ও ঢুকে পড়ে প্রেসিডেন্ট প্যালেসে। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতেই এক প্রশ্নের জবাবে গেরিলা নেতা বলেন, আমরা কখনোই কোন শিশুকে যুদ্ধে জড়িত করিনি। এ কথা শুনে মাথায় রক্ত উঠে যায় জিমের। এই লোকের জন্যই আজ সে অপরাধী, ওর দুই বন্ধু কবরে। সে তখন জ্যাকেটের পকেট থেকে পিস্তল বের করে এবং আড়াল থেকে পরপর দুই গুলিতে দুই নেতাকে হত্যা করে।

বেরিয়ে এসে সোজা চলে যায় মিশনারী পাদ্রি-বাবার কাছে। সব স্বীকার করে জিম বলে, আমি কনফেস করতে চাই।

এই হলো ‘লে ফ্রে কাদোগো’র গল্প। ছবিটির চিত্রগ্রহন এবং শিল্পীদের অভিনয় নৈপুন্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় হলেও গল্পে কিছুটা অবাস্তবতা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কথা বলি পরিচালক জোসেফ মুগাঙ্গার সাথে। যুদ্ধের ময়দানে শিশুযোদ্ধারা যে সমস্যার শিকার হয়, সেটি একটি-দুটি দৃশ্যে আনা যেত বলে মন্তব্য করি। পরিচালক সব স্বীকার করে বলেন, খুব কম খরচে আমাকে ছবিটি বানাতে হয়েছে। তাই যুদ্ধের দৃশ্যের মতো ব্যয়বহুল কাজটি করতে পারিনি।

এরপরও বলবো ‘লে ফ্রে কাদোগো’ শিশুযোদ্ধা বন্ধে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারবে, যা অত্যন্ত জরুরী একটি কাজ।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৮ মার্চ, ২০০৭

ওয়াগাডুগু চুক্তি, আইভরিকোস্টে শান্তির কড়া নাড়ার শব্দ

আইভরিকোস্টের গেরিলা নেতা গুইলামো সরো এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। গত ৪ এপ্রিল ২০০৭ তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম কর্মদিবস অতিবাহিত করেন। তাহলে কি আইভরিকোস্টের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটলো? এ প্রশ্নের উত্তরে নীরব দেশের সচেতন মানুষ।

২০০০ সালের নির্বাচনে বিরোধীদলীয় নেতা আলাসান উয়াত্তারাকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে অযোগ্য ঘোষণা করে হাইকোর্ট। কারণ, আইভরিকোস্টের সংবিধানে আছে কোন আধা-আইভরিয়ান দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। আলাসান উয়াত্তারার পিতা আইভরিয়ান হলেও তার মা ছিলেন বুরকিনা ফাসোর রাজকণ্যা। সেই থেকেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আরো বেশী করে দানা বাঁধে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন লরেন্ট বাগবো। দেশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। গেরিলা নেতা গুইলামো সরোর দখলে উত্তরাংশ আর প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবোর দখলে দক্ষিণাংশ। মাঝখানে একটি রেখা টেনে দেয় জাতিসংঘ। এই রেখার নাম ‘জোন অব কনফিডেন্স।’

বাগবো সরকার চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ করে ২০০৪ এর অক্টোবরে। কিন্তু তিনি ক্ষমতা ছাড়েননি। ঝুলে আছেন এখনো। নির্বাচনের দাবীতে স্থানীয় সকল রাজনৈতিক দল সোচ্চার হলেও বাগবো এতে কর্ণপাত করেন না মোটেও। একটি বিভক্ত দেশে নির্বাচন করাও সম্ভব নয়। প্রথমে একত্রায়ন প্রয়োজন। আশপাশের দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের সনাক্ত করা প্রয়োজন, হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন এবং আরো প্রয়োজন গেরিলাদের নিরস্ত্রীকরণ। আর সংবিধানের আর্টিকেল ৩৫? যেখানে লেখা আছে আধা-আইভরিয়ান প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না? সেটাতো শোধরানো প্রয়োজন সবার আগে।
জাতিসংঘের চাপে আর্টিকেল ৩৫ সংশোধন করা হয়। অন্য কর্মসূচীগুলো নিয়ে দফায় দফায় মিটিং হয় জাতিসংঘের নেতৃত্বে, আফ্রিকীয় ইউনিয়নের অন্যান্য নেতাদের নিয়ে, গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং গ্রুপের (আইডব্লিউজি)। কেউ কেউ প্রস্তাব করেন দুটি দেশ বানিয়ে দাও। উত্তর আইভরিকোস্ট আর দক্ষিণ আইভরিকোস্ট। একথা শুনে চমকে ওঠেন দেশের সাধারণ মানুষ। কেউ কেউ বলেন, তবুতো শান্তি আসবে, আমরা শান্তি চাই। অনেক দফা আলোচনা, সভা-সমাবেশের পর সনাক্তকরণ এবং নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচী শুরু হয়।

আইভরিয়ান বুদ্ধিজীবীরা চশমার কাচের ভেতরে চোখ বড় করেন। এবার তাহলে হবে? কিন্তু কিছুই হয় না। এক পা এগোয় তো পিছোয় দশ পা। প্রতিটি পদক্ষেপেই বাঁধা আসে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। ২০০৪-এ যখন নির্বাচন হয় না, তখন একটি সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। সেই সংকট এড়াতে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় একটি অন্তঃবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। প্রেসিডেন্ট তিনিই, লরেন্ট বাগবো, নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় সাবেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণর শার্লস কোনান বানিকে। অর্ডন্যান্স জারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে দেশের নির্বাহী প্রধান করা হলেও, প্রেসিডেন্ট তা থোরাই কেয়ার করেন। কিছুদিনের মধ্যেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় দুই নেতার মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী যদি কাউকে দূর্নীতির দায়ে চাকরীচ্যুত করেন, প্রেসিডেন্ট তাকে পরের দিন পূনর্বহাল করেন। এই সাপে-নেউলে সম্পর্কের কারণে সরকারী কর্মকান্ডে অচলাবস্থা দেখা দেয়। প্রেসিডেন্টের অনুগত সামরিক বাহিনী। সেই দাপটে দু'চারবার প্রধানমন্ত্রীকে হুমকিও দেন তিনি। কিছুদিন প্রধানমন্ত্রী কোনান বানি রাজধানী ছেড়ে ভয়ে ইয়ামুসুক্রো গিয়ে অবস্থান করেন। ইয়ামুসুক্রোর বাংলাদেশী আর্মি কমান্ডারের কাছে তিনি তার জীবনের নিরাপত্তাও চান। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, তাকে দেশের সেনাবাহিনী যে কোন সময় হত্যার চেষ্টা চালাতে পারে।

এই অচলাবস্থা নিরসনে জোর চেষ্টা চালাতে শুরু করে আইডব্লিউজি, তথা জাতিসংঘ। হঠাৎ করে 'পশ্চিম আফ্রিকা অর্থনৈতিক গোষ্ঠী' (ইকোওয়াস)-র চেয়ারম্যান বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট জনাব ব্লেইজ কম্পাওর আইভরিকোস্টের দুই অংশের দুই নেতা, প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবো এবং গেরিলা নেতা গুইলামো সরোকে আমন্ত্রণ জানান ওয়াগাডুগুতে আলোচনায় বসার জন্য। আলোচনা শুরু হয় ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৭, চলে ৩ মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ ২৭ দিনের আলোচনা শেষে দুই নেতা এক সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিসমূহ, জাতিসংঘের রেজুলুশন সমূহ আমলে নিয়ে দুই পক্ষ নিম্নোক্ত ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়াগাডুগু আলোচনায় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

১. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হেফাজত, সীমান্তরক্ষা এবং অখন্ড আইভরিকোস্ট নিশ্চিতকরণ

২. রিপাবলিক অব আইভরিকোস্টের সংবিধান সমুন্নত রাখা

৩. লিনাস-মার্কুসিস, আক্রা এবং প্রিটোরিয়া চুক্তির শর্তসমূহ মেনে চলা

৪. আইভরিকোস্ট বিষয়ে গৃহীত জাতিসংঘের সকল রেজুলেশন মেনে চলা, বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলুশন ১৬৩৩ (২০০৫) এবং ১৭২১ (২০০৬)

৫. এমন পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রতিজ্ঞ যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, মুক্ত, স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে

৬. যৌথ সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতামূলক দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয় যাতে রিপাবলিকের সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাভাবিক কর্মপরিবেশ ফিরে আসে, রিপাবলিকের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অঙ্গসমূহকে পুনঃর্গঠন এবং সেনাবাহিনীকে স্বাভাবিক কর্মযজ্ঞে ফিরিয়ে আনা যায়।

ওয়াগাডুগু চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নাগরিক সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার বিশদ বিশ্লেষণ। নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র বিষয়ে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ও এই চুক্তিতে উঠে আসে। ন্যাশনাল কমিশন ফর দি সুপারভিশন অব দি আইডেন্টিফিকেশনের (এনসিএসআই) অধীনে একটি ন্যাশনাল অফিস অব আইডেন্টিফিকেশন (এনওআই) গঠিত হবে। যে অফিস নাগরিক সনাক্তকরণ কর্মসূচী পরিচালনা করবে এবং সকল নাগরিককে নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র প্রদান করবে। এই চুক্তি নাগরিকত্বের পরিচয়পত্রের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে এজন্য বিবেচনা করে, কারণ এ ছাড়া স্বচ্ছ, মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।

লিনাস মার্কুসিস, আক্রা এবং প্রিটোরিয়া চুক্তির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অবাধ, সুষ্ঠু, মুক্ত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান। এই বিষয়টি ওয়াগাডুগু চুক্তিতে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উঠে আসে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের (Indipendent Election Commission-IEC) অধীনে জাতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট ভোটার রেজিস্ট্রেশনের কাজটি করবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে নির্বাচন বিধিমালার আর্টিলেক-৫ মোতাবেক স্বাধীন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের কমপক্ষে দুই সপ্তাহ আগে ভোটার কার্ড বিতরণ করবে। কেউ যদি ভোটার কার্ড সংগ্রহ করতে না পারে, সে তার জাতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোট দিতে পারবে।

আইভরিকোস্ট দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ার পর গেরিলারা গড়ে তোলে ওদের নিজস্ব সেনাবাহিনী। সেই সেনাবাহিনীর নাম ফোর্স নুভেল (নতুন সৈন্যদল), যার মহাসচিব গুইলামো সরো। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় ফোর্স নুভেলের সৈনিকদের দেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। অর্ডন্যান্সের মাধ্যমে একটি নতুন কর্মকৌশল অনুমোদন করা হবে এবং তৈরী করা হবে সমন্বিত কমান্ড সেন্টার। সমন্বিত কমান্ড সেন্টারের নেতৃত্বে থাকবেন দুই অংশের সেনা প্রধান এবং এই সেন্টারের মাধ্যমেই গেরিলাদের নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াটিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ওয়াগাডুগু চুক্তিতে বিবেচনা করা হয়। প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের একটি আউটলাইনও চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আসে দেশের সর্বত্র বৈষম্যহীনভাবে নাগরিক সেবাসমূহ, যেমন, পানি, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ইত্যাদি পৌছে দেওয়া। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন 'জোন অব কনফিডেন্স' ভেঙ্গে দিয়ে সারা আইভরিকোস্ট একত্রায়ন করা।

এ ছাড়া আরো চারটি বিষয় এই চুক্তিতে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। এগুলি হচ্ছে:

১. সামরিক বে-সামরিক প্রশাসনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা এবং অখন্ড আইভরিকোস্টের শাসন নিশ্চিত করা

২. দেশের সর্বত্র সকল নাগরিকের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা

৩. এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একটি ৫ সদস্যের স্থায়ী কমিটি গঠন, যার সদস্যরা হচ্ছেন, প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবো, গেরিলা নেতা গুইলামো সরো, রাজনৈতিক দল আরডিআর-এর প্রেসিডেন্ট আলাসান উয়াত্তারা, রাজনৈতিক দল পিডিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট হেনরি কোনান বেদি এবং ইকোওয়াসের চেয়ারম্যান ও বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট ব্লেইজ কম্পাওর।

৪. শান্তি প্রক্রিয়ায় যদি কখনো নিরপেক্ষ সেনাসদস্য প্রয়োজন হয় তাহলে আফ্রিকীয় ইউনিয়নের কাছে সৈন্য চাওয়া হবে।

৪ মার্চ ২০০৭-এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অতি দ্রুত শুরু হয়ে যায়। এরি মধ্যে প্রাধানমন্ত্রী চার্লস কোনান বানি পদত্যাগ করেছেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গেরিলা নেতা, যিনি একসময় বাগবোর রাজনৈতিক দলের ছাত্রনেতা ছিলেন, গুইলামো সরো, শপথ গ্রহন করেন। আফ্রিকীয় ইউনিয়নের সুপারিশে জাতিসংঘ ওয়াগাডুগু চুক্তিকে স্বীকৃতি দেয়। জোন অব কনফিডেন্স ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আইভরিকোস্টের জনপ্রিয় ফুটবলার, চেলসির সোনার

ছেলে হিসাবে খ্যাত দিদিয়েৰ্খ দ্রগবা, যিনি ২০০৭-এ আফ্রিকার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন, গত সোমবার (০৩/০৪/০৭) গেরিলা নিয়ন্ত্রিত অংশের রাজধানী বুআকে যান তার ট্রফি হাতে নিয়ে। লক্ষ লক্ষ বুআকেবাসী মানুষের ঢল নেমে আসে তাদের প্রিয় তারকা দ্রগবাকে এক নজর দেখার জন্য। গেরিলা নিয়ন্ত্রিত দেশের উত্তরাংশ পূনঃআত্মীকরণ বা সমগ্র আইভরিকোস্ট একত্রায়নের জন্য দ্রগবার বুআকে সফরকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। দ্রগবা নিজেই এই সফরে দারুণ খুশি। তিনি বলেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল আইভরিয়ান আমাকে দারুণ ভালোবাসে কিন্তু রাজনৈতিক কারণে দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত আমার প্রিয়জনদের কাছে আমি এতোদিন যেতে পারিনি। আজ সেই সুযোগ এসেছে, তাই আমি প্রথমেই ছুটে এসেছি তাদের কাছে, যারা এতোদিন আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

দুই নেতা দৃঢ়তার সাথেই ঘোষণা করেন আগামী ফেব্রুয়ারী ২০০৮-এ ওয়াগাডুগু চুক্তি মোতাবেক দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ধীরে ধীরে এ দেশ থেকে জাতিসংঘকে চলে যেতে হবে। সাধারণ মানুষ কিন্তু এই ঘোষণাকে গুরুত্ব দিলেও ততোটা বিশ্বাস করছেন না। আইভরিকোষ্টের সাধারণ জনগণ বরং জাতিসংঘের উপস্থিতি আরো কিছুটা দীর্ঘ হোক এটাই প্রত্যাশা করেন। কারণ ওদের বিশ্বাস নেই। ওরা যে কোন সময় যে কোন কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এইরকম রাজনৈতিক চড়াই-উৎড়াই দেখতে দেখতে আইভরিয়ানরা অভ্যস্ত। রাজনীতিবিদদের এরকম চটুল ঘোষণাও ওরা অনেক শুনেছে। চুন খেয়ে মুখ পুড়েছে তাই এখন দই দেখলেও ভয় লাগে। রাজনীতিবিদদের প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরী হয়েছে চরম অবিশ্বাস, তাই রাজনীতিবিদদের মুখ থেকে বের হওয়া কোন শুসংবাদেও এখন আর আনন্দে মাতোয়ারা হন না আইভরিকোস্টবাসী। তারপরেও সবাই এ কথা একবাক্যেই স্বীকার করেন, সমস্যার সমাধানও কেবল রাজনীতিবিদরাই করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। যখন ওরা এটা করবেন তখনি কেবল ওদের প্রতি তৈরী হওয়া অবিশ্বাস মুছে গিয়ে মানুষের হৃদয়ে জন্মাবে ওদের প্রতি ভালোবাসা এবং তৈরী হবে আত্মবিশ্বাস।

ওয়াগাডুগু চুক্তি স্বাক্ষরের একমাস পেরিয়ে গেছে। এরি মধ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। যৌথ কমান্ড সেন্টার প্রতিষ্ঠীত হয়েছে। সরকার-গেরিলা সমন্বয়ে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। 'জোন অব কনফিডেন্স' ভাঙার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। উত্তর ও দক্ষিণের মানুষের এপার-ওপার অবাধ চলাচল শুরু হতে চলেছে। এইসব দেখে মনে হচ্ছে রাজনীতিবিদরা বুঝি এবার সত্যি সত্যি আটলান্টিকের পাড়ে শান্তির শুভ্র পায়রা উড়াতে বদ্ধপরিকর।

আইভরিকোস্টের রোদে পোড়া পৌনে দুই কোটি কালো মানুষ, সন্দেহে, প্রত্যাশায় এখন কান পেতে আছে মাঝরাতে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর রক্তের হোলিখেলা নয়, শান্তির কড়ানাড়ার শব্দ শুনবে বলে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৫ এপ্রিল, ২০০৭

লেসোথো

পেটের পীড়ায় মরে গেল মোলেলেকি, ক'দিন পরে থাহানে, এরপর খোশানা, এরপর থেকিসো, এমনি আরো অনেকে। আসলেই কি এটা পেটের পীড়া? না, পেটের পীড়াতো কেবল মৃত্যুর উপলক্ষ, অসুখটির নাম এইডস। এমনি করে প্রতিদিন শত শত লোক এইডসে মরে যাচ্ছে যে দেশে, সেই দেশটির নাম লেসোথো। বিরান পাহাড়ি কৃষিভূমি আগাছায় ভরা, চাষ করার লোক নেই। ছনের ছাউনির নিচে মাটির দেয়াল, সে দেয়ালে ঘাস গজিয়েছে। কাঠের দরোজায় ঘুনপোকাদের বাসা। উঠানে বন্য প্রাণীদের হাঁটাচলা। বাড়িতে কোন লোক নেই। একে একে সবাই কবরে। এক নিস্তব্ধ প্রেতপুরি হয়ে উঠছে প্রতিটি বাড়ি। ৩০ হাজার ৩৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট এই ভূ-খন্ডে লোক বাস করে ২০ লক্ষ ২২ হাজার। এ দেশে লোক বাড়ে না। গড়ে প্রতিবছর মানুষ কমে যায় ১০ হাজারেরও বেশি।

দক্ষিণ আফ্রিকার পেটের ভেতর একটি ডিম, লেসোথো, এক স্বাধীন দেশ। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ কেপ উপনিবেশের সাথে যুক্ত হয় এই জনপদটি, তখন এর নাম ছিল বসুতোল্যান্ড। বসুতোল্যান্ডের তখন এক রাজা ছিল, রাজা মোশুশু। দন্ডমুন্ডের কর্তা ব্রিটিশ, রাজা হলেন পুতুল। না, মেনে নিলেন না রাজা মোশুশু, শুরু হলো যুদ্ধ। ১৮৮৪ সালে ক্ষমতা কেড়ে নিলেন বৃটিশদের কাছ থেকে। আবারো যুদ্ধ, আবারো বৃটিশ। এমনি চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে লেসোথো সম্পুর্ণ স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করে ৪ অক্টোবর ১৯৬৬ সালে। তখন রাজা মোশুশু (দুই)।

লেসোথো এক পাহাড়ি দেশ। শীতকালে এখানে বরফ পড়ে। বেশিরভাগ গ্রামে যাওয়ার একমাত্র বাহন হলো ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে চড়ে অথবা পায়ে হেঁটেই যেতে হয় দূরের লোকালয়সমূহে। দেশের পশ্চিম প্রান্তে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত সমতলে গড়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় শহর মাসেরু, দেশের রাজধানী। টাকা পয়সার নাম লতি এবং লিসেন্তে। এক'শ লিসেন্তে এক লতি। লতির মুদ্রামান বেশ ভালো, ৭ লতিতে এক ডলার। প্রবাসী কর্মজীবিদের ৩৫ শতাংশ কাজ করে দক্ষিণ আফ্রিকায়, বেশিরভাগই খনিশ্রমিক। জনসংখ্যার প্রায় সবাই সোথো সম্প্রদায়ভূক্ত বলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেসোথোতে একেবারেই নেই। তবে রাজনৈতিক কোন্দল আছে, আছে সবকিছুতেই প্রচন্ড সরকারী নিয়ন্ত্রণ। দেশের একমাত্র টিভি চ্যানেলটি সরকারী। কোন দৈনিক খবরের কাগজ নেই। ৫টি সেসোথো সাপ্তাহিক,

২টি ইংরেজী সাপ্তাহিক, সরকারী রেডিও-টিভি আর কয়েকটি এলাকা ভিত্তিক ব্যাক্তিমালিকানাধীন রেডিও নিয়েই লেসোথোর মিডিয়া জগৎ।

১৯৭০ এর নির্বাচনের পর লেসোথোর রাজনীতি বদলে যায়। রাজা মোশুশুকে (দুই) নির্বাসনে যেতে হয়। যখন ফিরে আসেন তখন তার রাজনীতিতে নাক গলানি নিষেধ। ক'দিন পরে আরো এক দফা ক্ষমতা কর্তন, কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই রাজার। এমন কি সেনাপ্রধানের চাপে মোশুশুকে (দুই) সিংহাসনও ছাড়তে হয়। রাজা হন তার ছেলে লেতসিয়ে (তিন)। কিন্তু ক্ষমতা কারো চিরদিনের নয়। ১৯৯৫ সালে সেনা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন জাস্টিন লেখানিয়া, নতুন চেয়ারম্যান কর্ণেল রামায়েমা রাজা মোশুশুকে পুনর্বহাল করেন। আর লেতসিয়ে আবারো ক্রাউন প্রিন্স। অবশ্য এর কিছুদিন পরেই, ১৯৯৬ সালে, সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যান রাজা মোশুশু, আবারো রাজা হন লেতসিয়ে (তিন)। পরের নির্বাচনগুলোতে অনেক হাঙ্গামা হয়, দক্ষিণ আফ্রিকা সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সেসব নিয়ন্ত্রণ করে। লেসোথোর সরকার প্রধান হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেথুয়েল পাকালিথা মোসিসিলি। ২০০৭ সালে তিনি তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন। ৮০ আসনের একটি পার্লামেন্ট রয়েছে, যার ৬১টি আসনেই জয়লাভ করে মোসিসিলির লেসোথো কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি (এলসিডি) পার্টি।

বিশ্বব্যাংকের হিশেব অনুযায়ী লেসোথোর মানুষের গড় মাথাপিছু আয় এক হাজার ডলার। ৮০ শতাংশ লোক খ্রিস্টান আর ২০ শতাংশ লোক বিভিন্ন আদিধর্মের অনুসারী। জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জন শিক্ষিত। সেসোথো এবং ইংরেজীর পাশাপাশি জুলু এবং জোশা ভাষায়ও কিছু লোক কথা বলে। সারা দেশে মাত্র ৭ 'শ লোক আছে যারা ইউরোপ, এশিয়া এবং অন্যান্য দেশ থেকে এসে লেসোথোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। প্রতি ৯৩ জনের জন্য একটি মোবাইল ফোন আছে, সারাদেশে মাত্র হাজার দশেক লোক ইন্টারনেট ব্যাবহার করে। লেসোথোর পাহাড়ে-সমতলে গম, ভুট্টা, বার্লি, ডাল উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে পাথর, মিঠাপানি, হিরা, চাষযোগ্য জমি, বালু এবং শ্বেতকাদা।

লেসোথোর পাহাড়ের তলদেশে অগাধ সম্পদ লুকিয়ে আছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এর মধ্যে হিরা এবং সোনা অন্যতম। কিন্তু সেই সম্পদ আহরণ করবে কে? লেসোথোর মানুষের মাথাপিছু গড় আয়ু ৩৬ বছর। ভয়ানক দানব এইডস ওদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ। রাতের আকাশে ডানা মেলে ওড়ে একদল ভুতূড়ে বাদুড়, পাহাড়ের আড়াল থেকে ডেকে ওঠে মরালোভী শৃগালের দল। মৃত্যুর এই বিভিষিকা পেরিয়ে লেসোথোর মানুষ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে, জয় করবে এইডসের মতো মহাঘাতক দানবকে এমন আশাবাদই ব্যক্ত করলেন জনাথন মাৎসেইং, আমার সহকর্মী।

৪ জুন, ২০০৭
আবিদজান, আইভরিকোস্ট

ইকুয়েটরিয়াল গিনির মাথাপিছু জিডিপি ৫০ হাজার ডলার

'আরো একটি গিনি আছে, ইকুয়েটরিয়াল গিনি। ওদের মাথাপিছু জিডিপির পরিমান কত জান? ৫০ হাজার ডলার' বললো সোরি। 'অবিশ্বাস্য। বিস্ময়কর। কি বলছো তুমি?' সোরি সাঙ্গারের বাড়ি গিনি কোনাক্রি। আমাদের বাজেট অফিসার। গিনি সম্পর্কে কিছু লিখতে আরো একবার উৎসাহিত হয়েছিলাম। সেটা ছিল গিনি বিসাউ। আমার আরেক সহকর্মী, এলিস শাখট, গিনি বিসাউয়ের সাবেক ফার্স্ট লেডি। 'আমার স্বামীকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।' এলিস বলেছিল, 'আমার জীবনের গল্প শোনাবো তোমাকে।' কিন্তু শোনা হয়নি। হুট করে ও বদলি হয়ে যায়। এখন হাইতিতে। সোরির সঙ্গে প্রায়শই নানান বিষয় নিয়ে খুনসুটি হয়। আফ্রিকার দারিদ্রই এর প্রধান বিষয়। কিন্তু ইকুয়েটরিয়াল গিনি? মাথাপিছু জিডিপি ৫০ হাজার ডলার!

২০০২ এ মোট জিডিপির পরিমান ছিল ১ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫-এ এসে তা দাঁড়ায় ২৫ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন ডলারে। মাত্র তিন বছরে ২০ গুণ প্রবৃদ্ধি! এখন ওদের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার কুড়ি শতাংশ, বিশ্বে সর্বোচ্চ। কিন্তু গিনির মানুষ এর সুফল পাচ্ছে না। টাকার পাহাড় বানাচ্ছে দেশের স্বৈরশাসক ইকুয়েটরিয়াল গিনির প্রেসিডেন্ট কর্ণেল

টিওডরো অবিয়ঙ গুয়েমা বাসোগো ও তার চেলারা। ১৯৭৯ সালে চাচাকে হটিয়ে দিয়ে অবিয়ঙ ক্ষমতা কেড়ে নেয়। সিংহাসন নিস্কন্টক রাখতে সাবেক প্রেসিডেন্ট, স্বাধীন ইকুয়েটরের জনক, নিজের আপন চাচা ফ্রান্সিসকো মাসিয়াস গুয়েমাকে ঝুলিয়ে দেয় অবিয়ঙ। গুয়েমাও ছিল অত্যাচারী শাসক। অবশ্য তখন দেশ ছিল হতদরিদ্র। ওর পতনে দেশের মানুষ হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু তার বদলে কি পেল? ফেঙ সম্প্রদায়ের ওই বিশেষ পরিবারটির হাতেই সবকিছু। ইকুয়েটরিয়াল গিনির হতদরিদ্র মানুষগুলো যেন রোদে পোড়া কয়লার ভাস্কর্য একেকটা। কত আশা ছিল, ওই দৈত্যটা যখন গেল, এবার হয়ত এক থাল কাসাভা অথবা দুবেলা ঠিকমতো আলুকো জুটবে। হয়ত সপ্তাহে এক আধদিন এক বাটি ঝোল কিংবা কপাল ভালো হলে এক টুকরো ক্যাপিতান মাছও পাতে পড়বে। হলোনা। সেই পুরোনো বোতলে নতুন মদ।

নব্বুইয়ের দশকের শেষের দিকে উপকূলে আবিস্কৃত হয় তরল সোনা, অফুরন্ত তেল সম্পদ। আর রাতারাতি বদলে যায় ইকুয়েটরিয়াল গিনির অর্থনীতি। ১৯৯৭ সালে হঠাৎ করে ৭১ দশমিক ২ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দেশটি। আফ্রিকার একমাত্র স্পেনিশ উপনিবেশ ইকুয়েটরিয়াল গিনি স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৬৮ সালে। তখন থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত গুয়েমা-ই ছিল দন্ডমুন্ডের কর্তা, এরপরে অবিয়ঙ। তেল আবিস্কারের পরে দেশকে আধুনিক রাস্ট্রে পরিণত করার বেশ কিছু উদ্যোগ নেয় অবিয়ঙ। তবে জাতীয় সম্পদ, বিশেষ করে তেলের বিষয়টি সম্পূর্ণ নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছে। অবিয়ঙের ভাষায়, তেলের বিষয়টি গোপনীয়। এ বিষয়ে জনগণের জানার অধিকার নেই। অবিয়ঙ দাবী করেন তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে ৯৯ শতাংশ এবং ২০০২-এর নির্বাচনে ৯৭ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয় অবিয়ঙ। নির্বাচনের এই ফলাফল নিয়ে পশ্চিমারা নানান হাস্যকর রসিকতা করে। গুয়েমার পতনের পর দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক পাড়ি জমায় ভিনদেশে। ওরা গড়ে তুলেছে ইকুয়েটরিয়াল গিনির প্রবাসী সরকার। শুরু থেকেই লুটপাটের স্বর্গ ছিল গিনি। তেল আবিস্কারের পরে তা আরো বেড়ে যায়। ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের হিশেব মতে এই দেশটি সবসময়ই সেরা দশ দূর্নীতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে আছে। ৫ লক্ষ ৫১ হাজার (২০০৭) লোকের ছোট্ট একটি দেশ ইকুয়েটরিয়াল গিনির মোট আয়তন ২৮ হাজার বর্গকিলোমিটার। জনগনের শতকরা ৮৫জন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। গড় আয়ু ৫০ বছর। দাপ্তরিক ভাষা স্পেনিশ এবং ফরাসি হলেও স্পেনিশ ভাষায়ই বেশিরভাগ লোক কথা বলে। জনসংখ্যার অধিকাংশই ক্যাথলিক খ্রিস্টান। ইকুয়েটরিয়াল গিনির ভূ-গোল বড় বিচিত্র। দেশের রাজধানী মালাবো আটলান্টিকের বুকে ভাসমান বিয়োকো দ্বীপে অবস্থিত যা মূল ভূ-খন্ড থেকে কয়েক 'শ মাইল দূরে। মূল ভূ-খন্ডে অবস্থিত লিটোরাল প্রদেশের রাজধানী বাটা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। বিয়োকো দ্বীপে রয়েছে তিনটি অগ্নিগিরি, যেগুলির উচ্চতা যথাক্রমে ৯৮৭৬, ৭৪১৬ এবং ৬৮৮৫ ফুট।

ইকুয়েটরিয়াল গিনি অসহ্য গরমের দেশ হলেও হাজার হাজার মার্কিনী পর্যটক সারাবছর ধরেই ভিড় করে ওখানে। পৃথিবীর একমাত্র দেশ মার্কিন যুক্তরাস্ট্র, যে দেশের নাগরিকদের ওখানে যেতে কোন ভিসা লাগে না। পিগমিদের দেশ বলেই খ্যাত ছিল ইকুয়েটরিয়াল গিনি। সপ্তদশ শতকে ফেঙ এবং বুবি সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে এখানে। এখন পিগমিদের কোন অস্তিত্বই নেই। ফেঙরা মূল ভূখন্ডে রয়ে গেলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বুবিরা পাড়ি জমায় ফার্নান্দো পো দ্বীপে, পরবর্তিতে যে দ্বীপের নামকরণ হয় বিয়োকো। ফেঙ এবং বুবি ছাড়াও আরো বেশ কটি সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে ইকুয়েটরিয়াল গিনিতে, সংখ্যালঘু এই সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে: অন্নোবন, দোয়ে, কোম্বে এবাং বুজেবাস। একমাত্র ফেঙ ছাড়া আর কারো কোন পাত্তা নেই, যদিও ইকুয়েটোগিনিয়ান নামে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার সাম্প্রতিক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৯ জুন, ২০০৭

মৃত্যুর রাতেই কেবল আনন্দ আসে

আমরা যখন ফুরুনা গ্রামে পৌছাই তখন মধ্যরাত। আকাশে ঝকঝকে চাঁদ। গায়ে গায়ে লাগানো কয়েক সারি মাটির ঘর। ওপরে একচালা-দোচালা ছনের ছাউনি, নেমে এসেছে উঠানের ওপর। কয়েকটি ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলছে, বেশিরভাগ ঘরেই কোন আলো নেই। চারপাশে বিরানভূমি, ধু ধু বালুচর। চাঁদের আলোয় ঘরগুলোর ঢেউখেলানো ছায়া তৈরী হয়েছে। খানিকটা দূরে, খোলা মাঠে, বাদামী রঙের বালুর ওপর একদল মানুষের হল্লা। আজ দুপুরে একজন মানুষ মারা গেছে।

পেটের পীড়ায় ভুগছিল সে। মানুষটির নাম লামিন কুলিবালি। আদামা কুলিবালির ভাই। আদামা এ গাঁয়ের নেতা। লামিনের লাশ মাঝখানে রেখে গ্রামবাসী উৎসবে মেতে উঠেছে। আদামা একটি ছোট্ট চৌকির ওপর বসেছে। ওর ডানহাতে দেড়ফুট লম্বা একটি লাঠি। লাঠির মাথায় হিংস্র জন্তুর প্রতিকৃতি। জন্তু-প্রতিকৃতির কারুকার্যখচিত এই লাঠিটি গোত্রপ্রধানের শাসনদন্ড। তিনজন যুবা পুরুষ তামতামে ঘনঘন তেহাই বোল তুলছে, সেই ছন্দে নাচছে একদল যুবক-যুবতী। যুবতীদের ভারী নিতম্ব তামতামের তালে তালে পাম পাতার কাঁপন তুলছে। আফ্রিকান নারীদের বিশেষায়িত নাচ। সমস্ত শরীর স্থির রেখে অমন অদ্ভুত কায়দায় নিতম্ব কাঁপানোর কৌশল পৃথিবীর আর কোন নারীর জানা নেই। কোরাস সঙ্গীতের মতো কিছুক্ষণ পরপর সকলে একসঙ্গে অদ্ভুত এক শব্দ করছে মুখ দিয়ে। যারা নাচছে না, বসে-দাঁড়িয়ে গা দুলিয়ে তাল দিয়ে যাচ্ছে। পুরুষদের হাতে একটি করে মাটির পাত্র। ভুট্টার মদ চাপালোর নেশায় বুঁদ হয়ে আছে ওরা। পরিস্কার আকাশ। রাত যত গভীর হচ্ছে চাঁদের আলো ততই তীব্র হয়ে উঠছে। চাপালোর পাত্রে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে। ফুরুনা গ্রামের একদল কালো মানুষ প্রিয়জনের মৃতদেহ সামনে রেখে মদের নেশায় মাতাল হয়ে মেতে উঠেছে উদ্দাম নৃত্যে। এটাই সংস্কৃতি, এটাই প্রথা। মৃতের রেখে যাওয়া টাকায় মদ্যপান করবে সম্প্রদায়ের জীবিতরা। সম্পদের উত্তরাধিকার বলে কিছু নেই এখানে। সারারাত নাচ চলবে, বাদ্য-বাজনা চলবে, মদ্যপান চলবে। সকালে সমাহিত করা হবে মৃতদেহ। কান্নাকাটির কোন আয়োজন নেই।

ফুরুনা গ্রামের লোকসংখ্যা তিন হাজার। চল্লিশ শতাংশ মুসলমান, কিছু খ্রীস্টান আর বাকীরা এনিমিস্ট। আইভরিকোস্টের উত্তরাংশে, গেরিলা নিয়ন্ত্রিত অংশের রাজধানী শহর বুআকে থেকে আরো পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি অখ্যাত শহর কাতিঅলা, ওখান থেকে আরো খানিকটা উত্তরে গেলে ফুরুনা গ্রাম। এই গ্রামে কোন স্কুল নেই, বিদ্যুৎ নেই, খাবার পানির একমাত্র উৎস হলো কুয়া। ফুরুনা গ্রামের তিনজন মানুষের সাথে কথা বলি। ওরা জানায় ওদের জীবন-যাপনের কথা।

‘আমার নাম আদামা কুলিবালি। আমি এই গ্রামের নেতা। আমি একজন গাড়িচালক। আমার দুই বৌ। বাচ্চা-কাচ্চা কয়জন? দাঁড়ান গুনে দেখি, ১৬/১৭ জন হবে। সকলেরই ৮/১০ জন করে বাচ্চা। আমি গ্রামের নেতা, আমারতো বেশি থাকবেই। ভূট্টা আর আনারসের চাষ করি। কাসাবা-ইয়ামতো বাড়ির আঙিনায়ই হয়। কাসাবা খাই, আলুকো খাই। নদী থেকে মাছ ধরি। বাচ্চা-কাচ্চাতো বাঁচে না। বেশি বাচ্চা থাকা ভালো। ম্যালেরিয়া হয়, পেটের পীড়া হয়, মরে যায়। চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। বিদ্যুৎ নাই। আমরা ভালোই আছি।’

‘আমার নাম কামারা পাকম। বয়স তেইশ। বুআকে শহরে কাজ করি। ইলেকট্রিশিয়ান। এখনতো কাজ নেই। যুদ্ধের আগে কাজ ছিল। আমাদের গ্রামে জন্মগ্রহন করেছেন কোলো, বিখ্যাত প্রফেসর। আমরা তার জন্য গর্ব করি। গ্রামে বিদ্যুৎ নাই, পানি নাই, স্বাস্থ্যসেবার কোন ব্যবস্থা নাই। কুয়ার পানি নোংরা। এই পানি পান করেই পেটের পীড়া হয়। পেটের পীড়ায় বেশিরভাগ লোক মারা যায়।’

‘আমি বনি কোলো। বয়স ১৪। স্কুলে যাই না। জমিতে কাজ করি। আনারস লাগাই। এক’শ আনারস এক হাজার সিফায় (বাংলাদেশি ১০০ টাকা) বিক্রি করি। কাসাবা খাই। মাঝে মাঝে মাছ পাই। ধনী মানুষ মরলে উৎসব হয়, অনুষ্ঠান হয়। তখন কাবরী (ছাগল) জবাই হয়। মাংস খেতে পাই। কাবরীর মাংস খাই আর চাপালো পান করি। মানুষ না মরলে কোন উৎসব হয় না। কোন আনন্দ নেই।’

নিরানন্দ, নিস্তরঙ্গ জীবনের একঘেয়েমী ছাপিয়ে ওদের জীবন আনন্দের তরঙ্গে ভাসে কেবল মৃত্যুর রাত্রীতে। আমাদের পেছনে ধুসর বালির ওপর তেমনি একদল মানুষ প্রিয়জনের মৃতদেহকে ঘিরে আনন্দে মেতে উঠেছে। ধু ধু বালুর ওপর আমাদের পা দেবে যাচ্ছে, সামনে চাঁদের আলোয় আমাদের ভূতুড়ে ছায়া। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি দক্ষিণে, কাতিঅলা শহরের দিকে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২২ আগস্ট, ২০০৭

কিট্টি পার্টি

শান্তি জয়দেব আমার একজন সহকর্মী। ভারত পুলিশ বিভাগের এসপি। জন্ম হায়দ্রাবাদে, গুজরাটে বহুদিনের নিবাস। তেলেগু তার মাতৃভাষা হলেও তিনি মালেআলেম, হিন্দি, ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। আমরা একই বাড়িতে থাকি। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘের আইভরিকোস্ট মিশনের পুলিশ বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য। আমরা ওদেরকে বলি উনপোল (UNPOL). ওরা প্রতি ৩০ দিন একটানা কাজ করার পর ৬দিন ছুটি নিতে পারে, কেউ কেউ ৬০দিন একটানা কাজ করে ১২ দিন ছুটি নেয়। তবে ১২ দিনের বেশী ছুটি জমানো যাবে না, নিয়ম নেই। এই ছুটিকে জাতিসংঘ বলে সিটিও (কমপেনসেটরি টাইম অফ)। শান্তি এখন সিটিওতে আছেন। সেদিন আমাকে জানালেন, তিনি একটা পার্টিতে যাচ্ছেন। মিশন জীবনের একমাত্র বিনোদন হলো পার্টি। স্ত্রী-সন্তান রেখে এই দূর দেশে পড়ে আছি। পাঁচদিন একটানা কাজ করার পর শুক্রবার সন্ধ্যাটা হলো আমাদের একটু নিঃশ্বাস ফেলার দিন। পার্টি নাইট। তীব্র রোদের ফাক গলে ছুটে আসা এক পশলা ঠান্ডা হাওয়া। সেই হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা সজীব হয়ে উঠতে চাই আরো একটি দীর্ঘ কর্মসপ্তাহ কাটানোর জন্য। কেউ পার্টির কথা বললে আমরা সচকিত হয়ে উঠি। আমি ওকে বললাম, আমাদের দাওয়াত নেই পার্টিতে? ও একটু রহস্য করে বললো, এই পার্টিতে তোমরা নিষিদ্ধ। এ আবার কেমন কথা। আমরা নিষিদ্ধ। এর মানে কি? ও বললো, পার্টি থেকে ফিরে এসে বলবো।

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে উমেশ, প্রমোদ আর আমি ওকে জেঁকে ধরলাম 'নিষিদ্ধ' কথাটির গুঢ় রহস্য উন্মোচন করার জন্য। বাইরে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা বসেছি বিশাল টানা বারান্দায়। বৃষ্টির ছাট এসে আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। আর আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে তখন লক্ষ্ণৌয়ের পুরুষ উমেশ বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বাংলা সঙ্গীতে সরব হয়ে উঠলেন, 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছো দান'। এই মানুষটির সঙ্গে এক বাড়িতে আছি আজ বেশ অনেকদিন অথচ এখনো জানতে পারলাম না, তিনি এতো সুন্দর সুর ও উচ্চারণে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারেন। গান শেষ হতেই আমরা সকলেই যেন একসাথে শান্তিকে বলে উঠলাম, এমন কি পার্টিতে আপনি গেলেন যে ওখানে পুরুষ নামক প্রাণীদের যাওয়া নিষিদ্ধ? শান্তি বললো, এই পার্টির নাম কিট্টি পার্টি। দুনিয়ার আর কোথাও এ ধরণের পার্টি হয় কি-না জানি না, তবে ভারতে এটা বেশ কমন বিষয়।

কিট্টি পার্টি শুধুমাত্র গৃহবধুদের জন্য। এর টাইম-টেবিলটাও ভিন্ন। সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা অথবা বিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা। অর্থাৎ যে সময়টা স্বামীগণ বা পুরুষরা বাইরে থাকে শুধুমাত্র সে সময়টাতেই গৃহবধুরা একত্রে মিলিত হয় নিজেদেরকে মেলে ধরার জন্য। সমমনা নির্দিষ্ট সংখ্যক গৃহবধু গড়ে তোলেন কিট্টি ক্লাব। এর উদ্দেশ্য দুটি। নিজেদের চিত্তরঞ্জনের ব্যবস্থা করা এবং কিছুটা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তৈরী করা। একটা বেশ পাকাপোক্ত এজেন্ডা থাকে প্রতিটা পার্টির। প্রথমে সবাই পাঁচ'শ টাকা করে চাঁদা দেয়। ত্রিশজনের ক্লাব হলে ১৫ হাজার টাকা হয়ে যায়। এই টাকা থেকে তিন হাজার টাকা তুলে রাখা হয় পরের সভায় সকলের জন্য ছোট ছোট উপহার, ফুল এবং পার্টির খাবার কেনার জন্য। সভার সকলেই যার যার সাধ্যমতো নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, কৌতুক ইত্যাদি পরিবেশন করেন প্রথম পর্বে। এরপর বিরতি। বিরতির সময়ে চা-নাশতা পরিবেশন করা হয়। এরপর দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্বটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সেই যে ১৫ হাজার টাকার ১২ হাজার টাকা থাকলো, এখন এই টাকা লটারীর মাধ্যমে একজন সৌভাগ্যবতী নির্বাচন করে তার হাতে তুলে দেওয়া হবে। আজ যিনি লটারীতে বিজয়ী হবেন, পরের সভায় তার নাম তালিকায় থাকবে না। অন্যদের মধ্য থেকে একজন বিজয়ী হবেন পরের দিনের লটারীতে। এমনি করে ঘুরে ঘুরে সবাই পাবেন এই টাকা। গৃহবধুদের পক্ষে একসঙ্গে এতোগুলো টাকা জোগাড় করে নিত্য প্রয়োজনীয় বড় একটা আইটেম কেনা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। কিট্টি ক্লাবের এই টাকাটা পেলে ওরা ওদের পছন্দের একটি-দুটি সামগ্রী অনায়াশেই কিনে ফেলতে পারেন। লটারী হয়ে গেলে, সকলের মধ্যে ছোট ছোট উপহার সামগ্রী এবং ফুল বিতরণ করা হয়। এভাবেই দুই থেকে তিন ঘন্টা কিট্টি পার্টির ক'জন সমমনা নারী সপ্তাহে কিংবা মাসে একটা দিন উৎসব আনন্দে মুখর হয়ে ওঠার সুযোগ পান। সংসারের নিত্যদিনের কাজকর্মে ব্যপ্ত থাকা রমনীগণ তাদের একঘেয়েমী কাটানোর জন্য কিট্টি ক্লাব গড়ে তোলার বিষয়টি আমার কাছে একটি অতি প্রসংশনীয় উদ্যোগ বলে মনে হয়েছে।

ঢাকার গৃহবধুরাও এরকম কিট্টি ক্লাব গড়ে তুলতে আগ্রহী হলে মন্দ হয় না। 'ঘর হইতে দুই পা ফেলিয়া' বের হওয়ার প্রথম সোপান। উনুনের পাশে সেদ্ধ হওয়া চমাড়া-মাংসে খানিকটা খোলা হাওয়া লাগানো। সেই হাওয়ার দোলায় মন যদি প্রজাপতি হয়, ক্ষতি কি?

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৯ মার্চ, ২০০৬

একটি বেস্ট প্র্যাকটিস, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপায়

শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন মর্নিং ওয়াকে বেরুলাম তখন আমার রিভিয়েরার বাড়িকে (এখন আর আমি ওই বাড়িতে থাকি না) প্রদক্ষিণ করে ছুটে যাওয়া দুই কিলোমিটারের সার্কেলটি একেবারে অচেনা লাগছে। রাস্তায় একটাও ঝরাপাতা নেই, ফুটপাথের ভাঙা কংক্রিটের ফাক গলে গজিয়ে ওঠা ঘাসের ডগা নেই। পাইনের কিরিকিরি পাতার যে আস্তরণ রোজ সকালে মাড়িয়ে পা ফেলি সেখানে এখন ঝকঝকে পিচঢালা পথের কালো চিতানো বুক। পথের ওপর একটাও সিগারেটের বাট নেই, আবর্জনায় নাক ডুবিয়ে পড়ে থাকা ছেঁড়া পলিথিনের ব্যাগ নেই, এমন কি পথের কোথাও এক ফোটা ধুলাও নেই। এ পথেই কি রোজ হাঁটি? আমার মতো কর্নেল এক্তেদারের চোখও ছানাবড়া। হলোটা কি, এই সাত সকালে কে এসে অমন সাফ করে দিয়ে গেল? আমাদের সকল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার অবসান ঘটলো আধকিলোমিটার পথ পার হওয়ার পরেই। যেন একটা উৎসবে মেতে উঠেছে সার্কেলের দু'পাশে বসবাসরত বাসা-বাড়ির ছ'বছরের শিশু থেকে শুরু করে ২৩/২৪ বছর বয়েসী তরুণী/তরুণ। প্রত্যেকের হাতে ঝাঁটা, মোশেইদ (রামদা জাতীয় ধারালো অস্ত্র, মাথার দিকটা প্রায় তিন ইঞ্চি চ্যাপ্টা), ময়লা তোলার কোদাল, খুন্তি, দুই/তিন মিটার পরপর নীল রঙের বালতির সারি। আর অপেক্ষাকৃত বড়রা, ময়লাভর্তি ভ্যানগুলো ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্থানে। এক্তেদার সাহেব অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, ওও তাহলে এই হলো ঘটনা!

হ্যাঁ, এই হলো ঘটনা। ঘটনাটি আমি এজন্য লিখছি, এটিকে একটি 'বেস্ট প্র্যাকটিস' হিসাবে চিহ্নিত করে আমি বাংলাদেশের মানুষকে জানাতে চাই। আজ আবিদজানের যেসব ছেলে-মেয়েরা নীল বালতি নিয়ে ভোর পাঁচটায় রাস্তায় নেমে এসেছে নিজের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য, তারা সবাই আমাদের মতোই তৃতীয় বিশ্বে বসবাসকারী স্কুল কলেছে পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে। এটা ওদের দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিস। ফরাসীরা দীর্ঘ ঔপনিবেশকালে অন্য অনেক জিনিসের মতো পরিচ্ছন্নতাও যে একটি শৈল্পিক সৌন্দর্য এই বোধ ওদের মগজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, যা ইংরেজ আমাদের শেখাতে পারে নি। এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানটি ওরা চালায় মাসে একদিন, একটি নির্দিষ্ট শনিবারে। কারো চোখে মুখে ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই, অবসন্নতা নেই। সকলেই যেন একটি উৎসব আনন্দে উদ্দিপিত, উদ্বেলিত। যেন এক মহৎ কর্মযজ্ঞে শামিল হতে পেরে ধন্য সবাই। মুখে হাসি নিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভোরের ফুরফুরে হাওয়ার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। একটু যারা বড় তারা নিজেরা কাজ করার পাশাপাশি অন্যদের কাজ মনিটরও করছে। যদি কোনো শিশু কাজ রেখে ধুলা-বালি দিয়ে খেলতে নেমে গেল, তখন হাসি দিয়ে ওকে কাজে ফিরিয়ে আনছে। ফরাসী ভাষায় এমন কিছু বলছে, অনুমান করছি, আজকের এই কাজ করাটাই একটা খেলা, এমন কিছু বুঝতে পেরে শিশুটি দৌড়ে এসে কাগজ কুড়াতে শুরু করে দিলো।

পিচঢালা পথটি দুই কিলোমিটারের একটি বৃত্ত রচনা করে যেখান থেকে শুরু হয়েছিলো আবার ঠিক সেখানে এসেই শেষ হয়েছে। অথবা বলা যায় পথটি কেবল অনন্তকাল ধরে বৃত্তাকারে ঘুরছেই, শেষ খুঁজে পাচ্ছে না। পথের ডানদিকে অর্থাৎ বৃত্তের বাইরের অংশে প্রায় পঞ্চাশ মিটার ফাঁকা জায়গা, পিচঢালা পথটির সমান্তরাল ছুটে গেছে, যা ঘাসের ঘন অরণ্য আর মাঝে মাঝে আপন মনে বেড়ে ওঠা বনবট, বিশাল মোটা মোটা নিম, পান্থনিবাস, ভোগেনভেলিয়া, মাধবীলতাসহ নানান প্রজাতির বৃক্ষলতায় শোভিত। তার পেছনেই সারি সারি হলুদ রঙের তিনতলা বাড়ি। এরই একটি বাড়িতে আমার বাস। আর বাঁ দিকে, অর্থাৎ সার্কেলের ভেতরে একই দূরত্বে গড়ে উঠেছে বিশাল জায়গা জুড়ে একেকটি নয়নাভিরাম ভিলা। একদল তরুণ অন্তহীন উৎসাহে মেশিন চালিয়ে দু'পাশের এই ফাঁকা জায়গায় গজানো ঘাসবন ট্রিম করছে। একদল ফুটপাথের পাথরের ফাঁকে গজানো ঘাসের ডগা কেটে সাফ করছে, একদল রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে, একদল কোদাল দিয়ে নীল বালতিতে পথের যতো ধূলি-কাদা, ছেঁড়া কাগজ, ময়লা-আবর্জনা, ঝরাপাতার স্তুপ তুলে নিচ্ছে। ভ্যানগাড়িগুলো কাছে এগিয়ে আসতেই ময়লাভর্তি সারি সারি নীল বালতি তাতে উপুড় হয়ে যাচ্ছে। যেন একটা প্রশিক্ষিত চেইন ওয়ার্ক। পরিস্কার করতে করতে পুরো দলটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পেছনে রেখে যাচ্ছে একটি ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন পথ ও তার পরিবেশ।

গত বছর জুলাই মাসে যখন ঢাকায় যাই, তখন দেখলাম গুলশান এক নম্বরের সেই অতি পরিচিত সার্কেলটি আর নেই। ওখানে এখন লাইট-ফাইট লাগিয়ে একটা জবরদস্ত চৌরাস্তা বানানো হয়েছে, যদিও এতে যানজট আরো বেড়েছে। সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য তারই দু'পাশে, ছোট দুটি আইল্যান্ডে, বাগান করা হয়েছে। খবরের কাগজ কিনতে যখন ডিসিসি মার্কেটে গেলাম তখন দেখি একটি ২৪/২৫ বছরের যুবক সেই বাগান সাফ করছে। ওর সাফ করার ধরন দেখে আমার খুব হাসি পেল। বাগান থেকে কুড়িয়ে এনে সে ছেঁড়া কাগজের টুকরাগুলি পথের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবলাম, ওকে দুটো কথা বলা আমার নাগরিক দায়িত্ব। এগিয়ে গিয়ে বললাম, তুমি যে কাগজের টুকরাগুলো পথের ওপর ফেলছো, এগুলোতো বাতাশে উড়ে আবার বাগানেই ফিরে যাবে। ও খুব বিরক্ত ভঙ্গিতে আমাকে বললো, তাইলে কি করুম? আমি বললাম, একটা ব্যাগ নাও। ময়লা, আবর্জনা, কাগজের টুকরা, সিগারেটের বাট এইসব কুড়িয়ে ব্যাগে ভরো। তারপর নিকটস্থ কোনো ডাস্টবিনে নিয়ে ফেল। ও বললো, ব্যাগ পামু কই?

এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য আমার কাছে নেই। তবে আমি আশা করছি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কাছে এর একটা সদুত্তর আছে। আবিদজানের এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এতো গোছানো কাজ দেখে আমার কেবল গুলশানের সেই ছেলেটির কথাই মনে পড়ছে আর চোখের সামনে ভেসে উঠছে ঢাকা শহরের, আমাদের বাড়ি-ঘরের চারপাশের, আবর্জনাময় নোংরা পরিবেশের অসহায় চিত্রটি।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৩১ মার্চ, ২০০৬

ট্র্যাশভিল রাত

দৃশ্যটা কিছুতেই মুছতে পারছি না।

হাত বাড়ালেই প্লাতু, পায়ের নিচে ট্র্যাশভিল। তার নিচে গ্রীস্মের হালকা বাতাশে কেঁপে উঠছে লেগুনের ফুলে ওঠা বুকের নীল, তারাদের প্রতিবিম্ব। পানিতে গুলিয়ে যাওয়া আলোর প্রতিবিম্ব জমাট বাঁধছে, আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাঁ দিকে প্রশস্ত রাস্তার ওপর হাজারখানেক চাকা স্থির। পুরোভাগে দু'জন মানুষ, পড়ে আছে পথের ওপর উল্টোদিকে মুখ করে। সারা পথ রক্তের নদী, ছেঁড়া শার্টে, ছেঁড়া জিনসে জবজবে রক্ত। মানুষ দুটোর হাত-পা কাঁপছে, ধর লাফাচ্ছে। মুখে মৃত্যুর ফেনা, ফুশ ফুশ শব্দ উঠছে বাতাশে। ওদের ঘিরে আছে একদল দর্শক, তামাশা দেখছে। কেউ ছোঁবে না মৃত্যুপথযাত্রী দু'জন মানুষকে। মুখোমুখি সংঘর্ষ। হোন্ডা একর্ডের সবগুলো জানালার কাচ সহস্র টুকরো হয়ে মাটিতে। পুঁজোর নাক-মুখ থেতলানো। অপেক্ষমান ভিড় দু'জন অসহায় মানুষের মৃত্যুদৃশ্য দেখছে। ভিড়ের গুঞ্জন ছাপিয়ে কারো আশঙ্কার কণ্ঠ উঠে এলো? কেউ কি চিৎকার করে বললো, হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স? এখনো সময় আছে, হয়ত বেঁচে যাবে। না, কেউ ছোঁবে না। নিয়ম নেই। সড়ক দূর্ঘটনায় আহত গাড়ি কিংবা মানুষ কোনোটাই ছোঁয়া যাবে না, যতক্ষণ না পুলিশ আসছে। পুলিশই মেপে ঠিক করবে মৃত্যুর দূরত্ব।

কি সুন্দর নিয়ম দেখেন, দুই ড্রাইভার বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরিয়েছে। কোনো ঝগড়া নেই, তর্ক-বিতর্ক নেই। পুলিশ এসে নির্ধারণ করবে কার কি অপরাধ, কে কতোটা ফাইন দেবে। কর্নেল খালেক অবাক। অবাক আমিও। গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া দ্বিধা-বিভক্ত আইভরি কোস্টের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ আইনের প্রতি কতোটা শ্রদ্ধাশীল। আশ্চর্য!

আজ সকাল থেকেই খারাপ খবর পাচ্ছি। অফিসে ঢুকেই ইয়াহু খুলে দেখি কবি সুমন রহমানের ইমেইল। সুমন লিখেছে, কবি মোস্তফা আনোয়ার মারা গেছেন। আজ সকালে। বুকের বাঁ দিকটা অজান্তেই খামচে ধরি। ওখানটা কেঁপে ওঠে, দূরে কোথাও প্রস্থানের ঘন্টা বাজে। আরো একটা রিমাইন্ডার।

এক্সেলেটরে পা কেঁপে উঠছে। ক্লাচ চাপতে গিয়ে মনে হয় জুতোর নিচে জমাট বাঁধা চাপ চাপ রক্ত, পা আটকে যাচ্ছে। লা মারিয়ামের স্যামন ফিশ পেটের ভেতর লেজ নাড়ছে। গাড়িতেই বমি হয়ে যাবে নাকি? পাশের সীটে বসে টের পান ড. মিজানুর রাহমান, পানি বিশেষজ্ঞ। মন দিয়ে গাড়ি চালানতো ভাই, গিয়ার বদলান। তখনি খেয়াল করি আরপিএম চারে।

ইমেইলটা পড়েই ঢাকায় ফোন করি। ও তখন ঘুমুচ্ছে। ঢাকায় অনেক রাত, সাড়ে বারো। এলসিসি মিটিং থেকে ফিরেই মেইলটা পড়ি। বাইরের আকাশ বাদুড়ের ডানার ফাক দিয়ে লাল হচ্ছে। একটা রেখা দিন এবং রাত্রির মাঝখানে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আধঘন্টা লিফটে আটকে থেকে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করেছে মুক্তি। পাশে অগ্নি, কোলে জল। অগ্নি বারবার মায়ের চোখের কোলে জমে উঠা ঘাম অশ্রু ভেবে মুছে দিচ্ছিলো। অগ্নির চোখ টলমল করছে, ওর ছোট্ট বুক ভয়ে ঢিপঢিপ করে কাঁপছে। গরমে চিৎকার করছে দু'বছরের জল। মুক্তি লিখেছে, আর দশ মিনিট থাকলেই সাফোকেটেড হয়ে মরে যেতাম। দায়িত্বজ্ঞানহীন কেয়ারটেকার লাপাত্তা, দারোয়ানদের কেউ জানে না কিভাবে আটকে যাওয়া লিফটের দরোজা খুলতে হয়। এলার্ম বাজছে অনবরত। ১৩টি ফ্ল্যাটের কেউ আসছে না। কেউ না কেউ গেছে নিশ্চয়ই, এ ভরসায় সবাই। টিপিক্যাল বাঙালী চরিত্র। ভাগ্যিস মোবাইলের নেটওয়ার্ক ছিলো। মুক্তি ফোন করে ঘরে, মাত্র এক ছাদ ওপরে, পাঁচতলায়। ছোট্ট পলিই তখন ভরসা। তিনতলায় ফোন করে জানায় বিপদের কথা। ওদের কাজের মেয়ে বলে, লিফটে আটকা পড়ছে আমরা কি করুম? এরপর ছ'তলা। নুরুল আমিন সাহেব ছুটে যান পাশের বাড়িতে, সাহায্যের খোঁজে। ধন্যবাদ নুরুল আমিন ভাই, আমার স্ত্রী-সন্তানদের এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য।

মোস্তফা আনোয়ার নাটকের শেষ দৃশ্যের একটা বর্ণনা দিয়েছেন সুমন রহমান। বুক উঠা-নামা করছে। কিন্তু তিনি নেই। ওটা যন্ত্র। এখানেও বুক উঠা-নামা করছে। ওটা জীবন। উঠা-নামা থেমে যাচ্ছে। ওটা নিয়ম।

আমি বাসায় ফিরছি। লা মারিয়ামের স্যামন। দুটো স্ট্রিট ঘুরে মোনালিসায় আইসক্রিম। মিজান ভাইকে দ্যু-প্লাতুতে নামিয়ে দিয়ে আবার ট্র্যাশভিল। উল্টোদিকের রাস্তা, ঠিক ওখানটা। দুটো মানুষ। ধর লাফাচ্ছে। রক্তে ভেজা শার্ট, রক্তে ভেজা প্যান্ট, রাস্তার বিটুমিন। হাসপাতালে নিলে বেঁচে যাবে কিন্তু ছোঁয়া যাবে না। নিয়ম নেই। আবিদজান শহর নিবতে শুরু করেছে। আকাশে সপ্তমী শুক্লপক্ষের বর্ধিষ্ণু চাঁদ। চাঁদের আলোয় গলছে লেগুনের নীল। রাতটা আরো দ্রুত হাঁটতে শুরু করে নির্জন অন্ধকারের দিকে। স্ট্রিট-লাইটগুলো মাছের চোখ, জেগে থাকা অসংখ্য রাতের গল্প।

আমি ঘুমুতে পারছি না। উঠে পানি খাই, পঁচ মিলিগ্রামের একটা ফ্রিজিয়াম। এটাও নিয়ম।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৭ এপ্রিল, ২০০৬

বাসিলিকা, এক বিস্ময়সুন্দরী

'সৌন্দর্যই পৃথিবীকে বাঁচাবে'--দস্তয়েভস্কি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার তার বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্যারিস যেন অক্ষত থাকে। ইতিহাসের অন্যতম খলনায়কও সুন্দরের পূজারী। সুন্দরকে ধ্বংশযজ্ঞের হাত থেকে বাঁচিয়ে প্রেমের পরীক্ষা দিলেন। প্যারিস বেঁচে গেলো তার রূপের গুনে।

১৯৮৫-র ১০ আগস্ট। ইয়ামুসুক্রো পশ্চিম আফ্রিকার তীর্থ। তিন লক্ষ লোক জড় হয়েছে সেই তীর্থে। আজ এখানে স্থাপিত হবে এক পবিত্র প্রস্তরখন্ড। স্বয়ং বিশ্বখ্রীস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু পোপ জন পল (দুই) তার নিজ হাতে স্থাপন করবেন এ পবিত্র প্রস্তরখন্ড। মাথা নিচু করে পোপের সামনে এসে দাঁড়ালেন ২৫ বছরের পরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট ফেলি উফুয়ে বৈগ্নি, আইভরিকোস্টের নেতা, পর্বতশৃঙ্গের চেয়েও উঁচু এক মানুষ। আকাশে মাথা। আকাশ মাটিতে নত আজ। পোপের হাত উপুড় হলো বৈগ্নির মাথায়। আশির্বাদ। ঈশ্বর তোমার স্বপ্ন পূরণ করুন, আমিন। তিন লক্ষ আইভরিয়ানের নতমুখ ইয়ামুসুক্রোর মাটিতে খোঁজে আকাশের ছায়া।

প্রস্তরখন্ড বড় হতে শুরু করে, বড় হতে হতে আকাশ ছোঁয়। ভ্যাটিকানের চেয়েও উঁচু এক উপাসনালয় আইভরিকোস্টের মাটিতে শেকড় প্রোথিত করে, মাথা তোলে মেঘের রাজ্যে। সদর্পে দাঁড়িয়ে যায় 'দি বাসিলিকা অফ আওয়ার লেডি অফ পিস'। এক'শ আটান্ন মিটার উঁচুতে নক্ষত্রখচিত আকাশে জ্বলছে এক উজ্জ্বল ক্রশচিহ্ন। আন্তজার্তিক সংস্থাসমূহের

বিস্মিত চোখ সানগ্লাসের আড়ালে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। এ গরীব দেশে! হায়রে অপচয়! কত খরচ হলো এতে? বৈগ্‌নি বলেন, ঈশ্বরের জন্য যা ব্যয় করবে তার হিসেব রাখবে না। সবাই চুপ। বাসিলিকার কোনো হিসাব নেই, কোনো একাউন্ট নেই। ঈশ্বরই এর হিসেবরক্ষক। আইভরিকোস্টের জনক প্রেসিডেন্ট উফুয়ে বৈগ্‌নি তার উষ্ণ বুকে চেপে ধরেন বাসিলিকার আর্কিটেক্ট লেবানিয় নাগরিক পিয়েরে ফাকুরিকে। বৈগ্‌নির আশির্বাদের পুস্পবৃষ্টি ঝরে পড়ে পেট্রিকের মাথায়। পেট্রিক দুতুইলে, বাসিলিকার নান্দনিক পরিচালক।

১৭ এপ্রিল ২০০৬। খা খা দুপুর। একদল বাংলাদেশী পর্যটকের পা পড়ে বাসিলিকায়। নীল জলাশয়, অনন্ত নারকেল বিথী, ১৭ কিলোমিটার পরিসীমা--এক রাজবাড়ি, ইতস্তত হেঁটে বেড়ানো কালো মানুষের বিরল বসতি, এর মাঝখানে একখন্ড হীরের দ্যুতি, দি বাসিলিকা অফ আওয়ার লেডি অফ পিস। মানুষের তৈরী এক বিস্ময়। প্রেম ও শান্তির স্বর্গ। বাসিলিকার আঙিনায় দাঁড়িয়ে পোপ বলেন, *‘ও আওয়ার লেডি অফ পিস, কিপ দ্যা হিউম্যান ফ্যামিলি অলওয়েজ ইন পিস’।* বাসিলিকার এক’শ ত্রিশ হেক্টর চত্বরে পা দিয়েই আমাদের গাইড আইভরিয়ান যুবক শার্লস জানালো, *‘উই আর নো মোর ইন কোত’দি ভোয়া, নাও উই আর ইন ভ্যাটিকান সিটি’।* পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই? ঈশ্বরের ঘরে যেতে কোনো ভিসা লাগে না। আমরা ঈশ্বরের দরোজায় কড়া নাড়লাম। আঙুল ছোঁয়াতেই দুই টন ওজনের এক একটি স্টেইন্ড গ্লাসের দরোজা খুলে গেল। বাসিলিকার মূল দরোজা উন্মুক্ত হতেই বাংলাদেশী পর্যটক দলটি ঢুকে পড়লো ৩২০টি জায়েন্ট থামের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক সুবিশাল ধর্মপ্রাসাদের ভেতর। এরই ছয়টি থামের ভেতরে রয়েছে ওপরে ওঠার জন্য ছয়টি এলিভেটর আর চারটিতে পেঁচানো সিঁড়ি। ফ্লোরে বিছানো বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান মার্বেল পাথর, ৭০ হাজার বর্গমিটার চত্বরে শুয়ে আছে ইতালী, স্পেন ও পর্তুগাল। একসঙ্গে সাত হাজার ধর্মপ্রাণ খ্রীস্টান বসতে পারে বাসিলিকার ভেতরে, কক্ষের অভ্যন্তরে দাঁড়াতে পারে আরো পনের হাজার। প্রর্থনাসভা বসে প্রতি রোববার, চারজন পোলিশ ফাদার খ্রীস্টীয় দীক্ষা ছড়িয়ে দেন কাকাওয়ের দেশে, কালো মানুষের লাল রক্তের ভেতর, হলুদ মগজের ভেতর। প্রার্থনা সঙ্গীতে ব্যবহারের জন্য দূর আমেরিকা থেকে আনা হয়েছে বিশাল এক ইলেক্ট্রিক অ্যালেন অর্গ্যান।

হোলিজলে হাত ভিজিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালাম, ডানে বাঁয়ে কনফেশন রুম। কিছু কি ছলকে উঠছে মনের গহনে, গোপন কোনো পাপের কথা? আকাজু কাঠের নারী তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তখন মৃদু হাসছে। কাছে এগিয়ে যেতেই ওর রাগী মুখ। ভাস্কর সরোর অসাধারণ কাজ। থামের ভেতর দিয়ে উঠে এলাম ওপরে, ঠিক ডোমটার নিচে। স্টেইন্ড গ্লাসে মোড়ানো পুরোটা ডোম ভেতর দিক থেকে। বাইরের সূর্য কোনো এক বিস্ময়কর উপায়ে গ্লাসের ওপর পড়ে তৈরী করেছে অসংখ্য আলোর রঙিন ফোয়ারা, সেই ফোয়ারাই এই মুহুর্তে বাসিলিকার অভ্যন্তরভাগের একমাত্র আলোর উৎস। বহুবর্ণের আলোয় উদ্ভাসিত বাসিলিকার অভ্যন্তরভাগের রূপমাধুর্যে মুগ্ধ বাংলাদেশী দলটি এগিয়ে যায় এর ছাদের উঠানে। সামনে প্রকান্ড বাগান। সবুজের সারি। বহু বর্ণের ফুলের হাতছানি। বাসিলিকার মূল ভবনের দুপাশ থেকে দুটি কার্ব প্যাসেজ ছুটে গিয়ে নির্মাণ করেছে একটি মুখ খোলা বৃত্ত। বৃত্তমুখের দু’পাশে সোনারঙ দুটি বিশাল মেরিমূর্তি।

ওইতো, ৩৭ হেক্টর বাগান। যেখানে দুপুরের লু হাওয়ায় দুলছে ৪ লক্ষ প্রজাতির ফুল ও সৌন্দর্যবিলাস বৃক্ষ-তৃণ-লতাগুল্ম। বাগান পেরুলেই ইয়ামুসুক্রুর আড়াই’শ মিটার প্রশস্ত প্রধান সড়ক। সড়কের ওপাশেই নেচারাল লেক, হাজারো কুমীরের অভয়ারণ্য। আর তার পাশে কি ওটা, বিশাল পাচিলঘেরা এক গ্রাম? পুরো গ্রামটিই এখন রাজবাড়ি। প্রেসিডেন্ট বৈগ্‌নির রাজপ্রাসাদ। হায়রে রাজপ্রাসাদ। বৈগ্‌নি এখন কেবলই ইতিহাস, আর এই রাজবাড়িটি, ইতিহাসের ফসিল। তবু লালন। *‘এমন মানব জনম আর কি হবে?/ মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে’।*

ইয়ামুসুক্রু বেঁচে থাকবে। এই গৃহযুদ্ধের আগুনের ভেতর, সন্ধ্যার আকাশে উড়ে বেড়ানো হাজারো বাদুড়ের ডানা আর বহুজাতিক শকুণের ভাগাড় পেরিয়ে এক বিস্ময়কর সুন্দরের প্রতিভূ, বাসিলিকার জন্য।

আবিদজান
৪/৫/০৬

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০৬, বুনোহাতির স্বপ্নযাত্রা

বোর্ডিং কার্ড নেবার সময় কৃষ্ণসুন্দরীকে বললাম, উইন্ডো সিট প্লিজ।

প্লেনে উঠে আমি সবসময় প্রার্থনা করি পাশের সিটে যেন কোনো যাত্রী না বসে। তাহলে কিছুটা হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসা যায়। সাড়ে দশ ঘন্টার আকাশভ্রমণ, আবিদজান থেকে দুবাই। আরাম করে বসতে না পারলে ভ্রমণের ধকলটা বেড়ে যায়। আমার এই প্রার্থনা প্রায়শই কবুল হয়। আজ হলো না। পাশের সিটে এসে বসলেন পিটানো স্বাস্থ্যের এক জবরদস্ত কালো পুরুষ, সাড়ে ছয়ফুল লম্বা, বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। বসেই আমার দিকে তাকিয়ে হাতির দাঁত দেখালেন। আমিও জবাবে ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। এরপর আধঘন্টা। দুজনের মুখ দু'দিকে। বর্ণবৈষম্য এক ভয়ঙ্কর পাপ। কথাটা মনে হতেই বোঁটকা গন্ধ অতিক্রম করে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমি কাজী, অনুসিতে কাজ করি। ও জানালো, ওর নাম এমেঁ, আইনজীবী ফুটবল খেলোয়াড়। যাচ্ছে তুরস্কের আনাতলি, আইনজীবী ফুটবলারদের বিশ্বকাপ খেলতে। বিষয়টা আমি প্রথমে বুঝতেই পারি নি। ভেবেছিলাম ও বুঝি আইভরিয় ফুটবল দলের আইনজীবী, জার্মানীতে যাচ্ছে দলের সাথে। আমার চোখ সবুজ টি-শার্ট আর লাল ক্যাপ পরা ৪৫ জন যুবকের ভিড়ে একটি মুখ খুঁজতে শুরু করলো, যার নাম দিদিয়েৰ্খ দ্রগবা। দ্রগবা আইভরিকোস্ট বিশ্বকাপ স্কোয়াডের দলনেতা। আইভরিকোস্টের সোনার ছেলে। ইংল্যন্ডের চেলসিতে খেলে। চেলসির অ্যাসেট।১ কোটি ৭০ লক্ষ আইভরিয় অধীর আগ্রহে যার পায়ের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনায় কেঁপে উঠছে। এমেঁকে প্রশ্ন করলাম, কি আশা করছো? ও বললো, দ্রগবা যদি জ্বলে উঠতে পারে তাহলে আমরা কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌছে যেতে পারি।

একদিন সকালে অফিসে গিয়ে শুনি, আজ তিনটায় অফিস ছুটি। কারণ হাতিরা আজ ফুটবল খেলবে। নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে আফ্রিকান কাপের সেমিফাইনাল। পুরো আবিদজানে টানটান উত্তেজনা। আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে শুধু একটাই কথা, ফুটবল। রাস্তায় রাস্তায় আইভরিকোস্টের পতাকাশোভিত গাড়ির মিছিল, তরুণ-তরুণীর কণ্ঠে একটিই অমিয় স্লোগান, দ্রগবা, দ্রগবা। হাতিদলের রাজাহাতি দ্রগবা। ঘরে ফিরেই টিভির সামনে বসে পড়লাম। ৯০ মিনিটের ছন্দময় ফুটবল। হাতিরা জিতে গেল। এবার ফাইনাল। স্বাগতিক মিশরের বিরুদ্ধে। আমরা আবারো একটি অর্ধদিবস ছুটি পেলাম। ফাইনালে দ্রগবা জ্বলে উঠতে পারেন নি। কম করে হলেও তিনটি চমৎকার গোলের সুযোগ নষ্ট করেন তিনি। গোলশূন্য খেলা টাই ব্রেকারে গড়ায়। দ্রগবা মিস করলেন। কান্নার রোল উঠলো পুরো আইভরিকোস্টে। হাতিরা হেরে গেল। এ কষ্ট ক্ষণিকের। ১৭ মিলিয়ন মানুষের চোখ পরক্ষণেই জ্বলে ওঠে। হাম্বুর্গে নিশ্চয়ই দ্রগবা যাদু দেখাবে।

উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত আইভরিকোস্ট চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বুকে নিয়ে ঝিম মেরে আছে। সকলের চোখ এখন জার্মানীতে। জার্মানীর যুদ্ধটা খুব সহজ হবে না জানেন আইভরিয়রা। 'সি' গ্রুপে সার্বিয়াকে সহজভাবে নিলেও অন্য দুই পরাশক্তি আর্জেন্টিনা এবং ফিফা র‍্যংকিংয়ে তিন নম্বরে থাকা হল্যান্ডের যে কোন একটিকে টপকে দ্বিতীয় পর্বে ওঠা হবে এক অসাধ্যসাধন। আবিদজানের পথে-প্রান্তরে এখন এটাই আলোচনার বিষয়। নড়ে-চড়ে বসলো এমেঁ। প্লেনের চাকা তখন রানওয়ের মাটি ছুঁয়েছে। ঘানার রাজধানী আক্রা বিমানবন্দর। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের দেশ। ঘানাও এবার বিশ্বকাপ খেলবে। খেলবে আইভরিকোস্টের আরেক প্রতিবেশী দেশ টোগো। ভাবতে অবাক লাগে পশ্চিম আফ্রিকার তিনটি দরিদ্র প্রতিবেশী দেশ একসাথে বিশ্বকাপের চূড়ান্তপর্বে খেলতে যাচ্ছে। গত আঠারো মাসে আইভরিকোস্টের বাণিজ্যিক রাজধানী আবিদজানকে মোটামুটি চষে ফেলেছি। যে শহরটিকে বলা হয় পশ্চিম আফ্রিকার প্যারিস। একটি মাত্র স্টেডিয়াম ছাড়া ফুটবল খেলার উপযোগী তেমন কোনো মাঠ আমার চোখে পড়ে নি পুরো আবিদজানে। ছেলেরা রাস্তার ওপর কাঠের মোবাইল গোলপোস্ট পেতে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-বিকেল ফুটবল খেলে। গাড়ি এলে সেই খেলা থেমে যায়, গাড়ি চলে গেলে আবার খেলা শুরু হয়। পেটে খাবার নেই, মাথার ওপর নিরাপদ ছাদ নেই, রাজনৈতিক স্থিতি নেই, কাজ নেই, টাকা নেই কিন্তু ফুটবল আছে। যে কেউ, যখন-তখন ফুটল খেলতে নেমে পড়ে। এমেঁ বললো, আমি খুব আশাবাদী। আমাদের ২৩ জনের যে স্কোয়াড তারা সবাই ইউরোপের মাঠ ও প্রকৃতির সাথে পরিচিত। দলের ২২ জনই ইউরোপের বিভিন্ন ক্লাবে খেলে। তার মধ্যে ১৩ জন খেলে ফ্রান্সে আর ৩ জন ইংল্যন্ডে। জার্মানীতে খেলা প্লেয়ারও রয়েছে। আর দেখো ফিফা র‍্যংকিংয়েও আমাদের অবস্থানটাও খারাপ না, ৩২ নম্বরে আছি। দ্রগবা ছাড়াও দলের ১০ নম্বর জার্সিধারী গিলে ইয়াপি ইয়াপো এবং ৯ নম্বর জার্সিধারী অরুণা কোনে খুব উঁচুমাপের খেলোয়াড়। যদিও আমরা এই প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এলিফ্যান্টরা একটা কিছু ঘটাবে।

একখন্ড মেঘ জানালার কাচ ছুঁয়ে উড়ে গেল। এমেঁ আমাকে প্রশ্ন করলো, তোমার কি মনে হয়? আমরা কি খালি হাতে ফিরে আসবো? প্রশ্নটা করেই ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সেই চোখে স্বপ্নের ঘোর। টলমল করছে ওর বড় বড় কালো চোখ দুটি। আমি জানি জাতিগত দ্বন্দ্ব সংঘাতে জর্জরিত একটি বিভক্ত দেশের এই যুবক কি শুনতে চায় আমার কাছে। ফুটবলকে কেন্দ্র করে এক নতুন স্বপ্নের সৌধ রচনা করেছে রাজনৈতিক দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান আইভরিয়গণ। সমস্ত সংঘাত, সমস্ত দ্বিধা, জাতিগত বিদ্বেষ ভুলে আজ ১৭ মিলিয়ন আইভরিকোস্টবাসীর স্বপ্ন একটি বিন্দুতে এসে স্থির হয়েছে। ১৭ মিলিয়ন মানুষের স্বপ্নের প্রতিফলন আমি দেখতে পাচ্ছি এমেঁ নামের এই যুবকের তৃষ্ণার্ত চোখে। ওর চোখদুটিইতো সেই রূপকথার গজমোতি। আমি কোনোরকম দ্বিধা না করেই বললাম, একদল বুনো হাতি প্রতিবন্ধকতার দেয়াল ভেঙেছে। ওদের আর ঠেকানো যাবে না।

জাতির ক্রান্তিলগ্নে ওরাও একমত হতে পারে।

জাতিসংঘের একজন আন্তর্জাতিক বেসামরিক কর্মকর্তা হিসাবে ডিপার্টমেন্ট অব পিস-কিপিং অপারেশনস-এর (ডিপিকেও) আইভরিকোস্ট মিশনে কাজ করছি গত ডিসেম্বর ২০০৪ থেকে। গত ১৮ মাসে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। তারই একটি ঘটনা তুলে ধরছি এই কলামে।

২০০০ সালের রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়াতে পূর্ব-পশ্চিমে একটি রেখা টেনে পুরো দেশটিকে দু'ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টান অধ্যুষিত দেশের দক্ষিণাংশের কর্তৃত্ব ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবো সরকারের হাতে। আর অপেক্ষাকৃত মুসলিম এবং ইমিগ্র্যান্ট অধ্যুষিত দেশের উত্তরাংশ সাবেক প্রধানমন্ত্রী আলাসান উয়াত্তারা সমর্থিত গেরিলানেতা গুইলামো সরোর দখলে। জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের চাপের মুখে দুই দলই ঘাপটি মেরে বসে আছে। ২০০৫-এর ডিসেম্বরে বাগবো সরকারের মেয়াদ শেষ। এর মধ্যে জাতিসংঘের তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে একটি অবাধ ও সর্বজনগ্রাহ্য নির্বাচন, গঠিত হবে আইভরিকোস্টের নতুন গণতান্ত্রিক সরকার, অবসান ঘটবে পশ্চিম আফ্রিকার সুপার পাওয়ার বিশ্বের ৮০ শতাংশ কোকো উৎপাদনকারী দেশ আইভরিকোস্টের রক্তক্ষয়ী সংঘাতময় রাজনীতির। এ প্রত্যাশা গেরিলা নেতৃত্বাধীন পাহাড়-পর্বতে ঘেরা দেশটির উত্তরাংশের। গালফ অব গিনির উপকূলে দাঁড়িয়ে থাকা অতলান্তিকের মুকুট নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আইভরিকোস্টের দক্ষিণাংশের নেতৃত্ব অবশ্য তা চান না। প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবো যে কোনো উছিলায় ক্ষমতা ধরে রাখতে চান। কি হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫-এর পর যদি বাগবো ক্ষমতা না ছাড়ে? এর উত্তর নেই দেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কাছেও। বাগবো অনড়, সিংহাসনে তার মরণ কামড়। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের চাপে দফায় দফায় মিটিং হচ্ছে বিবদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে। গেরিলারা চলমান সাঁজোয়া বহরের নিরাপত্তাবেষ্টনী বগলে করে আবিদজান আসছেন। টেবিলে অস্ত্র রেখে মিটিং করছেন। কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না। সন্ধ্যার আকাশে প্রতিদিনের মতো ভুতুড়ে বাদুড়ের হাজারো কালো ডানা। আবিদজানের সিভিল সোটাইটি উদ্বিগ্ন। কি হবে ৩১ ডিসেম্বরের পর? গেরিলাদের এক দাবী, বাগবোকে সরে দাঁড়াতে হবে। বাগবোর এক কথা, দেশের এই অরাজক পরিস্থিতিতে নির্বাচন হতে পারে না। এদিকে সংবিধানের আর্টিকেল ৩৫ অনুযায়ী কোনো হাফ আইভরিয়ান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অযোগ্য। যে কারণে ২০০০ সালের নির্বাচনে আলাসান উয়াত্তারার প্রার্থিতা বাতিল ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। উয়াত্তারার বাবা খাঁটি আইভরিয়ান হলেও, তার মা ছিলেন বুরকিনা ফাসোর (আপার ভোল্টা) রাজকন্যা। আলাসান উয়াত্তারাকে ছাড়া নির্বাচন? অসম্ভব। আইভরিকোস্টের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কথা চিন্তাই করা যায় না। আবারো আন্তর্জাতিক চাপ। আর্টিকেল ৩৫ সংশোধন করতে হবে। বাগবো বলেন, সংসদে তুলবো। কিন্তু গেরিলারা তা মানবে না। সংসদতো বাগবোর অনুগতদের দখলে। আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকে। অবশেষে বাগবো তার মেয়াদকালের মধ্যেই প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতাবলে সংশোধন করেন আর্টিকেল ৩৫। উৎসবে মেতে উঠে উত্তর, শুরু হয় উদ্দাম নৃত্য, শূন্যে লাফিয়ে উঠে হাজার হাজার বোতল শ্যাম্পেইনের উচ্ছাস।

আর মাত্র ক'দিন। ৩১ ডিসেম্বর সমাসন্ন। বাগবো সরকারের সময় শেষ, অথচ নির্বাচনের কোনো প্রস্তুতি নেই। কি হবে এখন? উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় কাটে প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত। দাঁত বের করে হাসে কেউ কেউ। আবার এটা ফ্রান্স হবে! স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতা নেই আমাদের! রাস্তার টহল বাড়ে। সাঁজোয়া নামে। ফরাসী এপিসিগুলি ভূতের মতো নিঃশব্দে হাঁটে সমস্ত আবিদজান শহরে। জাতিসংঘের শাদা জিপগুলি হাওয়া। কোনো নিরাপদ গর্তে ঢুকে পড়েছে নিশ্চয়ই। আমরা

টের পাই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এর মধ্যে উত্তর-দক্ষিণের সীমান্তরেখা, 'জোন অব কনফিডেন্স' অতিক্রম করতে গিয়ে জাতিসংঘ মিলিটেরির হাতে ধরা পড়ে একদল সরকারী পেটোয়া বাহিনী, 'ইয়াং পেট্রিয়ট' নামধারণ করে যারা দক্ষিণের মাঠ গরম রাখছে সারাক্ষণ। আমাদের ওয়্যারলেস সেটগুলো গরম হয়ে ওঠে। মুভমেন্ট রেস্ট্রিকটেড হয়ে যায়। নো বিচ, নো নাইট ক্লাব। সন্ধ্যার পরে সুনসান নীরবতা। শহরে টানটান উত্তেজনা। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। গেরিলারা কি শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে দক্ষিণে চলে আসবে? প্রস্তুত ইয়াং পেট্রিয়টও। এবার জমবে খেলা। রক্তের হোলিখেলা। কচি শিশুদের আঙুলগুলি কড়মড়িয়ে খাবে একদল জিঘাংসী কালো মানুষ। মানুষের মাথার খুলি দিয়ে ফুটবল খেলবে অন্যদল।

শুরু হয় আন্তর্জাতিক মিডিয়েশন। জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন মিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গড়ে তোলে নতুন সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (আইডব্লিউজি)। আইডব্লিউজির নেতৃবৃন্দ বিবদমান দু-গ্রুপের সাথেই দফায় দফায় মিটিং করেন। কিন্তু তেমন ফল হয় না। দু গ্রুপ-ই নিজেদের অবস্থানে অনড়। মিটিং বসে নিউ ইয়র্কে, জাতিসংঘের সদর দফতরে। নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়, আইভরিকোষ্টের বর্তমান পরিস্থিতির একমাত্র ওয়ে আউট হলো, বিবদমান গ্রুপগুলোর সকলের সম্মতিসাপেক্ষে একজন নিরপেক্ষ আইভরিয়ান খুঁজে বের করা এবং তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগদান করা। প্রধানমন্ত্রীর কাজ হবে গেরিলাদের নিরস্ত্রিকরণ, সঠিক ভোটার লিস্ট প্রনয়ন এবং আগামী ৩১ অক্টোবর ২০০৬-এর মধ্যে সকলের গ্রহনযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। সেই সময় পর্যন্ত লরেন্ট বাগবোই প্রেসিডেন্ট থাকবেন কিন্তু তার হাতে কোনো নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীই হবেন দেশের নির্বাহী প্রধান। সিদ্ধান্ত মেনে নেয় সকল গ্রুপই। শুরু হয় নির্দলীয়, নিরপেক্ষ আইভরিয়ান খোঁজার পালা। আইডব্লিউজি সকল রাজনৈতিক দলের কাছে নাম চেয়ে পাঠায়। ২২ জনের এক দীর্ঘ তালিকা তৈরী হয়। সেই তালিকায় গেরিলা নেতা গুইলামো সরোর নামও উঠে আসে।

দফায় দফায় মিটিং বসে। প্রত্যেকের ফাইল তলব করা হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হয় ব্যক্তিগত ক্রাইম রেকর্ড, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, বিদেশ কানেকশন, ঋণ প্রোফাইল আরো কত কি। তালিকা ছোট হতে থাকে। ছোট হতে হতে নেমে আসে পাঁচ-এ। এরপর তিন, এরপর দুই। শেষমেষ সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মতিসাপেক্ষে মনোনীত হয় সবচেয়ে যোগ্য এবং নিরপেক্ষ আইভরিয়ান, দেশের ক্রান্তিকালের প্রধানমন্ত্রী জনাব চার্লস কোনান বেনিকে।

যে দেশ গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ দাবানলের ভেতর দিয়ে এগুচ্ছে, যে দেশ কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত, যে দেশের নেতৃত্বকে টেবিলে অস্ত্র রেখে মিটিং করতে হয়, যে দেশের মানুষ প্রতিহিংসাবশত শত্রুর বুক ছিঁড়ে কলিজা বের করে চিবিয়ে খায়, তারাও জাতির ক্রান্তিলগ্নে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, সকলে একমত হয়ে একজন নিরপেক্ষ লোক খুঁজে বের করতে পারে, ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

নাইরোবিতে চার ঘন্টা

অন্ধকারের আঁড়াল থেকে একটা ঠান্ডা বাতাশের ঝাপ্টা এসে কানের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। সাথে সাথে শরীরে হালকা কাঁপুনি অনুভব করলাম। প্লেন থেকে নামতে হলো রানওয়ের ওপর। এরপর হেঁটে হেঁটে এরাইভাল লাউঞ্জ। নাইরোবিতে ছয়ঘন্টার যাত্রাবিরতি। চুপচাপ এয়ারপোর্টে বসে না থেকে শহরে একটা চক্কর মারলে কেমন হয়? সোয়া ছয়টা বাজে। এখনো ভোরের আলো ফোটে নি। আকাশী রঙের লেইস্যাস প্যাসারটা (ইউএন পাসপোর্ট) বাড়িয়ে দিতেই সবে কুড়ি উত্তীর্ণ সাপের মতো ছিপছিপে এক কৃষ্ণ সুন্দরী, কেনিয়ান ইমিগ্রেশন অফিসার, একটি অভিনন্দনের হাসি উপহার দিল। খটাশ করে এলপিতে স্ট্যাম্প করেই বললো, ওয়েলকাম টু নাইরোবি। সবুজ পাসপোর্টের মালিক, একজন গর্বিত বাংলাদেশী, হিসাবে পৃথিবীর নানান দেশের বিমানবন্দরে অহেতুক হয়রানী হবার কম অভিজ্ঞতাতো আর জমা হয় নি ঝুলিতে। তাই এই কেনিয়ান সুন্দরীর উষ্ণ অভিনন্দনটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। মনে হয় সময়টা ভালোই কাটবে।

ইকুয়েটরের ওপর শুয়ে থাকা চিরবসন্তের দেশ কেনিয়া। তাপমাত্রা সারাবছরই ১৮ থেকে ২২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আরো একটি কারণে কেনিয়া বিশ্বখ্যাত, বন্যপ্রাণীর সবচেয়ে নিরাপদ অভয়ারণ্য বলে সারা বিশ্বে কেনিয়ার রয়েছে বিশেষ সুনাম। মাদাগাসকারের এক যুবক ইমিগ্রেশন পেরিয়েই সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। 'আপনি কি ট্রানজিট প্যাসেন্জার?' প্রশ্নটা করেই তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে, হাসি হাসি মুখ। আমি সম্মতিসূচক মাথা দোলাতেই ওর হালকা হাসির আভাসটি পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়লো। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, চার্লস। আমিও। চলেন দু'জনে মিলে একসঙ্গে শহরে বেড়াতে যাই। ট্যাক্সি ভাড়াটা শেয়ার করা যাবে।

শেষ পর্যন্ত ওর সাথে পোষালো না। বেচারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাক্তারি পড়ে। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে। পকেটের অবস্থা তেমন ভালো না। ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে ওর দর কষাকষির ধরন দেখে বিষয়টা ট্যুরিস্ট কম্পানিগুলিও বুঝে ফেলেছে। তাই ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো আমাকে এন্টারটেইন করতে। ১০ হাজার কেনিয়ান শিলিং (৮০ শিলিংয়ে ১ ডলার) দিয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। ওর সঙ্গে চুক্তি হলো, চার ঘন্টায় ও আমাকে পুরো নাইরোবি শহর ঘুরে-ফিরে দেখাবে। আলেক্সান্ডারের মার্সিডিজ ছুটে চলেছে শহরের দিকে। দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ। আকাশ এখনো বেশ মেঘলা। সকাল সাতটা বাজে অথচ অন্ধকারের চাদরটা এখনো ঝুলে আছে ফসলের মাঠে। হঠাৎ হঠাৎ একদল গাভীর মতো ফসলের মাঠে চড়ে বেড়ানো মেঘেরা পথের ওপর বেরিকেড দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। দাঁড়িয়ে পড়ছে আমাদের মার্সিডিজও। গতি মন্থর করে ধীরে ধীরে মেঘের বেরিকেড ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে আলেক্সান্ডারের মার্সিডিজ। বিমানবন্দর থেকে নাইরোবি শহর অনেক দূরে। প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পথ। রাস্তা তেমন ভালো না। খানাখন্দে পড়ে মাঝে মাঝেই শূন্যে লাফিয়ে উঠছে গাড়ি।

১৯৬৩ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশ তাড়িয়ে স্বাধীনতা লাভ করে কেনিয়া। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কেনিয়ার জাতির পিতা দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট জুমো কেনিয়াত্তা। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত, আমৃত্যু তিনিই কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দেশটির মোট জনসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি, আয়তন পাঁচ লক্ষ তিরাশি হাজার বর্গকিলোমিটার। প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে মাত্র ৬০জন। আফ্রিকার অন্যান্য অংশের মতোই বিরল বসতির দেশ কেনিয়া। আগামী ১০০ বছরেও কেনিয়ার জনসংখ্যা তেমন বাড়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ এইডস এক ভয়ানক দানবরূপে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে কেনিয়ানদের। প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যুহার। জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ খ্রীস্টান, ৬ শতাংশ মুসলমান আর বাকীরা বিভিন্ন আদি ধর্মের অনুসারী। ৯৭ শতাংশ লোকই অফ্রিকার কালো মানুষ, বিভিন্ন এথনিক গ্রুপে বিভক্ত। তিন শতাংশ এশিয়ান ইমিগ্র্যান্ট, মূলত ভারতীয় এবং পাকিস্তানী। ইমিগ্র্যান্টরা বসবাস করে দেশের বড় তিনটি শহরে, নাইরোবি, মুম্বাসা এবং কিমুসুতে। পূর্বদিকে ভারত মহাসাগরের উপকূলে রয়েছে কেনিয়ার ৫৩৬ কিলোমিটার জলসীমান্ত। অন্য তিনদিকে ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, সুদান, তানজানিয়া এবং উগান্ডার সাথে রয়েছে ৩৪৭৭ কিলোমিটার স্থলসীমান্ত।

শহরে ঢুকবার মুখেই একটি চেকপোস্ট। আলেক্সান্ডার জানালো, ওরা আমার পাসপোর্ট দেখতে চাইতে পারে। ইদানিং প্রচুর অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট আসছে এশিয়া থেকে। তাই এই কড়াকড়ি চেকিং ব্যবস্থা। গাড়ির গতি কমালো ড্রাইভার। ওরা গাড়ির ভেতরে একটু উঁকি দিয়ে ছেড়ে দিল। শহরে ঢুকেই আমার মনে হলো আমি বোধ হয় কোন একটি চিড়িয়াখানায় ঢুকে পড়েছি। রাস্তার দু'পাশে প্রকান্ড সব বৃক্ষের সারি। গাছের ডালে ডালে বসে আছে বিশাল আকৃতির একেকটা ধনেশ পাখি। ওরা কেউ কেউ ওদের হলুদ চঞ্চু ডানার আঁড়ালে গুঁজে পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে। আবার কেউ এইমাত্র কোন জলাশয় থেকে তুলে আনা একটি মাছ শিশু পাখিটির মুখে তুলে দিচ্ছে। ওদের ডানায়, ওদের চোখে, পালকে, পায়ে, চঞ্চুতে নেই এতটুকু ভয়ের জড়তা। দু'একটি পাখি আবার ডানা মেলে দিয়ে নেমে এসেছে পথের ওপর। আর তখন গাড়িগুলো গতি কমাচ্ছে, পথচারীরা ওদেরকে পাশকাটিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অন্যান্য আরো অনেক ছোট পাখিও গাছগুলিতে কলরবমূখর। আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এইসব পাখি ধরে খাও না? ও বললো, তোমার কি মাথাখারাপ? সঙ্গে সঙ্গে জেলে নিয়ে যাবে। কেনিয়ার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন খুবই কড়া। আর আইনের প্রয়োগ তার চেয়েও বেশি কড়া। যেখানে গাছপালা একটু ঘন সেখানে মাটিতে পড়ে আছে দু'একটি মৃত পাখির শব। আর সারা শহরেই পাখির পালক ছড়ানো। আকেক্সান্ডারকে বললাম গাড়ি থামাও। গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা বুনো গন্ধ এসে নাকে লাগলো। সেই গন্ধে পাখির বিষ্ঠা ও পালকের ঝাঁজ আছে বৈ-কি।

হাতির দাঁতের দুটি জায়েন্ট তোরণ পেরিয়ে শহরের অন্য প্রান্তে নিয়ে এলো আলেক্সান্ডার। এই শহরে হাতে গোনা কয়েকটি হাইরাইজ বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি। আমাদের মতিঝিল কিংবা নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের মতো সারি সারি হাইরাইজ চোখে পড়ছে না। ম্যানহাটন, মতিঝিল, এমন কি আবিদজানের প্লাতুতে ঢুকলেই কিংবা দূর থেকে দেখলেই মনে হয় এটিই হলো এই শহরের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা। নাইরোবিতে আলাদা করে সেইরকম একটি বাণিজ্যিক এলাকা আমার চোখে পড়ছে না। এখন আমরা শহরের খানিকটা বাইরের অংশে। এই এলাকায় সারি সারি একই প্যাটার্নের

একতলা/দোতলা বাড়ি। আলেক্সান্ডার জানালো, এটা হলো এশিয়ানদের এলাকা। এখানেই ইন্ডিয়ান-পাকিস্তানীরা থাকে। বলেই সে গাড়ি থামালো। দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে এলাম। রাস্তায় রাস্তায় দলে দলে ইন্ডিয়ান-পাকিস্তানী লোকেরা হাঁটছে, উর্দু-হিন্দিতে কথা বলছে, শুভেচ্ছা বিনিময় করছে, কেউ কেউ এই সাত-সকালেই পান চিবুচ্ছে। কোনো কোনো বাড়ি থেকে হিন্দি গানের মেলোডি ভেসে আসছে। মনে হয় যেন ভারত কিংবা পাকিস্তানের কোনো টিপিক্যাল মহল্লায় ঢুকে পড়েছি।

এরপর ও আমাকে নিয়ে গেল শহরের সবচেয়ে বড় একটি মন্দিরে। এই বিদেশ-বিভুইয়ে নাইরোবি শহরের প্রাণকেন্দ্রে ইন্ডিয়ানরা এত বড় একটি মন্দির কমপ্লেক্স কি করে তৈরী করলো? বিস্ময়ে আমি অভিভূত। স্বামীনারায়ন মন্দির কমপ্লেক্সটি কেনিয়ার সবচেয়ে বড়তো বটেই আফ্রিকার মধ্যেও একটি অন্যতম সেরা মন্দির। স্বামীনারায়ন মন্দির নির্মাণের প্রাক্কালে স্থপতি এবং উদ্যোক্তারা ভারতের রাজস্থান, কেরালাসহ বিভিন্ন প্রদেশের সব প্রসিদ্ধ মন্দির ঘুরে দেখেন যাতে একে ভারতের ট্রেডিশনাল সাংস্কৃতিক আদলে তৈরী করা যায়। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় মন্দিরের পবিত্রতা নিশ্চিত করার জন্য গঙ্গা, নর্মদা, সবর্মতি, গোমতি, ঘেলা, নীল, ভিক্টোরিয়া লেক এবং ভারত মহাসাগরের জলের সমারোহ ঘটানো হয়। শুধু তাই না, ফাউন্ডেশনে বিছিয়ে দেয়া হয় ১৫১টি দেশের ধাতব মুদ্রা। রাজস্থানের ভাবমূর্তি প্রোজ্জল করে তোলার জন্য মন্দিরে ব্যবহার করা হয় শত শত কিলোমিটার দূরের পিন্ডবাদা গ্রাম থেকে বহন করে আনা হলুদ স্যান্ডস্টোন। ১৫০টি দেবদেবীর ভাস্কর্যে শোভিত স্বামীনারায়ন মন্দিরের রূপে এতোই মুগ্ধ হয়ে পড়েছি যে, কখন সময় গড়িয়ে প্লেনে চড়ার কাল সমাগত হয়েছে টেরই পাই নি। ফেরার পথে একটি পাহাড়ের ওপর গাড়ি থামালো আলেক্সান্ডার। এখান থেকে পুরো নাইরোবি শহরটা দেখা যায়। পাহাড়ের হাঁটুর কাছে একটা পার্ক। ওখানে চড়ে বেড়াচ্ছে হরিণ ও নানান বন্যপ্রাণী। পাশেই পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অফিস।

আবার ফিরে এলাম নাইরোবি এয়ারপোর্টে। এবার যাবার পালা। বিদায়ের আগে আলেক্সান্ডার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ভ্রমণ কেমন হয়েছে? আমি ওর মাতৃভাষা সোহাইলিতে বললাম, মুজুরি। এই শব্দটির অর্থ, মজা/সুন্দর/দারুণ এর যে কোনোটাই হয়। এই একটি সোহাইলি শব্দই আমি জানি। কাজে লাগিয়ে দিলাম। আলেক্সান্ডার হ্যান্ডশেক করার বদলে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলো। ওর চোখ ছলছল করছে। বললো, তুমিতো দেখি আমার মাতৃভাষাটাও জানো। আগে বলো নি কেন? বুঝতে পারছি, এই একটি শব্দ আমাকে ওর কাছে অনেক সহজ করে তুলেছে। ও পকেট থেকে ওর কম্পানির একটা কার্ড বের করে উল্টো পিঠে নিজের নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে বললো, এরপর নাইরোবি এলে আমাকে কল দিও। তোমার জন্য ২০% ডিসকাউন্ট। তুমিতো সোহাইলি জানো, এই জন্য।

মাতৃভাষার একটি শব্দ যেন একটি খোলা দরোজা। সেই দরোজা দিয়ে আমি ঢুকে পড়লাম এক কেনিয়ান যুবকের হৃদয়ে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৭ জুলাই, ২০০৬

হারমাটান, এক ভয়ঙ্কর দানব

ভার্টিকেল ব্লাইন্ড সরিয়ে বাইরে তাকালাম। ছবির মতো দৃশ্য।

পাহাড়ের ওপর ভাসমান জাহাজের আদলে তৈরী একটি বিশাল পাঁচতারা হোটেল। হোটেল সেব্রোকো। ৫১৬ কক্ষ বিশিষ্ট হোটেল সেব্রোকোই জাতিসংঘের আইভরিকোস্ট মিশনের সদর দপ্তর। তিনতলায় আমার অফিস। জানালার বাইরে একটি শত বছরের পুরোনো পাহাড়ি শিমুল দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের খানিকটা ঢালে। পাতার ফাকে আঁড়াআঁড়িভাবে শুয়ে আছে একটি বিশাল নীল লেগুন। দূরে যেখানে লেগুনটি অবধারিত সঙ্গমে মিলিত হয়েছে আটলান্টিকের সাথে সেই মিলনমুখটিও এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোত্থেকে একখন্ড মেঘ এসে হঠাৎ সূর্যটাকে ঢেকে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লে আকাশ অন্ধকার হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই অন্ধকার স্বাভাবিক অন্ধকার না। অস্বাভাবিক অন্ধকার। অস্বাভাভিক অন্ধকারের ভেতর বাদুড় উড়তে শুরু করলো। পাহাড়িশিমুলের ডালে, পা ওপরে মাথা নিচে দিয়ে ঝুলে থাকা উল্টোমূখী বাদুড়গুলি উড়তে শুরু করেছে। বাদুড় ওড়ার

মানে হলো রাত নেমেছে। এখন সকাল এগারোটা বাজে। এর মানে কি? অফিস রুমে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভার্টিকেল ব্লাইন্ডগুলো সরিয়েও কোনো কাজ হলো না। আমরা ঘরের বাতি জ্বেলে দিলাম। করিডোরের অন্ধকারে ইতস্তত পায়ের আওয়াজ। পা টিপে টিপে হাঁটছে সবাই। কালো মেঘে চারপাশ ঢাকা পড়েছে। তার মানে এখনি বৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে ভয়ানক কোনো ঝড়ের আলামতও থাকতে পারে।

আমি করিডোরে নেমে এলাম। যেখানে আমাদের ফ্লোরের কফি ভেন্ডিং মেশিনটা আছে, ওখানে এসে জড়ো হয়েছে অনেকেই। আজ কি সূর্যগ্রহন? জিজ্ঞেস করলো সঞ্জীব শর্মা। কাকে জিজ্ঞেস করলো কিছুই বোঝা গেল না। এইরকম সময়ে মানুষ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করতে বেশী পছন্দ করে। উত্তরও আসে নৈর্ব্যক্তিক। যেন কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। আবার সবাই সবার সাথে কথা বলছে। একটা রাতের আমেজ নেমে এসেছে আবিদজান শহরে সকাল এগারোটা সময়ে।

তিন ঘন্টা কেটে গেল। এখন বেলা দুইটা। আমরা গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে লাঞ্চে গেলাম। ঝড়-বৃষ্টির তেমন কোনো আলামত নেই। একটা গুমট অন্ধকার। কেয়ামতের সময় ঘনিয়ে এলো না-তো? প্রশ্নটা আমি কাকে করলাম নিজেও জানি না। হয়ত নিজের অবচেতনকেই করলাম। মানুষের চেতন মন অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না কিন্তু অবচেতন মন পারে। বাসায় গিয়ে দেখি সমস্ত ঘরে মিহি ধুলার আবরণ। অতি সুক্ষ্ম ধুলা ফ্লোরের ওপর একটা পাতলা ধুসর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। এতো সুক্ষ্ম এই ধুলা যে পুরো ফ্লোরটা কেরাম বোর্ডের মতো পিচ্ছিল হয়ে গেছে। শুধু ফ্লোরে না, বেডরুমে গিয়ে দেখি বিছানা, বই-পত্র, পড়ার টেবিল সর্বত্র মিহি ধুলার রাজত্ব। কাজের বুয়াকে ধমক লাগালাম। নিশ্চয়ই তুমি জানালা দরোজা খুলে রেখেছিলে? ধুলা-বালিতে বাড়িঘর ডুবে আছে, সাফ করছো না কেন? মেরির মুখ চুষে খাওয়া আমের মতো। ও কোনো কথা বলতে পারছে না। কোনো এক সমুহ শঙ্কায় আতঙ্কিত। তাহলে কি সত্যিই কিয়ামত আসন্ন? মেরি হঠাৎ বেশ শব্দ করেই বলে উঠলো, হারমাটান। এরপরে ও আরো কিছু বললো কিন্তু আমি ওর ফ্রেঞ্চ তেমন কিছুই বুঝলাম না।

সার্জ গাই হাস্যোজ্জল এক তরুণ। প্রকিউরমেন্ট সেকশনে কাজ করে। আমেরিকায় এবং ব্রিটেনে পড়াশোনা করেছে। চমৎকার ইংরেজী বলে। স্থানীয় কর্মী হলেও ওর চলন-বলনে একটা আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক ভাব আছে। সার্জকে জিজ্ঞেস করলাম, হারমাটান কি? আকাশ তখনো অন্ধকার। সার্জ আমাকে আঙুলের ইশারায় কাচের ওপাশের অন্ধকার আকাশ দেখালো। ওই হলো হারমাটান। প্রতিবছর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ওটা আসে। এক ভয়ানক দানব। প্রচুর জান নিয়ে যায়। এই যে অন্ধকার মেঘ দেখতে পাচ্ছো, এটা কিন্তু আসলে মেঘ না। সাহারা মরুভূমি থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে উড়ে আসা ধুলার পিন্ড। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে যখন সাহারায় ঝড় ওঠে, তখনি এই ধূলিমেঘ উড়ে আসে পশ্চিম আফ্রিকায়। এক ভয়ঙ্কর দানব এই হারমাটান। এই সময়ে কতো যে অজানা রোগ উড়ে আসে। আর রোজই মানুষ মরতে থাকে। হাসপাতালগুলো ভরে যায় নাম না জানা রোগে আক্রান্ত শত শত রুগী এসে।

কি বিচিত্র এই পৃথিবী। ঝড়, বন্যা, খরা, জলোচ্ছাসের মতো প্রকৃতিক দূর্যোগের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এবার এসে পড়েছি হারমাটানের কবলে।

১২ জুলাই, ২০০৬
আবিদজান, আইভরিকোস্ট

বোতসোয়ানায় এক ভয়ঙ্কর দানব

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করে যে বিষয়টি আমি সবচেয়ে বেশী উপভোগ করি তা হলো, বহুজাতিক নারী-পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার এক দারুণ সুযোগ মেলে এখানে। আমারতো মনে হয় পৃথিবীর খুব কম দেশ আছে, যে দেশের মানুষের সাথে আমার আন্তক্রিয়া হয়নি। এতে করে নানান দেশের মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেসব দেশের মানুষের যৌনচর্চার ধরণ শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি দেশ বোতসোয়ানা। ১৯৬৬ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘদিন বৃটিশ উপনিবেশ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এখানে ফিরিঙ্গি শিকারীরা আসে প্রথম। এরপর আসে মিশনারীরা। প্রায় সত্তুর বছর ধরে দেশটিকে শাসন করেন ইংরেজরা। এই সময়ে বোতসোয়ানার মানুষ ইংরেজদের ধর্ম, আদব-কায়দা, সংস্কৃতি অনেকটাই আয়ত্ব করে নিয়েছে। তবে অবাধ যৌনচর্চা এবং বহুগামীতা এখনো সে দেশের সংস্কৃতিরই একটা অংশ। 'তুমি হয়ত শুনে অবাক হবে। এই যে আমি মিশনে কাজ করতে এসেছি। দেশে আমার বউ আছে, দুটি সন্তান আছে। যতদিন আমি বিদেশে থাকবো আমার ভাই আমার দায়িত্ব পালন করবে।' চার্লস তাহলার এ কথা শুনে আমি অবাক হইনি। ভাইয়ের অবর্তমানে ভাই দায়িত্ব পালন করবে এটাই স্বাভাবিক। এটাতো আমাদেরও কালচার। বিষয়টা আসলে এরকম না। আমি যখন ওর একথা শুনে তেমন অবাক হইনি তখনি ও আসল কথাটা খুলে বললো। আসলে ওর ভাই ওর স্ত্রীর ভারপ্রাপ্ত স্বামী হিসাবে ষোলআনা দায়িত্ব পালন করবে। ভাইয়ের অবর্তমানে ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে শোয়া ওদের সংস্কৃতিরই একটা অংশ। ও যখন আবার দেশে ফেরত যাবে, তখন তাহলা তার স্ত্রীকে ঠিক আগের মতোই স্ত্রী হিসাবে গ্রহন করবে এবং সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে।

প্রকৃতপক্ষে বতসোয়ানার মানুষ যৌনচর্চার এই বহুগামী সংস্কৃতি ধারণ করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। ওদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এক ভয়ঙ্কর দানব। এর নাম এইডস। পায়ে পায়ে হাঁটছে মৃত্যুর ছায়া। অফুরন্ত সম্ভাবনার দেশ বতসোয়ানার আয়তন পাঁচ লক্ষ বিরাশি হাজার বর্গকিলোমিটার। এক সুবিশাল দেশ। চারটা বাংলাদেশের চেয়েও বড়। অথচ এই বিশাল দেশটির লোকসংখ্যা মাত্র সাড়ে ষোল লক্ষ। এর চেয়ে বেশি লোক আমাদের যে কোন একটি বড় শহরেই বাস করে। ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা এর সাত গুণ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ২০৫০ সালে বতসোয়ানার লোকসংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়াবে চৌদ্দ লক্ষে। জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহার বেশি হবার কারণে প্রতিবছর ০.০৪ শতাংশ হারে লোক কমে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে তিন জনেরও কম (২.৮ জন)। শহর ও গ্রামে প্রায় সমান সংখ্যক লোক বাস করে অত্যন্ত বিরল বসতির এই দেশটিতে। শহরে ৫১ শতাংশ আর গ্রামে ৪৯ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে দেশের রাজধানী শহর গ্যাবর্ণ-এ, এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার জন। ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট এবং অন্যান্য চার্চের আনুসারী মিলিয়ে সর্বমোট ৬০ শতাংশ লোক খ্রীস্টান আর ৪০ শতাংশ লোক বিভিন্ন সনাতন ধর্মের অনুসারী। বোতসোয়ানার সবচেয়ে বড় এথনিক গ্রুপটির নাম হলো সোয়ানা, ৭৫ শতাংশ মানুষ সোয়ানা। ৪ শতাংশ লোক কালাঙ্গা, বাসারোয়া এবং গালাগাদি গোত্রের অন্তর্ভূক্ত আর বাকী ২১ শতাংশ অন্যান্য বিভিন্ন এথনিক গ্রুপে বিভক্ত। বেশিরভাগ মানুষ সেতসোয়ানায় কথা বললেও বোতসোয়ানার দাপ্তরিক ভাষা হলো ইংরেজী।

নারী-পুরুষের গড় আয়ু প্রায় সমান। পুরুষেরা বাঁচে ৩৩.৯ বছর আর নারীর গড় আয়ু হলো ৩৩.৬ বছর। যে দুটি উপাত্ত বিস্মিত করে তা হলো দেশটিতে শিক্ষিতের হার ৮৪ শতাংশ আর মাথাপিছু গড় জিডিপি ৫ হাজার ৭০ ডলার। মোট জিডিপির পরিমান ৯০০ কোটি ডলার, যার ৩ দশমিক ৮ শতাংশ ব্যয় হয় মাত্র ৯ হাজার ফোর্সের একটি ছোট্ট সেনাবাহিনীর পেছনে। গড়ে প্রতি দশজনের জন্য একটি করে গাড়ি আছে, টেলিফোন আছে প্রতি ১৩ জনের জন্য একটি।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মরুভূমি কালাহারি বোতসোয়ানাতেই অবস্থিত। উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার এই মরুভূমিটির বৈশিষ্ট্যগত বিরাট পার্থক্য রয়েছে। উত্তরের মরুভূমিগুলি খুবই শুষ্ক। কাঁটাগুল্ম আর খেজুর গাছ ছাড়া আর কোন গাছ জন্মায় না ওখানে। কিন্তু কালাহারিতে বেশ উঁচু-ঘন বুশের পাশাপাশি নানান প্রজাতির বৃক্ষ-লতাও চোখে পড়ে। যে কারণে এই মরুতে সদর্পে চড়ে বেড়ায় শয়ে শয়ে বাদামি হায়েনা, জিরাফ, সিংহ, চিতা, বন্যকুকুর, নীল বুনোশুয়োরসহ আরো নানান প্রজাতির প্রাণী। কালাহারি শত শত বছর ধরেই শিকারিদের তীর্থ। প্রতিদিন ওয়াল্ড লাইফ ওয়াচাররা দলে দলে ভিড় জমায় কালাহারিতে।

ওয়াইল্ড লাইফ, মাছ, হিরা, কৃষিজ, বনজ ও ভেষজ সম্পদসহ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের আধার এই বোতসোয়ানা। অথচ এই সম্পদ যারা ভোগ করবে সেই মানুষ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সিংহ, চিতা কিংবা হায়েনার সাথে যুদ্ধ করে সোয়ানা বীরেরা জিতে গেলেও ভয়াবহ ঘাতক দানব এইডসের আক্রমনের কাছে ধরাশায়ী হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাহলা বত্রিশ বছরের এক টগবগে তরুণ। এইডসের কথা উঠতেই ওর চোখে আতঙ্কের ছায়া। মুখ ফ্যাকাশে। তাহলে কি তাহলাও ওর শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছে এই ভয়ঙ্কর দানবের বীজ?

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৪ জুলাই, ২০০৬

নিরাপত্তাহীনতার শহরে একদল গ্রে-হাউন্ডস

একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটছে। একটি হলুদ ভ্যান হেঁটে যাচ্ছে। পেছনের দরোজা খোলা। ভেতরে ছয়ফুট লম্বা একটি ভার্টিকেল বেঞ্চ। দু'পাশের হ্যাঙ্গারে বাঁধা আটটি কুকুর। নেকড়েমুখো আটটি গ্রে-হাউন্ডস। ওদের মাঝখানে, বেঞ্চের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে এক কালো যুবক। রাতে ঘুম হয়নি বোধ হয়। ভ্যান থামে এক ধনী ফরাসী ব্যাবসায়ীর গেটে। উঠে দাঁড়ায় কালো যুবক। কুকুর বদল হয়। বাসী কুকুর উঠে আসে ভ্যানে, ভ্যান থেকে নেমে যায় একটি তাজা কুকুর। কিছুক্ষণ ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করে ওরা সৌহার্দ্য বিনিময় করে। আঁড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে ওঠে সবুজ লেগুন। লেগুন থেকে উঠে আসা ঠান্ডা বাতাসে বড় করে একটা হাই তোলে ওরা। ক্লান্তি ঝারে বাসী কুকুরগুলো। আবারো ভ্যান চলতে থাকে। আবিদজানের অভিজাত এলাকাগুলোতে এখন প্রতিদিন ভোরে এমনি করে প্রহরী কুকুরেরা কাজে বেরিয়ে পড়ে। ওরা ডিউটি করে ২৪ ঘন্টা। পরদিন ঠিক এ সময়েই ওদের ছুটি। ফিরে যায় নিরাপত্তা কোম্পানীর খোয়াড়ে, ওদের বাসায়।

নিরাপত্তা এখন একটি বড় ইস্যু এ শহরের। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কর্মীদের হাতে হাতে ওয়াকি-টকি। গরম হয়ে ওঠে যখন-তখন। সামনে নির্বাচন, গোত্রদ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। হাজার হাজার ডিজিটাল চোখ আবিদজানের ওপর, পলকহীন, নিদ্রাহীন। ফরাসী স্বার্থ, মার্কিনী স্বার্থ। মিটিং হচ্ছে দফায় দফায়। প্রকাশ্যে-গোপনে। আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী শার্লস কোনান বেনির নেতৃত্বে সারা দেশে আইডেন্টিফিকেশন এবং ডিজ-আর্মামেন্ট চলছে। প্রেসিডেন্ট বাগবো ঝিম মেরে আছেন। দেখছেন সবকিছু। যে কোন সময় দাবার ঘুঁটি চালবেন। কি চাল দেবেন এটাই এখন ভাববার বিষয়। ভাবছেন দেশী-বিদেশী মাথা। ঘামছেন অনবরত। আইডেন্টিফিকেশন চান না প্রেসিডেন্ট। তাহলে বুরকিনা ফাসো, মালি এবং নিজার থেকে আসা দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সেটেলারস, যাদের প্রায় সবাই মুসলমান, নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে। ওরা ভোট দেবে আলাসান উয়াত্তারাকে, বাগবোর প্রতিপক্ষ। অন্যদিকে ডিজ-আর্মামেন্ট চান না উয়াত্তারা সমর্থিত গেরিলা নেতা গুইলামো সরো। কারণ বাগবোকে বিশ্বাস নেই। নিরস্ত্র হলেই আক্রমণ চালাতে পারে বাগবোর পেটোয়া বাহিনী ইয়াং পেট্রিয়ট, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রেসিডেন্ট বাগবোর স্ত্রী মিসেস সিমন বাগবো। একটা থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

ফরাসী বাড়িগুলির চারদেয়াল আরো উঁচু হচ্ছে। দেয়ালের ওপর কাঁটাতার লাগছে। নানান রকম সিকিউরিটি ইকুইমমেন্ট আসছে বিদেশ থেকে। নতুন নতুন কোম্পানী খাড়া হচ্ছে। গ্রুপ ফোর সিকুরিকোর, ভিগাসিসতান্স, লাভাগার্ড, ভিপঅ্যাসিসতান্স আরো কতো কি। কানাডা থেকে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আসছেন, আমেরিকা থেকে আসছেন, ইংল্যন্ড থেকে আসছেন। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এখন এ শহরের ধনী মানুষেরা। সকলের হাতে হাতে রিমোট কন্ট্রোল প্যানিক এ্যলার্ম। শুধু লাল বাটনটাতে চাপ দিলেই হলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গরিলার মতো দীর্ঘদেহী একদল কালো দাস ছুটে আসবে। সঙ্গে দুটো গ্রে-হাউন্ডস। বিচক্ষণ কুকুরেরা প্রাণ বাঁচাবে। মান বাঁচাবে। সম্পদ বাঁচাবে। মার্সিডিজ, প্রাডো, পুজো, বিএমডব্লিউ, ভক্স-ওয়াগন, শেভ্রোলেরা অতি সতর্কতার সঙ্গে চাকা ফেলছে রাস্তায়। যে কোন সময় ইয়াং পেট্রিয়টের রড এসে আছড়ে পড়তে পারে গায়ের ওপর।

শুধু বিদেশীরাই না। আতঙ্কে আছেন দেশী ধনীরাও। ক্ষমতা বদল হলে অনেক কিছু ঘটতে পারে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের পাহাড়ে ভুমিকম্প হতে পারে। ধ্বসে যেতে পারে বালির বাঁধের মতো। যারা ডিরেক্টর (সর্বোচ্চ সরকারী পদ), যারা ব্যাংকসমুহের প্রধান, যারা পুলিশ, জেন্ডার্ম (আধা-সামরিক বাহিনী) এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান, যারা কাস্টমস, ফরেস্ট

বিভাগের প্রধান, যারা রাজনৈতিক দলের নেতা তাদের সম্পদের পাহাড় এখন কাঁপছে। তাদের বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠছে। তাদের বিলাসবহুল বাংলোগুলোর শ্বেতপাথরের শরীর সুতানালী সাপের মতো পেচিয়ে ধরছে ঘাসের ডগা। সুইস ব্যাংক, ফরাসী ব্যাংকগুলির পেট ফুলছে। পাড়ি জমানোর আয়োজন করছে কেউ কেউ। তালিকা তৈরী হচ্ছে। তালিকা তৈরী করছে দু'পক্ষই।

এসবের ভেতরেও রোজ বিদেশিরা আসছে। সুপারমার্কেটগুলোর র‍্যাক উড়ে যাচ্ছে। বারগুলো জমে উঠছে উইক-এন্ডে। বোতল বোতল হুইস্কি, শ্যাম্পেইন হাওয়া। কানে তালা লাগানো মিউজিকের তালে নাচছে আবিদজান। রাতের সুন্দরীরা, নিশিকন্যারাও থেমে নেই। থেমে নেই মানুষের জীবন। শুধু একটা আতঙ্ক, একটা ভয়ের ছায়া পায়ে পায়ে হাঁটছে। সমুহ কোন শঙ্কার শব্দ হচ্ছে শহরের কোথাও। এ শব্দতরঙ্গ ধরার সাধ্য নেই শহরবাসী মানুষের। অতি সুক্ষ্ম এ শব্দ। অধশব্দ। মানুষ নয়, কেবল কুকুরেরাই পারে এ শব্দ শুনতে। তাই শহরের সমস্ত ধনী মানুষের বাড়িতে এখন প্রহরী কুকুরের খুব কদর।

একদল নেকড়েমুখো কালো গ্রে-হাউন্ডস হলুদ ভ্যান থেকে নেমে বীরদর্পে হেঁটে যাচ্ছে ওদের খোয়াড়ের দিকে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৩১ জুলাই, ২০০৬

তানিন্দ্রাজানা, মালাগাসিদের মূল ঠিকানা

ছেলেবেলায় একটা ভ্রমণ কাহিনী পড়েছিলাম কিন্তু কার লেখা এবং কোথায় পড়েছি কিছুই মনে নেই আমার। শুধু মনে আছে, সেই দেশটির কথা, যে দেশের মানুষ আজো 'হিউম্যান হান্টার', বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, পাহাড়ের আঁড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে শিকারের আশায়। সেই শিকার বাঘ, ভালুক, হরিণ কিংবা বুনোশূকর নয়, রক্তমাংসের মানুষ। চোখ, কান, নাক, মুখওয়ালা মানুষ, যারা আমাদেরই মতো কথা বলে, প্রার্থনা করে, ভালোবাসে, বিয়ে করে এবং সন্তানের পিতা-মাতা হয়। যে মানুষ শীতের প্রকোপ থেকে বুকের উষ্ণতা দিয়ে, হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করে সেই মানুষকে শিকার করে আরেকদল মানুষ। সেই দেশটির নাম মাদাগাস্কার। দূরের পথের যাত্রীদের নির্জন স্থানে বাগে পেয়ে পথ আগলে কেড়ে নেয় সোনা-দানা, টাকা-পয়সা, দামী পোশাক-আশাক এবং এরপর ওদেরকে জবাই করে পুড়িয়ে খায়। দূর শৈশব থেকেই রাক্ষস-খোক্ষসের কথা শুনলে চোখের সামনে ভেসে উঠতো এ দৃশ্য। আর মানুষখেকো মানুষ আজো পৃথিবীতে আছে, এ কথা কেউ বললেই আমার স্মৃতিতে মাদাগাস্কার নামটিই স্পস্ট হয়ে উঠতো।

সেই মানুষখেকোদের দেশ থেকে আসা এক মানুষ এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ওর নাম রোল্যান্ড রাজাফিমাহারো। দেশ কোথায়? জিজ্ঞেস করতেই ও যখন বললো, মাদাগাস্কার, আমি তখন একটু যেন কেঁপে উঠলাম। এই লোকটির দাঁতের ফাকে মানুষের মাংস লেগে নেইতো? নিজের অজান্তেই আমি ওর নখের দিকে তাকালাম। রোল্যান্ড কম্পেশনেট ছুটি নিয়েছে। অর্থাৎ নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে শেষকৃত্যনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাড়ি যাচ্ছে। ওর তাড়া আছে। আমার কাছে এসেছে, যাবার আগে যেন এমএসএ-র (মিশন সাবসিস্টেন্স এলাউন্স) টাকাটা পায় সেই তদবির করতে। রোল্যান্ডের গায়ের রঙ বাঙালী-ফর্শা, নাকটা বোচা না তবে লেপা, বলার ভঙ্গিটা শার্প না, কণ্ঠ ভরাট। কথা বলে কেমন যেন নেশাগ্রস্থদের মতো করে, জড়িয়ে জড়িয়ে। উচ্চতা আফ্রিকানদের মতোতো নয়ই, বরং যেন এশিয়ানদের চেয়েও খানিকটা খাটো। ভারত মহাসাগরের ওপর ভেসে থাকা একটি বিশাল দ্বীপ মাদাগাস্কার। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপ। আয়তন পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা মাত্র এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ। গত এক'শ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে পাঁচগুন। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হলো ৩.০৩ শতাংশ। মাদাগাস্কারের তিনদিকে তিনটি মহাদেশ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া। নিকটতম মহাদেশ আফ্রিকা হওয়াতে মাদাগাস্কারের অধিবাসীরা আফ্রিকান হয়ে গেল। কিন্তু রোল্যান্ডকে দেখে আমার বরং ইন্দোনেশিয়ান মনে হচ্ছে।

ওর যতোই তাড়া থাক, হাতের কাছে মাদাগাস্কার, মানুষ খাওয়ার গল্প না শুনেই ছেড়ে দেব? এ হতে পারে না। ইনিয়ে বিনিয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, গহীন অরন্যে, এই ধর কোন বর্বর ট্রাইব, যাদের কাছে এখনো শিক্ষার আলো পৌঁছেনি, এমন কোন সম্প্রদায়? এবার ও হো হো করে হেসে উঠলো। শোন, প্রতিহিংসাবশত আফ্রিকার কোন দেশের মানুষ প্রতিপক্ষের মাংসে দাঁত বসায় না, বলতে পারো? রাজাফিমাহারোকে আমি আর বিব্রত করতে চাইলাম না। কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে যে আমি ওর দেশ সম্পর্কে জানতে চাই। এবার ও বসে পড়লো। বললো, আমার দেশ সম্পর্কে তোমাকে কিছু তথ্য দেই। তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে। আমি উৎকর্ণ হলাম।

মালাগাসি জনগণ জীবিত মানুষের চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয় মৃত ব্যক্তিকে। মৃতের অসম্মান মালাগাসিরা একদম সহ্য করতে পারে না। তুমি শুনে অবাক হবে, মৃতের জন্য আমরা প্রচুর টাকা খরচ করে মন্দির, সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করি। একেকটা মন্দির একেকটা প্যালেসের মতো। সারা মাদাগাস্কার জুড়ে তুমি লক্ষ-কোটি সমাধিমন্দির দেখতে পাবে। জীবদ্দশায় যে মহলে ঘুমানোর সাধ্য হয় না, মরার পরে আমরা তার চেয়ে বহুগুণ বিলাসবহুল মহলে ঘুমাই। শেষকৃত্যানুষ্ঠানও মালাগাসিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একেক ট্রাইব এটা একেকভাবে পালন করে। তবে মোদ্দাকথা হলো এই অনুষ্ঠানে আমরা ব্যয় করি হাত খুলে। বলতে পারো মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা যে অনুষ্ঠান করি মালাগাসিদের জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান বা উৎসব। আমরা মৃতকে পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে করি। মৃতরা কখনোই আমাদের সমাজে অতীত হয় না। ওরা আছে, ওরা থাকবে। পরিবারে ওদের ভূমিকা জীবিতদের চেয়ে অনেক বেশী। মৃতরা জীবিতদের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময় ওদের পছন্দ-অপছন্দকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। মৃতেরা একটি অনন্ত জীবনে অবস্থান করছেন। জীবদ্দশা তারই একটি ক্ষণস্থায়ী কাল মাত্র। পারিবারিক মৃত-মন্দিরকে (টম্ব) আমরা বলি তানিন্দ্রাজানা (পূর্বপুরুষের ভূমি)। একেক সম্প্রদায়ের তানিন্দ্রাজানা একেকরকম হয়। মেরিনা মন্দির হয় সলিড সিমেন্ট ও পাথরের তৈরী। একটা ছোট চেম্বার থাকে, যেখানে খাঁটি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে মৃতকে রাখা হয়। মাহাফালি মন্দিরগুলো পাথরের তৈরী হলেও কারুকার্যখচিত কাঠের পোস্ট দিয়ে ফ্রেম করা হয়। এইসব কাঠের ফ্রেমগুলো মানুষ ও জীব-জন্তুর আকৃতিখচিত হয়। অতি সম্প্রতি ধনী মাহাফালিরা তাদের তানিন্দ্রাজানা কাঠ ও মূল্যবান স্টেইন্ড গ্লাস দিয়ে তৈরী করে। মন্দিরের সিলিংয়ে আধুনিক সব কারুকার্য করতেও দেখা যায়। যেমন ধরো বিমানের আদল, দামী গাড়ির আদল এইসব। পশ্চিম উপকূলের মরনদাভা নদীর তীরে যে সাকালাভা সম্প্রদায় বসা করে, ওদের মন্দিরে তুমি দেখতে পাবে নানান যৌনাসনের কারুকার্যখচিত চিত্রকর্ম। শৌর্য-বীর্য, প্রজনন ও বংশবিস্তার ক্ষমতার প্রতীকরূপে ওরা এইসব কারুকার্য তৈরী করে সবচেয়ে স্থায়ী আবাসস্থল তানিন্দ্রাজানার গায়ে।

আমাদের সমাজে পরিবারের সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ হলেন তিনি, যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ। খাবার টেবিলেও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতেই সম্মানজনক আসনে বসা ও খাবার পরিবেশন করা হয়। আমরা মনে করি যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি আছেন, অর্থাৎ সবচেয়ে সম্মানজনক জীবনে অনুপ্রবেশের পথে রয়েছেন। তুমি শুনে অবাক হবে কোন শিশু যদি তার চেয়ে বড়জনের আগে কোন খাবার খেয়ে ফেলে তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়।

নানান ধর্মের আনুসারী মানুষ আছে মাদাগাস্কারে। তবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মালাগাসিই একজন সর্বোচ্চ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। কেউ তাকে ডাকে জানাহারি (সৃষ্টিকর্তা), কেউ ডাকে আন্দ্রিয়ামানিত্রা (মিষ্টি বা সুগন্ধির প্রভূ) নামে।

এবার আমি উঠবো, তোমাকে ছুটি থেকে ফিরে এসে আরো অনেক কিছু বলবো মাদাগাস্কার সম্পর্কে। তোমাকেতো বলেছি, আমার চাচা মারা গেছেন। তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছি আমি।

একটা বড় মন্দির বানাবে নাকি? আমার এ কথা শুনে রাজা খুব আহত হলো। তোমার কি মনে হয় ইতিমধ্যেই আমাদের পরিবারের একটি অতি সুদৃশ্য তানিন্দ্রাজানা তৈরী হয় নি? ওটাইতো মূল ঠিকানা।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১ আগস্ট, ২০০৬

বাহাশুলের বিয়ে

ওয়াগন নদীর পেছনে সূর্য ডুবছে। লাল আকাশের ছায়া নদীর পানিতে কাঁপতে কাঁপতে আগুনের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। ক'জন সোয়াজি কিশোরী, ওদের মায়াভরা মুখ অস্তগামী সূর্যের দিকে ফেরানো, হেঁটে যাচ্ছে গ্রামের পথ ধরে। দূরের পামগাছগুলো ওদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের বুক খোলা। গলায় হলুদ, কালো ও নীল রঙের উলের টাসেল জড়ানো। উলের টাসেল ওদের ভার্জিনিটির সনদপত্র। সাবালিকা হওয়ার পর সোয়াজিল্যান্ডের সব কিশোরীকেই এটা পরতে হয়। এই টাসেল বহন করতে হয় কমপক্ষে পাঁচ বছর। এটাই সোয়াজি রাজার হুকুম, দেশের আইন। আইন অমান্যকারীর পিতাকে জরিমানা দিতে হবে একটি গরু অথবা ১৩০০ এ্যমালাঙ্গেনি (প্রায় ১৩০ ডলার)। নাজিফোর পিতার সেই সাধ্য নেই। নইলে এই যন্ত্রণাদায়ক সাপটাকে গলা থেকে কবেই ছুঁড়ে ফেলে দিত। বন্ধুদের এ কথা নাজিফো অনেকবার বলেছে। অন্যরা আঁতকে ওঠে নাজিফোর সাহস দেখে। বলে কি মেয়ে! নাজিফো ঝাঁঝিয়ে ওঠে। তোরা সব ইঁদুরের বাচ্চা। যা গর্তে গিয়ে লুকিয়ে থাক। দুনিয়া এখন অনেক বদলে গেছে। সোয়াজিল্যান্ডের মেয়েরা ভার্জিনিটি রক্ষা করার জন্য কোনো ছেলের সাথে হাত মেলাতেও পারবে না। আর ওদিকে শকুণটা, আমাদের মহান রাজা, প্রতি বছরই গ্রামে এসে একজন ভার্জিন কিশোরীকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে ক'টা হলো? তেরটা, জবাব দেয় অন্য একজন। সর্বনাশ, এই মেয়ে কোথায় শিখলো এসব কথা? নিশ্চয়ই জোহান্সবার্গের সাদা হারামীগুলো এসব শিখিয়েছে। এনজিওগুলোকে ঝেটিয়ে বিদেয় করতে হবে।

বাহাশুলেকেও এ নিয়ম মানতে হয়েছে। তবে সে অনেকদিন আগেই এই শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে। আইনের শেকলটা গলা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওয়াগন নদীতে। সেই থেকেই অবাধে হাত মিলিয়েছে, জড়িয়ে ধরেছে প্রিয় পুরুষকে। শুয়েছে যখন ইচ্ছে। একটি কন্যা সন্তানের মা'ও হয়েছে। তবে কে এই কন্যার পিতা, হিসেবটা ও কখনোই বের করতে পারে নি। অনেক ভেবেছে এ নিয়ে। এখন আর ভাবে না। রাজকন্যাদের এসব নিয়ে অতো ভাবতে হয় না। ও শুধু ওর সৎ ভাইটার কথা ভাবে। সোয়াজিল্যান্ডের মহান রাজা, একচ্ছত্র অধিপতি সে এই সতের হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট ভূ-খন্ডের। শুধু কি ভূ-খন্ডের? এই রাজ্যের সকল সুন্দরীদেরও মালিক সে। ভোগ করে যাকে-তাকে, যখন-তখন। কি মজার আইন। সোয়াজি রাজা যতগুলো ইচ্ছে বিয়ে করতে পারবে। যাকে ইচ্ছে তাকেই। এইডসে ছেয়ে যাচ্ছে দেশ। আর এজন্য দায়ী করা হচ্ছে মেয়েদেরকে। আরো কঠিন কোনো ভার্জিনিটি রক্ষার কায়দা খুঁজছে পুরুষগুলো। রাজাতো সেদিন ঘোষণাই করে দিলেন, সোয়াজিল্যান্ডের মানুষকে এইচআইভি থেকে বাঁচাতে হলে রাজ্যের মেয়েদেরকে আরো কঠিন তপস্যা করতে হবে। নিজেদের ভার্জিনিটি ধরে রাখতে হবে বিয়ের আগ পর্যন্ত। মরণ ব্যাধি এইডস থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়।

রাজার নিষ্ঠুরতার কথা জানে বাহাশুলে। হাকিম নড়ে, তবু রাজার হুকুম নড়ে না। ও জানে এই ঘোষণার ঝাপটা এসে লাগবে রাজ-অন্তঃপুরেও। বাহাশুলে এবার সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করার। ত্রিশটি বসন্ত পেরিয়ে গেলেও ভরা বর্ষার ওয়াগন এখনো বইছে ওর শরীরে। গত অগাস্টে, উমহলাঙ্গার উৎসবে, ও যখন মুক্ত বক্ষ নিয়ে নাচছিলো, বুভুক্ষুর মতো ওকে গিলছিলো ওয়ারিওরগুলো আর সেনা অফিসারগুলো। নাচতে নাচতে যে ওয়ারিওরটি ওর কাছে ছুটে এসে হাত ধরেছিলো, আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যুগল নৃত্যের, খারাপ লাগেনি ওকে। ওর উন্মুক্ত পিঠে ওয়ারিওরটি যখন বাঁ হাতের উষ্ণ তালু চেপে ধরেছিল, বাহাশুলের শরীর তখন কিছুটা কেঁপে ওঠে। একজন সোয়াজি যুবতীর জন্য এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা না। পুরুষ ছোঁবে, জড়িয়ে ধরবে, চুমু খাবে, এটাই স্বাভাবিক। এতে কেঁপে ওঠার কিছু নেই। কিন্তু ওই ওয়ারিওরটি ভিন্ন। কি যেন আছে ওর স্পর্শে। কি মুগ্ধ হয়ে ও দেখছিলো বাহাশুলের 'মৌ-চাক' চুলের স্টাইল। যেন চোখ ফিরছিলোই না। সিভাকা নৃত্যেও ও নিশ্চয়ই পটু। বহুরঙের ট্রেডিশনাল সোয়াজি পোশাক পরে ও যখন সিভাকা নৃত্যে পেশীর কসরত দেখাবে, চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিতে ভেসে ওঠা নদীর চর দেখাবে, বাহুতে ফুলে ওঠা বুনো ষাড়ের চোচ দেখাবে আর পায়ের পেশীতে ঢোলের তালে তালে পামপাতার কাঁপন দেখাবে তখন কাঁপন ধরবে সোয়াজি যুবতীদের হৃদয়েও।

বাহাশুলে তাকায় দূরে, পাহাড়ের ভেলিতে। যেন গলা বাড়িয়ে দেখতে চায় সূর্যাস্তের পেছনের কোন গ্রাম, যেখানে বাস করে সিংহের মতো স্ফিত বক্ষের সেই বিশেষ ওয়ারিওরটি। কি নাম ওর? জানে না বাহাশুলে। পাহাড়ে-অরণ্যে ঘুরে বেড়ায়। ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে বন গরুদের। তারপর ধরে নিয়ে আসে গ্রামে। পোষ মানায়। নারকেলের দড়ির মতো পাকানো পেশীর ওই ওয়ারিওরটিকেই বিয়ে করে ফেললে কেমন হয়? দ্লামিনি রাজপরিবার কি এটা মানবে? একজন সাধারণ ওয়ারিয়র হবে রাজজামাতা? এখানেই সমস্যা। এটাই মেনে নিতে পারে না বাহাশুলে। রাজবধূ হতে পারে যে কেউ কিন্তু রাজ-জামাতা হতে পারবে না নিচু গোত্রের ছেলেরা।

সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে অবশেষে বাহাশুলের বিয়ের দিন ঠিক হয়। তরুণ যুবক কোঞ্জানে মাতসের আনন্দ আর ধরে না। রাজ-জামাতা! এ-যে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। হোক না বাহাশুলে ওর চেয়ে ছয় বছরের বড়। সোয়াজি রাজপরিবারের প্রথা অনুযায়ী রাজকন্যাকে এনজিসা (আয়োজিত বিবাহ) করতে হবে। ভালোবাসার বিয়ে চলবে না। সবুজ সঙ্কেত পেয়ে কোঞ্জানে মুরুব্বিদের পাঠায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। রাজ-মাতা (যিনি রাজার অবর্তমানে রাজ্য চালান। কিন্তু তিনি রাজার স্ত্রী কিংবা মা নন, রাজা নির্বাচন কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত 'রাণী মা', কোন পূর্বতন রাজার প্রথম স্ত্রী) এবং রাজা এতে সম্মতি দিয়ে বাহাশুলের কাছে জানতে চান, কোঞ্জানে তোমাকে স্ত্রীরূপে পেতে চায়, তুমি কি রাজী? সাথে সাথে বাহাশুলে ওয়াকোলা (নিজের চুল শূন্যে তুলে ধরা) করে সম্মতি জানায়। বাহশুলে জানে ও আসলে সালিওয়াকাতি (আইবুড়ো) হয়ে গেছে। যদিও এ কথা প্রকাশ্যে বলার সাধ্য কারো নেই। রাজকন্যাদের দেরীতে বিয়ে করার অধিকার রাজ্যের আইনে রয়েছে। সাধারণত একত্রিশ বছর বয়সের সোয়াজি কুমারীর সহজে বিয়ে হয় না। হোক না কোঞ্জানে দরিদ্র। সে তরুণ, সিংহপুরুষ, বাহাশুলেকে নিশ্চয়ই সুখী করতে পারবে। বাহাশুলে এ-ও জানে, দু'দিন পরেই কোঞ্জানে কোন কিশোরীর বিছানায় যাবে। এটাই সোয়াজি যুবকের ধর্ম। এক নারীতে ওরা কখনোই সুখী হয় না।

আজ কুতেকা (বিয়ের অনুষ্ঠান)। বাহাশুলেকে স্নান করানো হচ্ছে বিশেষ গাছ-গাছড়ার শেকড় সেদ্ধ পানি দিয়ে। ওর গা থেকে বুনো সুঘ্রাণ আসছে। লাল একটা মার্বেল পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাহাশুলে, রাজ-অন্তপুরের বিলাসী স্নানঘরে। ওপরে খোলা আকাশ, চারপাশে উঁচু পাঁচিল। একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটছে। সূর্য ওঠার আগেই বিয়ের স্নান সেরে ফেলতে হবে। সামনের বিশাল সুইমিংপুলে সবুজ জলধারার কৃত্রিম প্রবাহ। পুলের পেছনে পঁচিলঘেষা দুটি পান্থনিবাস তৈরী করেছে অপূর্ব সূর্যালোকচক্র। পাঁচিলের সমান্তরাল উঁচু নারকেলের সারি, মৃদুমন্দ হাওয়ায় শন শন বেজে উঠছে নারকেল বিথী। পাহাড়ের ভেলি থেকে উঠে আসা ভোরের ঠান্ডা বাতাসের ঝাপ্টা লাগে ওর চোখে-মুখে। সেই বাতাসে ও কোঞ্জানের গায়ের গন্ধ পায়। ওর শরীরের স্পর্শ পায়। বাহাশুলের নিরাবরণ শরীরের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিগত যৌবনা রাজবাড়ির স্ত্রীলোকেরা, যারা আজ বাহাশুলের বিয়ের স্নানের দায়িত্ব পেয়েছেন। ওইতো আফ্রিকা, কালো নারীর প্রতিকৃতি। ভোরের আধো-আলো, আধো অন্ধকারে হঠাৎ যেন লাল মার্বেলের ওপর জ্বলে ওঠে এক দেবীমূর্তি। কোজাগরি আকাশকে পেছনে ফেলে যেন এইমাত্র সোয়াজি রাজবাড়ির হাম্মামখানায় নেমে এসেছেন এক কল্যাণময়ী কৃষ্ণ দেবী, আফ্রিকার নারীজাতির প্রতিনিধি। বাহাশুলের উন্মুক্ত বুকে উপুড় করা দুটি রসভরা কলস, রসের ভারে কিছুটা কাঁত হয়ে আছে এবং সমূহ সংঘর্ষের আশঙ্কা এড়াতে রসের ব্যাপারী দু'টিকে দু'দিকে ঠেলে দেওয়াতে যেন ওরা অভিমানে মুখ ভার করে আছে। আর সেখান থেকে রসের ধারা নেমে এসে নাভীর ঘুর্ণনে তৈরী করেছে রহস্যের ঘোর, তারপর নেমে গেছে নিচে, আরো অন্তহীন রহস্যের সরোবরে। ওর গায়ে অব্যবহৃত মাটির পাত্র দিয়ে আলতো করে বুনো শেকড় ভেজানো পাহাড়ি ঝর্ণার জল ঢালছে মহিলারা।

স্নানশেষে অন্তর্বাসবিহীন সুতির মসৃণ কাপড়ে জড়ানো হয়েছে কনেকে। উঠানের মাঝখানে একটি বড় কাঠের বেদীর ওপর বসেছে বাহাশুলে। ওকে কেন্দ্র করে ঘিরে আছে দু'পক্ষের শ'দুয়েক আত্মীয়স্বজন। ভোরের সূর্য ততোক্ষণে উঠে এসেছে সোয়াজিল্যান্ডের ফসলের মাঠ পেরিয়ে রাজবাড়ির উঠানে। প্রথা অনুযায়ী কনে পক্ষের ছেলে-মেয়েরা নাচতে শুরু করে দিল। ঢোলে বোল তুলছে একদল দক্ষ রাজ-ঢুলি আর গাইছে বিয়ের গান। বরপক্ষের কেউ কুতেকায় নাচতে পারবে না, তাই ওরা করতালি দিয়ে উপভোগ করছে কনে পক্ষের নৃত্যগীত। এবার কনেকে আশির্বাদ করার পালা। একে একে প্রথমে দু'পক্ষের মুরুব্বীরা, পরে অন্য আত্মীয়রা বাহাশুলের মুখে, গায়ে লিবোভু (পশুর চর্বি ও কাদার সঙ্গে লাল রঙ মেশানো একটি মিশ্রণ) মেখে দিয়ে আশির্বাদের পালা শেষ করলো। এরপর শাবাঙ্গু মাতসে, কোঞ্জানের মা, তার বড়ছেলের এক বছরের শিশুকণ্যাকে তুলে দেয় বাহাশুলের কোলে। শিশুটিকেও লিবোভু মাখিয়ে আশির্বাদ করে মুরুব্বীরা। আজ থেকে এ শিশুর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বাহাশুলের, যতদিন না ও নিজে কোঞ্জানের সন্তানের মা হচ্ছে। যদিও শিশুটির আসল বাবা-মাও আইনগতভাবে ওর পিতা-মাতা থাকবেন। এভাবেই সোয়াজি কনেরা মা হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরী করে নেয়।

উমতসিম্বার (মূল বিয়ের অনুষ্ঠান) দিন যতোই ঘনিয়ে আসছে বাহাশুলের দুশ্চিন্তা ততোই বাড়ছে। কোঞ্জানে কি পারবে রাজ-পরিবারের মান রেখে উপযুক্ত লোবোলো (উপঢৌকন) পাঠাতে? কমপক্ষে দু'শ ছাগল-ভেড়া না পাঠালে কি ওর মতো রাজকন্যার সঠিক দাম দেয়া হবে? সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরের সোমবারে কোঞ্জানে এক'শ ছাগল, এক'শ দশটি ভেড়া আর আটজন রাখাল পাঠিয়ে দেয় রাজবাড়িতে।

ছাগল-ভেড়ার বিশাল পালটির দিকে তাকিয়ে বাহাশুলের চোখে পানি আসে। দূরের ভবিষ্যতের দিকে তাকায় বাহাশুলে। পাহাড়ের ভেলিতে গাছের ওপর একটি কাঠ-দড়ির মাচা। বাতাস নেই, ঝড় নেই, সবাই অবাক হয়ে দেখছে বাওবাব গাছের কান্ডের সাথে বাঁধা একটি মাচা দুলছে অনবরত, দুলছেতো দুলছেই, কিছুতেই আর থামছে না।

৫ আগস্ট, ২০০৬
আবিদজান, আইভরিকোস্ট

গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র নয়, সত্যিকারের গণতন্ত্র

পৃথিবীর কোথাও কোথাও এখনো রাজতন্ত্র টিকে আছে। তার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র একটি দেশ সোয়াজিল্যান্ড নানান কারণে সারা বছর ধরেই আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোকে গরম রাখে। সোয়াজিল্যান্ডের প্রায় চতুর্দিক ঘিরে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা, শুধু পূর্বে সামান্য একটু মোজাম্বিক ছাড়া। আমাদের পাশের দেশ নেপালের রাজতন্ত্র যাই যাই করেও গত অনেক বছর ধরে ঝুলে আছে। নেপালের এই অবস্থার জন্য কে দায়ী? আমি বলবো এটা কোলোনাইজড না হওয়ার কুফল। কোলোনাইজেশনের যে কয়টা সুফল আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো দ্রুত সভ্য হয়ে ওঠা। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতাই যে ভূ-ভারতের সবচেয়ে সভ্য এবং উর্বর অঞ্চল তার অনেক প্রমাণের একটি হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অমর্ত্য সেনের সাফল্য। বছর কয়েক আগে আমার এক সহকর্মী, মুজিবুর রহমান (সেইভ দি চিল্ড্রেন-ইউকে'র একজন উর্ধতন কর্মকর্তা), কাঠমুন্ডু থেকে ঘুরে এসে মন্তব্য করলেন, ওরা এখনো সভ্য হয়ে ওঠে নি। গত বছর আমি যখন সপরিবারে কাঠমুন্ডু বেড়াতে যাই, মুজিব সাহেবের সেই কথাটিই আমার কানে বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। পশুপতিনাথ মন্দির কাঠমুন্ডুর একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় দর্শনীয় স্থান। মন্দির কমপ্লেক্সে ছবি তোলা নিষেধ, কোথাও হয়ত এটা লেখা আছে কিন্তু আমার চোখে তা পড়েনি। আমি যখন ক্যামেরা বের করে এই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের পাশে দাঁড়ানো আমার স্ত্রী-সন্তানের একটি ছবি তুলতে গেলাম, অমনি কোত্থেকে এক যুবক (নিরাপত্তাকর্মী) ছুটে এসে আমাকে রীতিমতো গালাগাল দিয়ে হাত থেকে ক্যামেরাটি কেড়ে নেবার জন্য জোরাজুরি শুরু করে দিলো। ধস্তাধস্তিতে যুবক অবশ্য হেরে গেল, তবে ক্যামেরাটি আমার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আমি ওকে যতোই বলি, আমি দুঃখিত ছবি তোলার জন্য, আমি তোমাদের নিয়মটি জানতাম না। ও ততোই আমাকে গালি দিতে থাকে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিলো ওর মূল উদ্দেশ্য ছিল এই সুন্দর ডিজিটাল ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নেওয়া। ওর চোখে আমি হিংস্রতা দেখেছি, আদিম মানুষের মতো ছিল ওর আচরণ।

পৃথিবীর নানান দেশে ঘুরেছি, হাজার হাজার ছবি তুলেছি। ভুল করে কিংবা অতি স্বাভাবিক পর্যটক-কৌতুহলবশত অনেক নিষিদ্ধ স্থাপনার ছবিও তুলেছি। এসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কখনোই ট্যুরিস্টদের সাথে অশোভন কোনো আচরণ করে না। খুব বিনীতভাবে নিষেধ করে ছবি তোলার জন্য। এই বিনয় আমি পুরো কাঠমুন্ডু শহরের কোথাও দেখে নি। ওদের রাজতন্ত্রটিও সভ্য দুনিয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের বিনয়হীনতা প্রকাশেরই একটি এক্সপ্রেশন।

উপনিবেশিকতার আরো একটু গুনগান না করলেই নয়। সারা ভারতবর্ষে যে দুটি গান সবচেয়ে বেশি গাওয়া হয় এবং সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সে দুটি গান হলো, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগনমন অধিনায়ক হে' এবং 'বন্দে মাতরম'। দুটি গানেরই রচয়িতা কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর অন্যজন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কোলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গই (বাংলা) যে সবচেয়ে বেশি ইন্টেলেকচুয়াল রিসোর্স প্রডিউস করে এ কথা এখন সবাই স্বীকার করেন।

বলছিলাম সোয়াজিল্যান্ডের কথা। খরা কবলিত ১৭ হাজার ৩'শ ৬৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের একটি ছোট্ট ল্যান্ডলকড কান্ট্রি। দেশটির ৫৩৫ কিলোমিটার সীমান্তের ৪৩০ কিলোমিটার-ই হলো দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে, বাকী ১০৫ কিলোমিটার মোজাম্বিকের সাথে। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মতোই ট্রপিক্যাল কান্ট্রি, সারা বছরই তাপমাত্রা উষ্ণ থাকে। পুরো দেশজুড়ে পাহাড় আর অরণ্য। এইসব পাহাড়ে অরণ্যে কেবল হিংস্র বন্যপ্রাণীই ঘুরে বেড়ায় না, ওদের যারা ধরে ধরে খায় সেইসব হিংস্র মানুষের সংখ্যাটাও একেবারে কম না। সভ্যতার ছোঁয়া এই দেশটিতে তেমন লাগেনি বললেই চলে। দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন রাজা, এরপরেই রাণী মা। রাজার অবর্তমানে রাণি মা-ই রাজ্য চালান। এই রাণী মা কিন্তু রাজার স্ত্রী নন। রাজার মৃত্যু হলে 'রাজা নির্বাচন কাউন্সিল' রাজপরিবারের একজন যোগ্য লোককে নতুন রাজা

নির্বাচিত করেন। সাথে সাথে একই কাউন্সিল পূর্বতন একজন রাজার প্রথম স্ত্রীকে নতুন রাণী মা নির্বাচিত করেন। ৮০ সদস্যের একটি নামমাত্র সংসদ আছে। যার অধিকাংশ সদস্যই রাজা কর্তৃক মনোনীত আর কিছু সদস্য গণতান্ত্রিভাবে নির্বাচিত। এই সংসদের আবার একটি ২০ সদস্যের আপার হাউজ আছে। আপার হাউজের নাম সিনেট। যার ১০ জন সিনেটর রাজা কর্তৃক মনোনীত আর বাকী ১০ জন সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত। সংসদের মেয়াদ ৫ বছর। তবে রাজা তার খেয়াল খুশি মতো এর আয়ু বাড়াতেও পারেন আবার চাইলে যে কোন দিন সংসদ বাতিল করেও দিতে পারেন। এটা খেয়ালি রাজার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। বর্তমান সোয়াজি রাজার নাম হলো স্বাতি-৩ (Mswati-III). আজকের দিনে রাজা স্বাতিই সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাজা, যিনি তার দেশে যা খুশি তা-ই করতে পারেন। স্বাতি-৩ এ পর্যন্ত ১৩টি বিয়ে করেছেন। প্রতিবছর তিনি একটি করে ভার্জিন মেয়ের পাণি গ্রহন করেন। ২০০৫ সালে তিনি একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করে বিশ্বজুড়ে হৈ চৈ ফেলে দেন।

সতের শতকে বান্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা মোজাম্বিকের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মাইগ্রেট করে। দেড়শ বছর পরে বান্তু সম্প্রদায়ের কয়েকটি গোত্র মূল সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সোয়াজিল্যান্ডে এসে বসতি স্থাপন করে। এ সময়ে নেটিভ জুলুদের সাথে ওদের প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। বান্তু সম্প্রদায়ের প্রধান সোয়াজি ব্রিটিশদের কাছে সাহায্য চায় জুলুদের হটিয়ে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিতে। ব্রিটিশদের সহযোগীতায় পরবাসী বান্তুরা সোয়াজিল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং ১৮৮১ সালে স্বাধীন সোয়াজিল্যান্ড গড়ে তোলে। পরবর্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকা অনেকদিন সোয়াজিল্যান্ড শাসন করে এবং এক পর্যায়ে, ১৯০২ সালে, ব্রিটিশদের কাছে দেশটির শাসনভার হস্তান্তর করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯৬৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সোয়াজিল্যান্ড পুনরায় স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৬ সাল থেকে রাজা স্বাতি-৩ দেশের সর্বময় শাসনকর্তা। তিনিই দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন। ২০০২ সালে যখন ভয়াবহ খরাকবলিত হয়ে দেশের হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ না খেয়ে মারা গেল, তখন তিনি ৫ কোটি ডলার দিয়ে একটি বিলাসী জেট প্লেন ক্রয় করেন নিজের প্রমোদ ভ্রমণের জন্য। খরা তৃতীয় বছরের মতো প্রলম্বিত হয়ে ২০০৪-এ প্রবেশ করলে দেশটির অর্থনীতি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেলেও উদাসী রাজা সে বছর তার ১১ রাণী-র জন্য বিলাসী রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। এর ঠিক কয়েকদিন আগে তিনি তার ১১ রাণীর জন্য ক্রয় করেন ১১-টি লাক্সারী মার্সিডিজ বেঞ্জ।

সোয়াজিল্যান্ডের বর্তমান অবস্থা হলো একটি গাধার পিঠে চড়ে খরাক্রান্ত মরুভূমিতে বৃষ্টির প্রার্থনারত এক মুসাফিরের দশা। এইডস এখন এপিডেমিক পর্যায়ে চলে গেছে। দেশের ৩০ শাতংশ লোক এইডসে আক্রান্ত। আর এইচাইভি ক্যারিয়ারের সংখ্যা প্রায় দুই তৃতীয়াংশ।

প্রতি বছর আগস্ট মাসে সোয়াজিল্যান্ডের লুদজিদজিনি রয়েল ক্রাল-এ কুমারী নৃত্যের আসর বসে। গত বছর (২০০৫) এই নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয় প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশী কিশোরী-যুবতী। যা এ যাবতকালের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে। আরো মজার ব্যাপার হলো সোয়াজিল্যান্ডের ট্রেডিশনাল এই নৃত্যানুষ্ঠানের অংশ নিতে গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসে প্রায় ২ হাজার কুমারী। রাজা স্বাতি প্রতিবছর এই দিনটিকে বেছে নেন তার নতুন রাণী নির্বাচনের জন্য। নৃত্যরত কুমারীদের মধ্যে থেকে তিনি তার পছন্দমতো সেরা সুন্দরীটিকে বেছে নেন। এরপর তাকে বিয়ে করে তুলে নিয়ে যান রাজপ্রাসাদে। হয়ত দোর্দন্ড প্রতাপশালী এক রাজার রাণী হবার প্রলোভনে পড়েই রয়েল ক্রাল-এর সামনের ভিড়টি প্রতি বছর আগস্ট মাসে ক্রমশই বাড়ছে। ভয়াবহ খরায় যাদের জীবন দূর্বিসহ, এইডস নামক এক ভয়ঙ্কর দানব যাদের প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ঝলমলে এক রাজপ্রাসাদের রাণী হবার দিবাস্বপ্নে মশগুল থাকা সেইসব মেয়েদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। হোক না রাজার তের, চৌদ্দ কিংবা যে কোন নম্বরের রাণী। বহুবিবাহ পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশের একটি অন্যতম উপায়। মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশে রাজতন্ত্র বিরাজ করছে সেইসব দেশেও একই চিত্র দেখা যায়।

সোয়াজিল্যান্ডের বর্তমান লোকসংখ্যা হলো মাত্র ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার। প্রতি বছর গড়ে হাজারে ২.৫ জন করে লোক কমে যায়। অর্থাৎ বছরে প্রায় ৩ হাজার লোক কমে যায়। এর কারণ হলো উচ্চ জন্মহারের চেয়েও অধিক উচ্চ মৃত্যুহার। অন্যান্য ট্রপিক্যাল অসুখের পাশাপাশি এইডসের ভয়াবহ আক্রমণই জনসংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ। সিসওয়াতি ভাষার ১১ লক্ষ মানুষের ২ লক্ষই এইডসে আক্রান্ত। সে দেশের পুরুষেরা বিশ্বাস করে এইডস আক্রান্ত কোনো পুরুষ যদি কুমারী মেয়ের সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার এইডস ভালো হয়ে যাবে। এই কুসংস্কারের কারণে সোয়াজিল্যান্ডে এইডস আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের গড় আয়ু এখন নেমে এসেছে ৩২ বছরে। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত ছোট্ট এই সবুজ, পাহাড়ি দেশটি হতে পারতো একটি সম্ভাবনাময় দেশ। কিন্তু রাজতন্ত্রের খেয়ালী যাঁতার চাপে পড়ে সোয়াজিদের জীবন কেবল দূর্বিসহই হয়ে উঠছে প্রতিদিন।

রাজতন্ত্র নানান ফর্মে এখনো পৃথিবীর অনেক দেশে আছে। আবার অনেক দেশে রাজতন্ত্র নানা ফর্মূলায় ফিরে আসছে। বাংলাদেশে এখন যে তন্ত্রটি চলছে এটাও এক ধরনের রাজতন্ত্র। সোয়াজিল্যান্ডে, নেপালে আছে একটি রাজপরিবার আর আমাদের আছে দুটি রাজ পরিবার। প্রতি পাঁচ বছর পরপর আমরা গণতন্ত্রের কাছে যাই রাজপরিবার নির্বাচন করতে। দেশের ১৫ কোটি মানুষ উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে সবগুলো মিডিয়ার দিকে কোন রাজপরিবার আসছে আগামী পাঁচ বছরের জন্য। 'তলা বিহীন ঝুড়ি' বা দুর্নীতিতে ক্রমাগত চ্যাম্পিয়ন হবার অপবাদ ঘোচাতে হলে আমাদেরকে গণতন্ত্রের রঙিন মোড়কে জড়ানো 'গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সত্যিকারের গণতন্ত্র। একথা বুঝি ২০০৬-এ এসে বাংলাদেশের মানুষ কম-বেশি সবাই বুঝতে শুরু করেছে। তাই আগামী নির্বাচনের বৈতরণী পেরুতে রাজপরিবারগুলোকে কাঠ-খড় পোড়াতে হলেও হয়ত কোনোরকমে পার পেয়ে যাবে। তবে সেই দিন আর বেশী দূরে নেই যখন এ দেশে, 'গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র' না, সত্যিকারের গণতন্ত্র আসবে। আমি সেই গণতন্ত্রের কড়া-নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

১৭ আগস্ট, ২০০৬
আবিদজান, আইভরিকোস্ট

কাকাওয়ের দেশে

আটলান্টিকের এ অংশটির নাম গালফ অব গিনি। গালফ অব গিনির নীল জল যে ভূ-খন্ডে এসে আছড়ে পড়ছে, সেখান থেকেই শুরু বিশ্বখ্যাত চকোফিল্ড কোতদিভোয়া, ইংরেজীতে যাকে বিশ্ববাসী চেনে আইভরি কোস্ট নামে।

প্রায় অবিভক্ত জার্মানীর সমান, তিন লক্ষ সাড়ে বাইশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই বিশাল ভূ-খন্ড কোতদিভোয়া উৎপাদন করে সারা দুনিয়ার আশি শতাংশ কোকো, স্থানীয় ভাষায় যার নাম কাকাও। এই কাকাও থেকেই তৈরী হয় সুস্বাদু চকলেট। লম্বাটে ধরণের, দুই মাথা চোখা, পেট মোটা এক একটি কাকাওয়ের ওজন প্রায় আধাকেজি পর্যন্ত হয়। ভেতরে আতাফলের মতো অসংখ্য কোয়া, যার প্রতিটা কোয়ার ভেতরেই রয়েছে একটি করে বিচি। বিচির পাতলা আবরণটি তুলে ফেললেই এর ভেতরের পুরো শাঁসটিই হলো চকলেট। এই শাঁস গুড়ো করে তৈরী করা হয় চকো পাউডার, আর তা থেকেই তৈরী হয় বিশ্বব্যাপী এতো মজার মজার চকলেট। আমাদের দেশের আম-জাম গাছের মতোই কাকাও গাছ কোতদিভোয়ার এখানে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাকাও চাষ করা হয় এমন অসংখ্য পরিকল্পিত বাগানও রয়েছে কোতদিভোয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। এতো মারামারি, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, দখল, পাল্টা দখলের মহড়া সব ওই কাকাওয়ের জন্য। আইভরি কোস্টের কাকাও মানেই গহীন অরণ্যের গাছে গাছে ঝুলে থাকা থোকা থোকা সবুজ সোনা।

এ সোনার লোভেই ফরাসীরা আজো এ ভূ-খন্ডের মায়া ত্যাগ করতে পারে নি। ১৯৬০ সালে আইভরিয়ান নেতা ফেলি উফু বৈনির নেতৃত্বে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে, পরবর্তি ৩৩ বছর তিনিই আইভরি কোস্টের ক্ষমতায় থেকে ফ্রান্সের সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। উর্বর ঔপনিবেশ কোতদিভোয়ার মাটিতে ফরাসীদের ব্যাবসা-বাণিজ্যেরও ব্যাপক প্রসার ঘটে এই দীর্ঘ সময়ে। এখনতো এখানকার জল, বিদ্যুৎয়ের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিসগুলোর মালিক ফরাসীরাই।

প্লেন থেকে নেমেই প্রথম ধাক্কাটা খেলাম। আগুনের হল্কা এসে ঢুকলো ফুসফুসে। সাহারা, কালাহারির মতো দুটি বিশাল মরুভূমির অবস্থান যে মহাদেশে সেখানে গরমতো থাকবেই, এটা জেনেই প্লেনে চড়েছি কিন্তু তাই বলে এই শেষ ডিসেম্বরে! তাহলে জুনে কি অবস্থা হবে? ফাদি জানালো, ভয় নেই বন্ধু, এটাই এখানকার গরমকাল। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী, এই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশী গরম পড়ে এখানে। আর জুনের কথা বলছোতো, জুন হলো শীতলতম মাস, শীতকাল। তখন তাপমাত্রা নেমে আসে তেইশ-চব্বিশে। স্থানীয়রা তখন স্যুট পরে ঘুরে বেড়ায়।

রানওয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। কোনোরকম ইমিগ্রেশন চেক পয়েন্ট পার হতে হলো না আমাকে। এটাই নিয়ম হয়ে গেছে, ইউএন ফ্লাইটের যাত্রীদের ইমিগ্রেশনের ফর্মালিটি করতে হয় না। একটা মাঝারি আকৃতির ইউএন লেখা মিনিবাস দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বাসে তুলে দিয়ে ফাদি জানালো, ড্রাইভার আপনাকে রেসিডেন্স মনসন-এ নিয়ে যাবে। প্রথম কিছুদিন ওখানেই থাকতে হবে, সবাই তাই থাকে। এরপর দেখেশুনে একটা বড়িভাড়া করে নেবেন। ঘাবড়াবেন না, আমরাতো আছি, বাসা পেতে সাহায্য করবো।

বিচিত্র এক মহাদেশ আফ্রিকা। বিচিত্র এর মানুষ, প্রকৃতি, সামাজিক রীতিনীতি। আজো শত সহস্র পর্যটক ভিড় করে, বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আফ্রিকার মানুষ, সংস্কৃতি, অরণ্য ও প্রাণীবৈচিত্র। তবে ইদানিং পর্যটকগণ আর সংস্কৃতি ও আফ্রিকার বৈচিত্রময় প্রকৃতি দেখেই তৃপ্ত হয় না, আগ্রহ দেখায় এ ভূ-খন্ডের রাজনীতিতেও। নব্বুইয়ের দশকের গোড়ার দিক থেকেই বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্ব পেতে শুরু করে পশ্চিম আফ্রিকা, যার বড় কারণ কোতদিভোয়া কনফ্লিক্ট।

তেত্রিশ বছর ফরাসীদের পিঠ চুলকিয়ে ক্ষমতায় থেকে বোধ করি বৈনিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জল, বিদ্যুতের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ ঔপনিবেশিক প্রভূদের কাছ থেকে চড়ামূল্যে কিনতে কিনতে ক্রমশই ফুসে উঠছিলেন কোতদিভোয়ার স্থানীয় জনগন। বৈনির তাতে মৃদু সায় ছিলো হয়তো। হয়তো তিনি ক্রমশ সত্যিকারের স্বাধীনতার দিকেই এগুতে চাচ্ছিলেন। প্রাচীনকাল থেকেই কোতদিভোয়া এ অঞ্চলের সবচেয়ে উর্বর ভূমি, আশেপাশের দেশসমূহের মানুষেরা দলে দলে জীবিকার সন্ধ্যানে পাড়ি জমাতো কোতদিভোয়ায়। সন্দেহ নেই কোতদিভোয়াই, এখনো, পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি।

নব্বুইয়ের দশকের গোড়ার দিকে কোতদিভোয়ার অর্থনীতি যখন উৎকর্ষের শীর্ষে, তখন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো ফরাসী সামরিক সহায়তাকে অস্বীকার করার। ফরাসী ইন্টেলিজেন্সের ডিজিটাল চোখ এইসব ঘটনাপ্রবাহ দক্ষতার সাথেই ধারণ করতে থাকে। আর তখনি দেশটিতে শুরু হয় ব্যাপক আভ্যন্তরীণ কোন্দল। উল্লখ্য যে, ফ্রাঙ্কোফোনিক আফ্রিকায় ফরাসীরা দখলদারিত্ব ছেড়ে দিলেও ঔপনিবেশিকতার ছড়ি এখনো ঘোরাচ্ছে বেশ সফলতার সাথেই। আফ্রিকার ফরাসী ঔপনিবেশগুলোতে আজো ফরাসী সৈন্য মোতায়েন রয়েছে, একই মুদ্রা, সিএফএ (কারেন্সি অব ফ্রাঙ্কোফোনিক আফ্রিকা) চলে সবগুলো দেশে এবং সবাই একই ভাষায় (ফরাসী) কথা বলে। ঔপনিবেশগুলোকে ফ্রান্স যখন স্বাধীনতা দেয় তখন এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর করে যে, এই দেশগুলি নিজস্ব সেনাবাহিনী রাখতে পারবে না। ফরাসী সেনাবাহিনীই ওদেরকে প্রতিরক্ষা সুবিধা দেবে, বহিঃশত্রুর আক্রমন থেকে বাঁচাবে। এ নিয়ে দুর্বল দেশগুলো প্রকাশ্যে উচ্চবাচ্য না করলেও শক্তিশালী কোতদিভোয়ার জনগণ বারবারই মাথাচারা দিয়ে উঠছে, প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আর এখানেই ঘটে বিপত্তি। কাকাওসোনা হাতছাড়া হয়ে যাবে, এ-যে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না ফ্রান্স।

ব্রিজের কাছে এসে গাড়ি থামলো। নিচে প্রবাহিত হচ্ছে নীল লেগুন আর ব্রিজের ওপারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য বহুতল দালানের ভিড়ে জ্বজ্বল করছে একটি গাঢ় নীল রঙের মসজিদ। বাঁ দিকে এক কিলোমিটার দুরত্বে আরো একটি সমান্তরাল ব্রিজ। বিশাল একটি লেগুন যখন পুরো আবিদজান শহরকে দুভাগে ভাগ করে খলবল করে হেসে উঠছিলো, তখন এই দুটি ব্রিজ বিভক্ত আবিদজানকে জোড়া লাগিয়ে দিয়ে যেন মুচকি মুচকি হাসছে। কিন্তু গাড়ি চলছে না কেনো? দেখার চেষ্টা করলাম। স্থানীয় পুলিশ (বিভিন্ন রকমের ইউনিফর্ম পরা) চেকপোস্ট বসিয়ে একটা একটা করে গাড়ি চেক করছে। এটা কি সিকিউরিটি চেক? না, লক্ষ্য করে দেখলাম ওরা শুধু হলুদ ট্যাক্সিগুলোকেই থামাচ্ছে। কিছু বিনিময়ও হচ্ছে। মানেটা কি? ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। সেই পুরোনো কথা, এখানেও পুলিশ একই ভুমিকায়!

ব্রিজ পার হয়ে এপারে এসেতো চোখ ছানাবড়া, আশ্চর্য সুন্দর শহর। অগণিত ফ্লাইওভার, তিন/চার ট্র্যাক হাইওয়ে, লেগুনের ওপর গড়ে ওঠা রেস্টুরেন্ট, বার, আবাসিক হোটেলসমূহ। এটা কি আফ্রিকা? নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। পেছনে তাকিয়ে দেখি, লেগুনের ওপর ভাসমান একটি নৌকার আদলে দুলছে এক অভূতপূর্ব স্থাপত্যশিল্প, আবিদজানের থিয়েটার মঞ্চ। লেগুনের ওপর স্টেজ, স্টেজের পেছনটা আটকানো নৌকার ফুলে ওঠা পালে, উল্টোদিকে গ্যালারি। দারুণ এক স্থাপত্য, অদ্ভুত শিল্পকর্ম। এখানে যখন ওপেন এয়ার কনসার্ট হয়, গীটারের কড থেকে, পিয়ানোর রীড থেকে, শিল্পীর কণ্ঠ থেকে ঝংকৃত সুরধ্বণি এসে আছড়ে পড়ে লেগুনের নীল জলের ওপর, আর ব্লু লেগুন তা পৌছে দেয় এর দুপাড়ে গড়ে ওঠা শহরের বিস্তীর্ণ জনপদে। বিস্মিত হবার তখনো অনেক কিছু বাকী। হাতের বাঁ দিকে, যে জায়গাটির নাম প্লাতু, পথের ওপর লেগুনের প্যারালাল একটি হাসের আদলে বসে আছে বিশাল এক

ক্যাথিড্রাল। হাসটি এমনভাবে তৈরী, লেগুনের ওল্টোদিক থেকে দেখলে মনে হবে ঝড়ে কিংবা জোয়ারে ভাসতে ভাসতে একটি হাস এসে কূলে ভিড়েছে। আইভরিয়ানদের শিল্পজ্ঞানের, রুচিবোধের প্রশংসা না করে পারছি না। ফরাসীরা ওদের শিল্পরস পুরোটাই ঢেলে দিয়ে গড়ে তুলেছে ঔপনিবেশিক প্রজাদের, এতে আর সন্দেহের লেসমাত্রও রইলো না। স্ট্যাচু অব লিবার্টিকে যখন ফ্রান্স থেকে বয়ে নিয়ে গিয়ে নিউ ইয়র্কের হাডসন নদীর তীরে স্থাপন করা হলো, তখনি কেবল মার্কিনীরা টের পেয়েছিলো ফরাসীদের শিল্পবোধ কতো উঁচু। সাধে কি আর সারা দুনিয়ার হাজার হাজার পেইন্টার, কবি, কণ্ঠশিল্পী, ভাস্কর, অভিনয়শিল্পী ভিড় জমায় প্যারিসে।

ইউএন বাসটিতে এখন আর কেউ নেই, যাত্রী আমি একা। পাকানো পেশী আর শক্ত চোয়ালের এক কালো ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। এই অচেনা শহরের এক অজানা ঠিকানার দিকে ছুটছি, রেসিডেন্স মনসন। নামটা শুনে মনে হচ্ছে না জানি কতো চেনা একটি জায়গায় যাচ্ছি। ডানে প্রবাহিত লেগুন আর বাঁয়ে আবিদজানের বাণিজ্যিক এলাকা প্লাতুকে পাশ কাটিয়ে দুজনের বাসটি এগিয়ে চলেছে। বাসটি যখন ডানদিকে বাঁক নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে লোকালয় ছেড়ে ক্রমশ অপেক্ষাকৃত ফাকা এলাকার দিকে ছুটতে শুরু করেছে তখনি আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। বাঁয়ের রাস্তাটি একটি ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে ছুটে গিয়ে দু ভাগ হয়ে গেলো। এই কালো মানুষটি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? স্থানীয় জনগন মোটেও জাতিসংঘকে পছন্দ করে না। ওদের স্থির বিশ্বাস জাতিসংঘ, ফরাসী মিলিটারি, এরা সবাই বিদ্রোহীদের লোক। প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবোকে ক্ষমতাচ্যুত করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। এই ধারণা থেকেই নভেম্বর ক্রাইসিসের জন্ম। আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোতে দেখেছি ইয়াং পেট্রিয়ট নামের একটি গ্রুপ নভেম্বর ক্রাইসিসের সময় শুধু ফরাসী এবং ল্যাবানিজ মেয়েগুলোকেই না, শাদা চামড়ার অনেক ছেলেকেও ধর্ষণ করেছে। ওইদিন, ৬ নভেম্বর ২০০৪, আবিদজানের সিভিল সোসাইটি, সকল শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক রাজপথে নেমে এসেছিলো ফরাসীদের তাড়াতে। স্লোগান উঠেছিলো, 'আইভরিয়ানদের রক্তে নতুন ইতিহাস রচিত হবে'। অথচ ওদের সোনামানিক ইয়াং পেট্রিয়টরাই ধ্বংসজজ্ঞ ঘটিয়েছে বেশী, লুট করেছে প্রচুর বাড়িঘর, বিদেশীদের দোকানপাট, ভেঙেছে শত শত গাড়ি। আইভরিয়ান সেনারা গুলি চালিয়েছিলো ফরাসী সৈন্যের ওপর, হত্যা করেছে নয়জনকে। প্রতিশোধ নিতে ফরাসীরা ওদের এয়ার বেইজ পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। আর ইউএন তার সকল স্টাফকে নিরাপত্তার খাতিরেই সরিয়ে নিয়েছিলো পাশের দেশ ঘানার রাজধানী আক্রায়।

এই মুহূর্তে হস্টেজ হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। দগদগে ঘা এখন ওদের গায়ে। সামনে তাকিয়ে আমার কলিজা শুকিয়ে গেলো। পথের দু'পাশে হাজার হাজার কালো মানুষ। এতো কালো মানুষ একসঙ্গে আমার জীবনে এই প্রথম দেখলাম, গাড়িতেও আমার একমাত্র সঙ্গী একজন কালো মানুষ। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায় যাচ্ছো? রেসিডেনস মনসন কোথায়? ও আমার কথা বুঝলো কি-না মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না, ও নির্বিকার গাড়ি চালাচ্ছে আর মাঝে মাঝে বলছে 'উই উই', এই শব্দটির অর্থ কি, আমি কিছুই জানি না। আমার কেনো জানি মনে হচ্ছে পথের দু'পাশের এই অসংখ্য কালো মানুষের প্রত্যেকের কাছে একটি করে অস্ত্র, এরা সবাই ইয়াং পেট্রিয়ট এবং এই গাড়িচালকও ওদেরই লোক, আমাকে ও কিডন্যপ করেছে, নিয়ে যাচ্ছে কোনো বধ্যভূমিতে। প্রথম দিনই এই দুর্ভাগ্য বরণ করতে হচ্ছে? ভয়ে, কষ্টে এবং ক্ষোভে আমার কেবলই কান্না পাচ্ছে। প্রায় আটত্রিশ ঘন্টা জার্নির ধকলে এমনিতেই নেতিয়ে আছি, তার ওপর সমূহ হস্টেজের আশঙ্কায় আমি যেন বেঁচে থেকেই মরে গেছি। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। আফগানিস্তান এবং ইরাকে অনেক সহকর্মীর হস্টেজ হওয়ার লোমহর্ষক বর্ণনা শুনেছি, অনেককে অপহরণকারীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

ড্রাইভার এখনো আমার সঙ্গে কোনো কথা বলছে না।

কেটে গেলো আরো প্রায় পাঁচ মিনিট। সময় যতো গড়াচ্ছে আমার কাঁপুনি ততোই বাড়ছে। হঠাৎ একটি নির্জন স্থানে, আকাশী রঙের গেইট, একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামালো ও। আমি কোথাও রেসিডেন্স মনসন লেখা দেখতে পাচ্ছি না। মাথার ওপর দুটি বিশাল বনবট গাছ, ডানদিকের রাস্তায় সারি সারি পুরোনো আমগাছের এক অন্ধকার ভূতুড়ে জঙ্গল। রাস্তার উল্টোদিকেও বেশ কিছু চেনা অচেনা বড় বড় বৃক্ষ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, আকাশমনি আর কৎবেল সদৃশ গাছ দেখতে পাচ্ছি। গেইটের আকাশী রঙটি বেশ নতুন, ঝকঝকে হলেও বাড়ির ভেতরটা ঘন গাছপালায় অন্ধকার। একটা ভূতুড়ে ভাব ধরে আছে। ড্রাইভার গাড়ির স্টার্ট বন্ধ না করেই আকাশী রঙের গেইটের

দিকে এগিয়ে গেলো। ভেতরে রঙ মরে যাওয়া একটি হলুদ একতলা দালান। বেইল টিপতেই একজন দশাসই জবরদস্ত কালো যুবক বেরিয়ে এলো। ওর দুপাশের গালেই তিনটি করে বাঘের থাবার মতো আচরের দাগ। এখানকার একটি বিশেষ ট্রাইব পরিবারের বড় সন্তানের দুই গালে জন্মের পরপরই ছুরি দিয়ে কেটে এরকম তিনটি করে ছয়টি দাগ করে দেয়। এই দাগ বহন করা বিশেষ সন্মানের ব্যাপার।

বাংলাদেশে হলে ওর নাম হতো 'গাল কাটা অমুক'। গালকাটা অমুকের সঙ্গে ড্রাইভারের কথাবার্তা শেষ। ও আবার এসে গাড়ি স্টার্ট দিলো। ও-কি আমাকে বিক্রি করার জন্য দরদাম করছে। এখানকার কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মানুষেরা মানুষের মাংসও খায়। যখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মারামারি লাগে, একদল অন্য দলের কম বয়েসী মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে খেয়ে ফেলে। মানুষের হাতের আঙুলগুলি কড়মড় করে কাচাই খায়। ওরাইতো রাক্ষস, ছোটবেলায় রূপকথার বইয়ে পড়া রাক্ষস। বড় হয়ে জেনেছি পৃথিবীতে রাক্ষস বলে কিছু নেই। একথা সত্যি না, রাক্ষস আছে, যারা মানুষের মাংস খায় ওরাই রাক্ষস।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ভাষার অন্তরায় দূর করা দরকার। যেভাবেই হোক ড্রাইভারের সাথে কমিউনিকেট করা দরকার। পকেট থেকে প্লেনের টিকিটটা বের করলাম, তারপর ওতে যতোটা সম্ভব বড় বড় করে লিখলাম UNOCI. লেখাটা ওকে দেখিয়ে আঙুল তুলে ডানে-বায়ে দিক নির্দেশ করলাম। মনে হয় কাজ হয়েছে। ও গাড়ি ঘুরালো এবার।

পনের মিনিটের মাথায় UNOCI (ফ্রেন্চ ভাষায় ONUCI) প্রধান কার্যালয়ে যখন পৌছলাম, তখন আমার আত্মায় পানি এলো। বুঝতে পারলাম আসলে ও নিজেও রেসিডেন্স মনসন চেনে না, তাই এলোপাথারি গাড়ি চালিয়ে ওটা খুঁজছিলো। আর যেহেতু ওর ইংরেজী ক আক্ষর গো মাংস তাই আমার সাথে কমিউনিকেট করার চেষ্টাও করে নি।

পৌনে দুই কোটি লোকের এই দেশটিতে বাষট্টিটি ট্রাইব বা উপজাতির বসবাস। প্রতিটি গ্রুপেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা। মূলত ভাষার ভিত্তিতেই এথনিসিটি নির্ণিত হয়েছে। এদের অনেকেই এসেছে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে। এরমধ্যে বুরকিনা ফাসো (আপার ভোল্টা), যেখানকার ১০০ শতাংশ মানুষ মুসলমান, থেকে আসা লোকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, ২৩ লক্ষ। অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ থেকে এসে কোতদিভোয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এথনিক গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে, মালি থেকে আসা ৮ লক্ষ, গিনি থেকে ২ লক্ষ ৩০ হাজার, ঘানা থেকে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার, বেনিন থেকে ১ লক্ষ ৮ হাজার, নিজার থেকে ১ লক্ষ ২ হাজার এবং নাইজেরিয়া থেকে আসা ১ লক্ষ ১ হাজার জন। এ ছাড়া আছে ২০ হাজার ফরাসী এবং ৩ লক্ষ লেবানিয় অভিবাসী। লাইবেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় সে দেশ থেকে পালিয়ে আসা প্রায় ৩ লক্ষ উদ্বাস্তু এখনো অবস্থান করছে আইভরি কোস্টে।

বাষট্টিটি ভাষাভিত্তিক উপজাতি/আদিবাসী মোটামুটিভাবে ৫টি প্রধান কমিউনিটিতে পোলারাইজড হয়ে গেছে। দেশের পূর্বাংশে বসবাস করে আকান সম্পদায়, দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্রু, পশ্চিমাংশে দক্ষিনী মান্দ, উত্তর-পশ্চিমে উত্তুরে মান্দ, উত্তর-পূর্বে এবং মধ্য-উত্তর অংশে বাস করে সেনুফো বা লবি সম্প্রদায়।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যার ৩৯ শতাংশ মুসলমান, ২৬ শতাংশ খ্রীষ্টান এবং বাকী ৩৫ শতাংশ এনিমিস্ট। লেবানিজ এবং ফরাসীরা ছাড়া স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ১০০ শতাংশ মানুষেরই গায়ের রঙ কালো। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে দেশটির মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে একটি রেখা টেনে দেশটিকে উত্তর-দক্ষিণে দুভাগ করা হয়েছে। এই রেখাটির নাম জোন অব কনফিডেন্স, যা পাহারা দিচ্ছে জাতিসংঘের সৈনিকেরা। দক্ষিণের খ্রীষ্টান মেজরিটি অংশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আর দেশের উত্তরাংশ, যেটি প্রধানত অভিবাসী এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, রয়েছে বিদ্রোহীদের দখলে। দেশের রাজনৈতিক রাজধানী ইয়ামাসুক্রো, বাণিজ্যিক রাজধানী আবিদজান সহ অন্যান্য বেশ কটি বড় শহর এবং বাণিজ্যিক এলাকা, যেমন: দালোআ, সান পেদ্রো, দানানে, গিগলু, আবেনগুরু, সাসান্দ্রা, গ্র্যান্ড লাহু, তাবু, বন্দুকু, বুয়াফলে রয়েছে বাগবো সরকারের দখলে। অন্যদিকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বুআকে এখন বিদ্রোহীদের রাজধানী। এ ছাড়া উত্তরাংশের গুরুত্বপূর্ণ শহর মান, করোগোসহ বেশ কিছু এলাকা রয়েছে বিদ্রোহীদের দখলে। জাতিসংঘের প্রায় সাড়ে ছয় হাজার সৈন্য মোতায়েন রয়েছে কোতদিভোয়ায়, যার অর্ধেকই বাংলাদেশী। এছাড়া আছে আড়াই'শ মিলিটারি অবজার্ভার, তিন'শ ইউএন পুলিশ, পঁচ'শ আন্তর্জাতিক বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সাড়ে চার'শ স্থানীয় কর্মী। বাংলাদেশ ছাড়া আরো যেসব দেশ ফোর্স কন্ট্রিবিউট করেছে সেগুলো হচ্ছে: পাকিস্তান, ফ্রান্স, নিজার, ঘানা, বেনিন, জর্দান, মরক্কো ও সেনেগাল।

রেসিডেন্স মনসনের জীবন তেমন খারাপ লাগছে না। একটি ডুপ্লেক্স রুম, ওপরতলায় শোবার ঘর, নিচে বসার ঘর আর কিচেন। টিভি, ফ্রিজ, এসি সবই আছে। ভাড়া প্রতিদিন ৪২ হাজার সিফা অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকার মতো। রুম সার্ভিসের ছোকরাগুলোর গায়ে অসুরের শক্তি, হুকুম করতে যা দেরী, তামিল হয়ে যায় চোখের নিমিষে। বাজার-সদাইয়ের ব্যাগ, বড় বড় স্যুটকেস সব মুহূর্তের মধ্যে ওপরতলা-নিচতলা হয়ে যাচ্ছে। কালোদের রক্তের মধ্যেই একটা দাসত্বের ভাব আছে। দুটো পয়সা বকশিস দিলে, জুতো সাফ, কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা থেকে শুরু করে হেন কোনো কাজ নেই করে দিচ্ছে না। তবে ফ্রিজে রাখা দুধ কিংবা জুস চুরি করে খায়, বোতলে মুখ দিয়েই খায়, এটা খুবই অশোভন কাজ। ডাকলে এমনভাবে আসে যেন হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। সামনে এসে দাঁড়ায় দুই হাত ভাঁজ করে বুকে তুলে, মাথা নুইয়ে। কথা বলে মাটির দিকে তাকিয়ে। পরে জানতে পারলাম এরা আসলে বুরকিনা ফাসো, মালি কিংবা নিজার থেকে আসা। পিওর আইভরিয়ানরা খুবই উদ্ধত। এর নমুনাও পেতে শুরু করেছি। স্থানীয় সহকর্মী, যারা আমাদেরই অ্যাসিসটেন্ট হিসাবে কাজ করছে, কোনো কাজের হুকুমতো দূরের কথা, অনুরোধ করেও করানো যায় না। মুখের ওপর ত্যাড়া ত্যাড়া কথা বলে। ওদের বস হিসাবে আমাদেরকে নিয়োগ দিয়ে যেন জাতিসংঘ বড় অন্যায় করে ফেলেছে। আসলে জাতিসংঘের এখানে অবস্থান করাটাকেই ওরা মেনে নিতে পারছে না।

উত্তরে মালি এবং বুরকিনা ফাসো, পূর্বে ঘানা, পশ্চিমে লাইবেরিয়া আর দক্ষিণে গালফ অব গিনি বা আটলান্টিক মহাসাগর। এই হলো আইভরি কোস্টের আন্তর্জাতিক সীমানা। অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে নিজার, কঙ্গো, সেনেগাল, ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, বেনিন প্রভৃতি, যাদের অধিকাংশই দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করছে। এই রকম একটি অঞ্চলে অবস্থান করে যদি আবিদজানের মতো ইউরোপিয় মানের একটি শহরের স্থায়ী অধিবাসী হয়, তাহলেতো গর্ব কিছুটা থাকবেই।

আইভরিয়ানদের গায়ের রঙ প্রচন্ড কালো হলেও চামড়া বেশ মসৃণ, একেবারে তেলতেলে। কি নারী কি পুরুষ সকলেরই পেশীবহুল সুঠাম সুগঠিত শরীর। মেয়েদের গড় উচ্চতা সাড়ে পাঁচফুট আর ছেলেদের ছয়ফুট। দু'চারজন বেঁটে মানুষও দেখা যায় তবে ওদের সংখ্যা একেবারেই নগন্য। নাকের সামনের অংশ বেশ মোটা হলেও থেবড়ানো না এবং নিচের ঠোঁট পুরু। সকলেরই চুল কোঁকড়ানো। কথা বলে প্রচন্ড জোরে, মনে হয় ঝগড়া করছে। ফরাসী ভাষার মতো এতো মধুর একটি ভাষা ওদের কণ্ঠে একেবারেই মানায় না। ছেলে-মেয়ে সকলেরই লজ্জা-শরম খুব কম। ছেলেগুলি অফিসের বাথরুমে (এবলুশনগুলোতে) উলঙ্গ হয়ে সকলের সামনে শুধু গোসলই করে না, অবলীলায় হাঁটে, কথা বলে, দাঁত মাজে। যেন ওই বস্তু ঝুলিয়ে হাঁটার মধ্যে একটা বাহাদুরি আছে। রাস্তা-ঘাটে যেখানে-সেখানে কোনোরকম আঁড়াল ছাড়াই একদল মানুষের দিকে মুখ করে মুত্রত্যাগ করে। ভাগ্যিস মেয়েদেরকে এমনটি করতে দেখা যায় না, এটাই না-কি সভ্যতা। এঙ্গোলাতে মেয়েরাও পথের পাশের ড্রেনে বসে-দাঁড়িয়ে ওই কাজ করে।

আইভরিয়ান মেয়েদের চলাফেরা ইউরোপিয় মেয়েদের মতোই খোলামেলা। ওদের গুরু নিতম্ব আর ভারী স্তনযুগল যতোটা সম্ভব ফুটিয়ে তোলা যায় সে রকম পোশাক-আশাক পরতেই ওদেরকে দেখা যায়। তবে আইভরিয়ান মেয়েদের ট্র্যাডিশনাল পোশাক হলো সেলাইবিহীন দু'টুকরো কাপড়। এক টুকরা শরীরের নিচের অংশে পরিধান করে, দ্বিতীয় টুকরাটি দিয়ে শরীরের ওপরের অংশে পেঁচ কষে বুকের ওপর গেরো দিয়ে বাঁধে। প্রায়শই দেখা যায় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ঢিলে হয়ে যাওয়া গেরো খুলে আবার বাঁধছে, বাংলাদেশের ছেলেরা যেমন লুঙ্গির গিট আলগা হয়ে গেলে আবার ঠিক করে নেয়।
কোকড়া চুল সোজা করার জন্য এখানকার মেয়েরা জীবনপণ সংগ্রাম করে, কতো রকমের চুলের অষুধ খায়, ব্যবহার করে তার শেষ নেই। প্রায় সব মেয়েকেই উইগ পরতে দেখা যায়, অথবা চুলের সাথে আলগা চুল জুড়ে তৈরী করে হাজার বেনী। এইসব বেনী তৈরী করার জন্য যেমন ফুটপাতে প্রচুর দোকান রয়েছে তেমনি আছে অভিজাত হেয়ার ড্রেসারও। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মতোই এখানকার মেয়েরাও ভিনদেশী পুরুষ শিকারের ফন্দি-ফিকির করে বেড়ায়।

রাতের আবিদজান জমে ওঠে যে কোনো ইউরোপিয় বড় শহরের মতোই। অসংখ্য বার, রেস্তোরা, নাইটক্লাবগুলো শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যা থেকে গরম হতে থাকে। সারারাত চলে উদ্দাম নৃত্য, হুলুস্থুল মিউজিক, মদ্যপান আরো কতো কি। আবিদজানের বারগুলোতে শুধু যে স্থানীয় মেয়েরাই এটেনডেন্টের কাজ করে তা-ই না, বারের মালিকগণ বাৎসরিক চুক্তির ভিত্তিতে থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, চায়না, ইউক্রেন, রাশিয়া, মরক্কো থেকে শিক্ষিতা এবং সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে আসে। তবে

বিদেশী মেয়ে আছে এমন বারগুলোতে স্থানীয় খদ্দেরের চেয়ে বিদেশী খদ্দেররাই বেশী যায়। বেশ কিছু মাসাজ পারলারও রয়েছে, আছে নানান কায়দার নানান রেটের মাসাজ। এসব কাজে থাই, চায়নিজ এবং ফিলিপিনা মেয়েদের কদর বেশী। রাশিয়ান মেয়েরা দক্ষ বেলি নৃত্যে, আর মরক্কান মেয়েদেরকে ঘিরে খদ্দেররা ভিড় করে মৌচাকে বসা মৌমাছির মতো।

অর্কা, সকোসে, হায়াত, ট্রেড সেন্টার, ক্যাপসুড, ক্যাশ সেন্টার প্রভৃতি ইউরোপির মানের সুপারমার্কেট। ফলমূল, তরিতরকারী থেকে শুরু করে মদ, বিয়ার, চুরুট, পারফিউম, চাল-ডাল-তেল-নুন, মাছ-মাংস, প্রক্রিয়াজাত খাবার, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, কসমেটিকস কি নেই এসব দোকানগুলোতে।

বাসা খুঁজে পেতে তেমন অসুবিধা হলো না। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আবিদজানের সবচেয়ে অভিজাত রেসিডেন্সিয়াল এলাকা রিভিয়েরাতে একটি তিন বেডরুমের ফ্রি ফার্নিশড এপার্টমেন্ট পেয়ে গেলাম। ভাড়া ছয়'শ ডলার। পাশেই বাংলাদেশী সাপোর্ট কম্পানি এবং সিগন্যাল কম্পানি। কাজেই নিরাপত্তার দিক থেকে জায়গাটি আদর্শ বলেই আমার সিকিউরিটি সেন্স বলছে। বাসার পাশেই আইভরি কোস্টের সবচেয়ে বড় মসজিদ রিভিয়েরা মস্ক। বিশাল এলাকা জুড়ে একটি মসজিদ কমপ্লেক্স। অনেকটা আমাদের বায়তুল মোকাররমের মতো। ওদের নিজস্ব রেডিও সেন্টারও রয়েছে, যেখান থেকে প্রায় সারাদিন কোরান তেলাওয়াত সহ নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। বাসার আশে-পাশে রয়েছে প্রচুর খোলা জায়গা এবং অসংখ্য ফল-ফুলের গাছ। ঠিক আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাসাগুলোর মতো। বেডরুমের জানালার পাশে রক্তকরবীর ডালে ঝুলে আছে থোকা থোকা রক্তকরবী ফুল। রোজ সকালে ঘুম ভাঙে রক্তকরবীর ডাল থেকে ভেসে আসা পাখির কলকাকলিতে।

পরিচয় হলো সাপোর্ট কম্পনীর কমান্ডার লে. কর্নেল এনশাদ এবং সিগন্যাল কম্পানীর কমান্ডার লে. কর্নেল এক্তেদারের সাথে। দুজনই খুব অমায়িক মানুষ। ৭০ হাজার সিফা বেতনের ঘানিয়ান বুয়ার হাতের রান্না খেয়ে যখন হাঁপিয়ে উঠি তখনি ছুটে যাই সাপোর্ট কম্পানীতে বাংলা খাবার খেতে। অপেক্ষাকৃত তরুণ অফিসারদের মধ্যে লে. কমান্ডার জামিলের আতিথেয়তায় আমি সত্যিই মুগ্ধ।

ঠিক হলো, সামনের উইকএন্ডে আমি এবং লে. কর্নেল এনশাদ দালোআ যাবো, ওখান থেকে কোতদিভোয়ার পোর্ট সিটি এবং সবচেয়ে সুন্দর পর্যটন শহর সান পেদ্রো বেড়াতে যাবো। দালোআ থেকে আমাদের দলে যোগ দেবে লে. কর্নেল সোবহানি। দালোআ অনুসির সেক্টর ওয়েস্টের হেড কোয়ার্টার। এই সেক্টরের কমান্ডার আমাদের ব্রিগেডিয়ার রফিকুল ইসলাম। সেক্টর ইস্টের হেড কোয়ার্টার হলো বুআকেতে, ওখানকার সেক্টর কমান্ডার এক মরোক্কান কর্নেল।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বুআকের নিয়ন্ত্রণ বিদ্রোহীদের হাতে। বিদ্রোহীদের নেতা সরো গুইলুমে, যাকে সমর্থন দিচ্ছেন আরডিআর-এর নেতা উয়াত্তারা আলাসান। দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল এফপিআই এবং আরডিআর-এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবো এবং উয়াত্তারা আলাসান।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বৈনির প্রধানমন্ত্রী উয়াত্তারা আলাসানকে ২০০০ সালের নির্বাচনে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অযোগ্য প্রার্থী ঘোষণা করা হলে দেশে অস্থিতিশীলতা দানা বাঁধে। সংবিধানের আর্টিকেল ৩৫ অনুযায়ী কারো পিতা কিংবা মাতা এর যে কোনো একজন বিদেশী হলে তিনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবার অযোগ্য। উয়াত্তারার বাবা আইভরিয়ান হলেও মা ছিলেন বুরকিনা ফাসোর মেয়ে। হাফ আইভরিয়ান হবার কারণে উয়াত্তারাকে অযোগ্য প্রার্থী ঘোষণা করা হয় আর সাথে সাথে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরী হয় দেশব্যাপী। জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালতে শুরু করে মধ্যস্বত্বভোগি বিদেশী চক্র। গেরিলা নেতা সরোর সাথে হাত মেলান উয়াত্তারা। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। দ্বিধাবিভক্ত আইভরিয়ানদের জন্য মুক্তির বারতা নিয়ে আকাশ থেকে নেমে এলো একদল এঞ্জেল, আফ্রিকান ইউনিয়ন, জাতিসংঘসহ নানান মধ্যস্থতাকারী। ফল কিছু হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাগবো আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তার প্রেসিডেন্সিয়াল ক্ষমতাবলে আর্টিকেল ৩৫ সংশোধন করেন। এখন আইভরিয়ানরা দিন গুনছে নতুন নির্বাচনের। ৩১ অক্টোবর ২০০৫-এ বাগবো সরকার তার মেয়াদকাল পুরা করবে। জাতিসংঘসহ সকল পার্টিই মেনে নিয়েছে এতো তড়িঘড়ি করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং আরো ছয় মাস মেয়াদ বাড়ানো হলো। সবাই আশা করছে ৩১ অক্টোবর বাগবো ক্ষমতা ছেড়ে দেবে, ট্রানজিশনাল সরকার গঠিত হবে। যে সরকারের একটি বড় কাজ হবে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহনে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করা।

এরি মধ্যে আমি একটি ব্র্যান্ড নিউ প্রাডো পেয়ে গেছি। সকাল নয়টায় বেরিয়ে পড়লাম দালোআর উদ্দেশ্যে। আবিদজান থেকে তিন'শ কিলোমিটার ড্রাইভ করে প্রথমে যেতে হবে কোতদিভোয়ার রাজনৈতিক রাজধানী ইয়ামাসুক্রোতে, ওখান

থেকে আরো দেড়'শ কিলোমিটার পথ গাড়ি চালিয়ে যাবো দালোআ। এখানেই শেষ না, দালোআ থেকে সান পেদ্রো আরো সাড়ে তিন'শ কিলোমিটার। সত্যিকার অর্থেই এক লঙ ড্রাইভ। সর্বমোট পাড়ি দিতে হবে সাত'শ কিলোমিটার পথ, আবার একই পথ ড্রাইভ করে ফিরে আসা।

কদাচ কোনো গাড়ি চোখে পড়ছে, শনিবার বলেই হয়ত। বিশাল হাইওয়ে, দুশো ফুট প্রশস্ত ওয়ানওয়ে রোড। চমৎকার মসৃণ পিচঢালা রাস্তা, একেবারে স্মুথ, তেমন কোনো বাঁকও নেই। ডেশবোর্ডে তাকিয়ে দেখি গাড়ির গতি এখন ১৬০ কিলোমিটার। মাই গড, অথচ একটুও ফিল করছি না যে ওভার স্পিডিং হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ যে দু'একটা গাড়ি ওভারটেক করছি কিংবা আমাদের ওভারটেক করছে সবাই মোটামুটি ওইরকম গতিতেই চালাচ্ছে।

রাস্তার দুপাশে নানান রকম বুনো ফুল, কাসাবা আর ঘাসের মতো সরু এক ধরনের নলখাগরার ঘন সবুজ। দু'পাশের সবুজ বনভূমি যেনো হামাগুড়ি দিয়ে পথের ওপর নেমে এসেছে, আর সামনের গাড়ির বাতাশে নদীর ঢেউয়ের মতো দুলতে দুলতে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছে। অপূর্ব। ডানে তাকিয়ে দেখি একটি তালবন, জীবনে এই প্রথম কোনো তালবন দেখলাম। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শত শত এলোপাথারী তালগাছ। বেশ কিছু গাছের মাথা মুড়ানো, বোঝাই যাচ্ছে বুড়ো হয়ে যাওয়ায় ওই গাছগুলোর আর পাতা গজায় নি। কয়েকটি মাঝখান থেকে ভেঙে মাথা হেট করে মাটিতে পড়ে আছে।

কিছুদূর এগোতেই একটি লোকালয়, বদ্ধ গ্রাম। ছোট ছোট খুব নিচু অনেকগুলি মাটির ঘর পাশাপাশি-গাদাগাদি করে এ ওর গায়ে যেন ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরগুলোকে ঘিরে রেখেছে বেশ ক'টি বাঁশঝাড়, ফলবতি অসংখ্য আমগাছ সহ নাম না জানা আরো অনেক গাছ। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, এখানে পথের দু'পাশে কৃষ্ণচূড়া এবং রাধাচূড়া গাছের প্রাচুর্য। এছাড়া রয়েছে ঘন তিথিলার বন। আরেক ধরণের গাছ বেশ চোখে পড়ছে, আকাশছোঁয়া এই গাছগুলোর স্থানীয় নাম বাওবাব, অনেকটা ইউকেলিপটাসের মতো মসৃণ শরীর, কমপক্ষে কুড়ি ফুট বেড় (মোটা), দীর্ঘ সরু কান্ড যেন সোজা উঠে গেছে আকাশে। নিশ্চয়ই খুব দামী কাঠগাছ এগুলো। বলতে বলতেই পরপর চারটি বিশাল লরি গোঁ গোঁ শব্দ করে কয়েকটি বাওবাব গাছের প্রকান্ড দেহ বহন করে ছুটে গেলো আবিদজানের দিকে। দেখে খুব কষ্ট লাগলো, মনে হলো যেন কোনো আগ্রাসী সেনাদল যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত ক'জন বাওবাবের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে ওদের ব্যারাকে আর দুপাশের আত্মীয় বৃক্ষরা শোকে মুহ্যমান হয়ে আছে। ফরাসী বণিকেরা বুঝি এমনি করেই উজার করে ফেলছে কোতদিভোয়ার বনাঞ্চল।

ট্রপিক্যাল আবহাওয়া হবার কারণে আমাদের দেশের প্রায় সব ধরণের বৃক্ষ ও ফলমূলই এখানে দেখা যায়। কাকাও ছাড়াও এখানকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বনজ ও কৃষিসম্পদের মধ্যে রয়েছে কাজু বাদাম, কফি, রাবার, পাম অয়েল, নারকেল, কাসাবা, কলা প্রভৃতি। পাকা কলা তেলে ভেজে কিংবা পুড়িয়ে খেতে আইভরিয়ানরা বেশ পছন্দ করে। এর নাম আলুকো। এ ছাড়া পেস্তা আলুর মতো এক ধরণের রুট, যার নাম কাসাবা, এখানকার মানুষের প্রধান খাদ্য। কাসাবা গুড়ো করে ছোট ছোট দানা তৈরী করা হয়, সেই দানা সেদ্ধ করলে ভাতের মতো শাদা এক ধরণের খাবার তৈরী হয়, এর নাম কুছকুছ। এটাও এখানকার প্রিয় খাবার।

আমরা গাড়ি থামালাম গ্রামটির সামনে। ছোট ছোট টেবিলের ওপর পশরা সাজিয়ে বেচা-বিক্রি করছে ক'জন যুবতী নারী। ওদের প্রায় প্রত্যেকের পিঠেই একটি করে শিশু। টেবিলে সাজানো বেশাতীর সবই ফলমূল এবং তরিতরকারী। এবাকাডো, টমেটো, পেপে, কমলা, কলা, নারকেল, কাসাবা, আম ও আলু। এখানকার গাছে বরোমাস আম হয়। সারা বছর ধরেই কাচা-পাকা আম পাওয়া যায় বাজারে।

পানি এবং কিছু শুকনো খাবার খেয়ে আবার রওয়ানা দিলাম। কিছুদূর এগোতেই কর্নেল এনশাদ বললেন, গাড়ি থামান। কেনো গাড়ি থামালাম জানি না কিন্তু যেখানে থামালাম তাকিয়ে দেখি বিশাল এক কফি বাগান। দুজনেই যারপরনাই খুশীতে আত্মহারা, একটা কফিবাগান আর একটা কাকাওবাগান না দেখতে পারলে আইভরি কোস্টে থাকার ষোলআনাই বৃথা, এই আক্ষেপ আমাদের মিটে গেলো। বিস্ময় আমাদের আকাশ ছুঁলো যখন ইয়ামাসুক্রোতে পৌঁছলাম। এই সেই বিশ্বখ্যাত বাসিলিকা, যা ভ্যাটিকানের চেয়েও বড়। এক লেবানিয় আর্কিটেক্টের ডিজাইনে সাবেক প্রেসিডেন্ট উফু বৈনি নিজ তদারকিতে তৈরী করেন এই বিস্ময়কর স্থাপত্যশিল্প।

পাঁচ হাজার সিফার টিকের কেটে আমরা যখন এর ভেতরে ঢুকলাম, গাইড জানালো, 'উই আর নো মোর ইন কোতদিভোয়া, উই আর নাউ ইন ভ্যাটিকান সিটি'। হ্যাঁ, সত্যিই তাই, বাসিলিকার পুরো ক্যামপাসটি ভ্যাটিকান সিটির অধিনস্ত, পোপই এর শাসনকর্তা। এক একটি দরোজার ওজন দুই টন হলেও এক আঙুলের ধাক্কায়ই তা খোলা এবং বন্ধ করা যায়। দেয়ালজুড়ে রয়েছে যিশুর জীবনীর ঘটমান সচিত্র বর্ণনা। বাইবেলের নানা অংশকেও চিত্রায়িত করা হয়েছে। বাসিলিকার বিশাল মোটা থামের ভেতর দিয়ে রয়েছে ঘূর্ণায়মান সিঁড়ি এবং চারটি থামের ভেতর রয়েছে বিদ্যুৎ চালিত লিফট।

বাসিলিকা দেখা শেষ হলে ইয়ামাসুক্রোর মিলিটেরি অবজার্ভার কর্নেল মুজাহিদ আমাদেরকে নিয়ে গেলেন রাজার বাড়ি দেখাতে। আসলে ওটা প্রেসিডেন্ট বৈনির বাড়ি, পুরো বাড়িটি প্রাডো জীপ চালিয়ে প্রদক্ষিণ করতে আমাদের সময় লাগলো প্রায় পঁচিশ মিনিট। বিশাল উঁচু পাঁচিলঘেরা বাড়িটির বেস্টনী সতেরো কিলোমিটার। বিস্ময়করই বটে, তৃতীয় বিশ্বের এক রাস্ট্রপতির বাড়ি।

বাড়ির সামনে একটি বড় লেক, ওখানে এসে থামলাম। লেক থেকে উঠে এলো অসংখ্য কুমীর, কারণ এখনি খাবার দেওয়া হবে। পরে জানতে পারলাম, আমরা আসবো বলে কর্নেল মুজাহিদ এইসব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছিলেন।

আইভরিয়ান নারী-পুরুষের সামাজিক বন্ধনের জন্য বিবাহ কোনো বাধ্যতামূলক বিষয় নয়। অবিবাহিত ছেলে মেয়ে একসাথে থাকছে, ওদের ছেলে-পুলে হচ্ছে। কেউ কেউ এভাবে কিছু বছর কাটানোর পরে ৩/৪ বাচ্চাসহ বিয়ে করে। আবার কেউ করে না। সম্পর্ক চুকে যায়। এতে ওরা দমে যায় না মোটেও। আবার নতুন বন্ধু কিংবা বান্ধবী জোগাড় করে নেয়। শুরু করে নতুন জীবন। এটা খুবই কমন একটি ব্যাপার। সামাজিকভাবে স্বীকৃত। তবে ভাঙা সম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্তানের দায়িত্বটি বরাবরই মাকে পালন করতে হয়। বাবা হয়তো বাকী পুরো জীবনে আর কখনোই এই সন্তানের খোঁজ নেয় না। আইভরিয়ান মেয়েরা তুলনামূলকভাবে ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রমী এবং দায়িত্বশীল। কর্মজীবী মায়েদেরকে দেখা যায় পিঠের ওপর বাচ্চা নিয়ে কাজে চলে যেতে। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আবার রান্না-বান্নাসহ যাবতীয় সাংসারিক কাজ করছে। সুপারমার্কেটগুলোতে শতকরা আশিজনই মেয়ে কর্মী, সিকিউরিটি গার্ডের মতো কঠিন পেশায়ও শতকরা ৫০জন মেয়ে কর্মী দেখা যায়। তবে অতি আশ্চর্যজনকভাবে এখানকার মেয়েদেরকে ক্লিনিং পেশায় দেখা যায় না।

কর্নেল মুজাহিদকে বিদায় দিয়ে দালোআর পথ ধরলাম। ক্রমশ যতোই উত্তরে যাচ্ছি বৃক্ষপ্রাচুর্য ততোই বাড়ছে। পথের দু'পাশে ঘন কালো ঝোপ-জঙ্গল। ডানে-বাঁয়ে সুবিশাল এলাকা জুড়ে পরিকল্পিত পাম এবং রাবার বাগান। পাহাড়ী রাস্তাটি ঢেউয়ের মতো কখনো নেমে গেছে দু'শো ফুট নিচে আবার উঠে যাচ্ছে দু'শো ফুট ওপরে। উল্টোদিক থেকে আসা গাড়িগুলোর দিকে যখন তাকাচ্ছি মনে হচ্ছে কোনো শিশু একটি খেলনা গাড়ি ঢালের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে আর তা তীর বেগে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে নিচের দিকে। এইভাবে ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে আমাদের দালোআর পথ। যখন দালোআ এসে পৌছলাম, ভীষণ হতাশ হলাম আমরা দু'জনই। শহরে ঢোকার পর থেকে অনুসির ইন্টিগ্রেটেড সদর দফতর পর্যন্ত প্রায় বিশ কিলোমিটার পথ, এটুকু পথ পাড়ি দিতেই কোমর ব্যাথা হয়ে গেছে। পুরো রাস্তায় বড় বড় গর্ত; ভাঙাচোরা, এবড়ো-থেবড়ো কাদা-মাটির পথ। কবি সিকদার আমিনুল হকের ভ্রাত্যুষপুত্র লে। কর্নেল সোবহানী কথা বলেন বিশুদ্ধ বাংলা শব্দে, তবে উঁচু, দন্ডায়মান, খাড়া কিছু দেখলেই তার প্রিয় শব্দ 'শিশ্ন' বলে চেচিয়ে ওঠেন যখন-তখন। শনিবার রাতটা সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার রফিকের অতিথেয়তায় দালোআতেই কাটালাম।

মধ্যবিত্ত বলে কোনো শ্রেণী নেই আইভরি কোস্টে। অধিকাংশ মানুষই চরম দরিদ্র। হাতে গোনা কিছু পরিবার অসম্ভব ধনী, এদের প্রায় সবাই বসবাস করে আবিদজানে। যে পরিবারের মাসিক আয় ৭/৮ শ ডলারের নিচে তাদের পক্ষে আবিদজানে বসবাস করা খুবই কঠিন। আবিদজানের রাস্তায় গড়ে প্রতি দশটি গাড়ির মধ্যে দেখা যায় তিনটি মার্সিডিজ (জার্মান), তিনটি পুজো (ফ্রেন্চ), দুটি বিএমডব্লিউ এবং ভক্সওয়াগন আর দুটি অন্যান্য। এই শহরে বসবাসকারী প্রায় সকলেরই গাড়ি আছে। ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে একবেলা খেতে গেলে ১৫ থেকে ২০ ডলার ব্যায় হয়। চুল কাটাতে লাগে ১০ ডলার। এই যখন আবিদজানের অবস্থা তখন এই শহরের বাইরের একজন কৃষক কিংবা কৃষাণীকে দেখা যায় এক ঝুড়ি আম কিংবা আনারস মাথায় করে দশ মাইল হেঁটে বিক্রি করে মাত্র ২ ডলারে, এ-ই তার সারদিনের রোজগার, পুরো পরিবারের ভরণ-পোষণের অর্থ। আইভরি কোস্টের গড় মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার হলেও এইসব খেটে খাওয়া মানুষ কোনোদিন ১ হাজার ডলার একসাথে স্বপ্নেও দেখে না। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রায় অধিকাংশই অবৈধ

উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। এই শ্রেণীটি ছাড়া, কাকাও বাণিজ্যের সাথে জড়িত বণিক শ্রেণী এবং রাজনীতিবিদদের হাতে কোতদিভোয়ার সমস্ত সম্পদ কেন্দ্রীভুত। এদের সকলের মাথার ওপরে বসে যারা সম্পদের পাহাড়ের ওপর হাঁটাহাঁটি করে তারা হলেন ভিনদেশী বণিক শ্রেণী, ফরাসী, লেবানিয় এবং অতি সম্প্রতি মার্কিনীরা।

পরদিন খুব ভোরে রওয়ানা হলাম সান পেদ্রোর উদ্দেশ্যে, সাথে কিছু শুকনো খাবার আর প্রচুর পানি এবং ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে নিলাম। দলে যোগ হলেন কর্নেল সোবহানী এবং নেভীর লে. কমান্ডার নাঈম মুক্তাদির। নাঈম এক টগবগে তরুণ, অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরা। ড্রাইভিংয়ের দায়িত্ব নিলেন নাঈম, সামনের সীটে সোবহানী ভাই আর পেছনে আমরা দুজন। এবার পথের দুপাশে শুধু কাকাও আর কাসাবার ঘন জঙ্গল, মাঝে মাঝে দু'একটি বাওবাব আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় দু'শো কিলোমিটার অতিক্রম করার পর একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে সাসান্দ্রা নদীটি পার হলাম। সাসান্দ্রা খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। ব্রিজের গোড়ায় ক'জন তরুণ সুতোয় গাঁথা মালার মতো সাজানো ছোট ছোট মাছ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সাসান্দ্রা থেকে ধরা তাজা মাছ। পাহাড়ী নদী সাসান্দ্রার ঘোলা জল ব্রিজের নিচে পাক খেয়ে খেয়ে তীব্র ক্ষোভে ফুসে উঠছে। কিছুদূর গিয়ে আবারো দেখা হলো সাসান্দ্রার সঙ্গে, এবার ওর বংশধর, এক শাখানদী, অপেক্ষাকৃত শান্ত। আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে রাবার বাগানের ভেতর দিয়ে কুলকুল ধ্বণি তুলে ছুটে চলেছে আটলান্টিকের দিকে। যতো এগোচ্ছি, রাবার বাগান ততোই ঘন হচ্ছে। আর কালো অন্ধকার রাবার বাগানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত সাসান্দ্রার বিরহী শাখাটি যেন মহাসাগরের বুকে আছড়ে পড়ার জন্য, প্রেমিক পুরুষের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবার জন্য খলবল করে উঠছে। পথে একবার গাড়ি থামালাম আমরা। মোশাইদ (রামদা আকৃতির একটি ধারালো ছুরি। লম্বায় প্রায় এক মিটার, আগ্রভাগ পানখ সাপের ফনার মতো প্রশস্ত) হাতে ক'জন বনচারী কৃষক এগিয়ে এলো। আমরা ওদের মধ্যে বিস্কুট, ইউগার্ট এবং পানির বোতল বিতরণ করলাম। মোশাইদের দিকে তাকিয়ে সোবহানী ভাই বললেন, 'ধারালো শিশ্ন'। এ সময়ে আমরা কিছু অর্ধনগ্ন কিশোরী মেয়েকে রাস্তা পার হয়ে দূরের ছোট্ট গ্রামটির দিকে ছুটে যেতে দেখলাম। যাবার সময়ে ইউএন লেখা শাদা গাড়িটি আর এর অদ্ভুত যাত্রীদের দিকে বিস্মিত চোখে তাকালো একবার। আমাদের ইচ্ছে হলো ওদেরকে বিস্কুট, পানি দেই কিন্তু ওদের নগ্নবক্ষের কাছাকাছি যেতে কেউই সাহসী হলো না। হঠাৎ কি মনে করে আমরা সকলেই যেন প্রায় একসাথে বলে উঠলাম, 'কাকাও, কাকাও'।

সোবহানী ভাই বললেন, নাঈম, বাবা এবার গাড়ি হাকাও। আর কতদূর সান পেদ্রো? নাঈম জানালেন, এসে গাছি প্রায়। মিনিট দশেক পর থেকেই ফুসে উঠা সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। আর ক'মিনিটের মাথায়ই আমরা সান পেদ্রো শহরের প্রবেশমুখে এসে পৌছে গেলাম। একদিকে খাড়া পাহাড় আর উল্টোদিকে সমুদ্র। এর মাঝখানে একটি মৌন শহর। অদ্ভুত প্রকৃতি। পর্বতারণ্য আর গর্জে ওঠা মহাসমুদ্রের অবধারিত সঙ্গমস্থলে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক লীলাবৈচিত্রময় এই অপূর্ব শহরটিতে প্রবেশ করে প্রথমেই একটি বিশ্রী দৃশ্য দেখতে হলো। সোবহানী ভাই অঙ্গুলি নির্দেশ করত: বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, শিশ্ন স্খলনরত কৃষ্ণগাত্রবর্ণের গর্বিত আইভরিয় যুবক। লজ্জা শরমের কোনো বালাই নেই, রাস্তার মাঝখানে একটি ম্যানহোলের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের গাড়িটির দিকে মুখ করে হিস্যু করছে এক বিশালকায় যুবক। 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন'। এই বাক্যভাবসম্প্রসারণ মনে মনে জ্ঞান করিয়া আমরা উল্টো দিকে মুখ ফিরাইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সান পেদ্রো ইয়াং পেট্রিয়টদের আখড়া, কাজেই খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। নাঈম ফরাসী ভাষায় ফ্লুয়েন্ট, ওর অনেক স্থানীয় বন্ধুও জুটে গেছে ইতোমধ্যেই। কাজেই খুব একটা অসুবিধা হবে না বলে ও জানালো। গত ছ'মাস নাঈম মুক্তাদির সান পেদ্রোতেই ছিলো, সম্প্রতি পোস্টিং পেয়েছে দালোআতে।

আইভরি কোস্টের আদিবাসীরা নানানরকম ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। কেউ মারা গেলে উঠানের মাঝখানে লাশ রেখে বাড়ির সকল পুরুষ পুরো একরাত ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে নাচে, আর মেয়েরা সে সময় বড় বড় পাত্রে রান্না করে। পরদিন লাশ মাটিতে পুতে সবাই রান্না করা খাবার খায়। কান্না-কাটির কোনো আয়োজন নেই। দু'জন পুরুষের মধ্যে সৌহার্দ্য বিনিময়ের জন্য মাথায় মাথায় তিনবার ঠোকাঠুকি করে।

এপ্রিলে একটি পুজো উৎসব হয়। শয়তান তাড়ানোর পুজো। মধ্যরাত থেকে সকল নারী এবং শিশু নগ্ন হয়ে চুপি চুপি ওদের কুটির থেকে বের হয়ে শয়তানের ঘরে জড়ো হয়। সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত ওরা এখানে অবস্থান করে। সূর্যোদয়ের ঠিক আগে আগে গোত্রপ্রধান ওখানে আবির্ভূত হলে পূজো শেষ হয়। এরপর সারাদিন ধরে চলে উৎসব। গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে সারাদিন ঢোল-বাদ্য বাজায় আর নাচ-গান করে।

কোতদিভোয়ার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এইচআইভি কেরিয়ার। এইডস মানব সভ্যতা বিকাশের জন্য এক ভয়ানক হুমকি, আইভরিয়ানদের মাথার ওপর সাক্ষাৎ যমদূত। প্রতি তিনজনে একজন কেরিয়ার, প্রতিদিন এ সংখ্যা আরো বাড়ছে। বুড়ো মানুষ দেখতে পাওয়া কোতদিভোয়ায় একটি বিরল ঘটনা। গড় আয়ু মাত্র ৪৫ বছর। ৬৫ বছরের ওপরে মানুষের সংখ্যা মাত্র শতকরা দুইজন। এইডস নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে কোতদিভোয়ার জনসংখ্যা অর্ধেকের নিচে নেমে আসবে।

আরো অসংখ্য আজগুবি আজগুবি রোগে ভরা এই পশ্চিম আফ্রিকা। একটি অসুখের নাম লাসা জ্বর। এ জ্বর হয় ইদুরে খাওয়া কোনো খাবার খেলে। লাসা জ্বর হওয়া মানে মৃত্যু অনিবার্য। শুধু তাই না, মৃত্যুর পর লাসা জ্বরাক্রান্ত মৃতকে পচিশ ফুট মাটির নিচে পুতে দিতে হয়। এই লাশ কোনো এয়ারলাইন্সও বহন করতে পারে না, এই মর্মে আইন রয়েছে। পচিশ ফুট মাটির নিচে চাপা না দিলে এই জীবাণু কবর থেকে উঠে এসে অন্যকে আক্রমণ করে।

এক ধরণের মাছি আছে, রোদে শুকোতে দেওয়া কাপড়ে ডিম পারে। রোদে শুকিয়ে কাপড় ইস্ত্রি করলেও এই ডিম মরে না এবং তা চোখেও দেখা যায় না। কাপড়ের বুননের ভেতর ঢুকে থাকে। এই কাপড় পরিধান করলে শরীরের উত্তাপে ডিমগুলি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে লোমকূপের ভেতর দিয়ে মানুষের শরীরে ঢুকে যায়। তারপর ক'দিন পর ফোড়া ওঠে, পুজ হয়, প্রচন্ড ব্যথায় চিৎকার করে মানুষ। এরপর একদিন এই পুজের ভেতর থেকে একটি পোকা বের হয়ে এসে উড়াল দেয়।

রক্তের সেকেল সেল একটি জেনেটিক অসুখ। আফ্রিকা এবং আমেরিকাতেই শুধুমাত্র এই রোগ দেখা যায়। এ রোগীর রক্তের সেলগুলো স্বাভাবিক মানুসের মতো না, শেকলের মতো পেঁচানো থাকে। সেকেল সেল রোগী সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচে। এর মধ্যে যে কোনো সময় মারা যেতে পারে। এনশাদ ভাইয়ের সহকর্মী মেয়েটি যদি অমন হঠাৎ করে মারা না যেতো তাহলে এ রোগটির কথা আমাদের অজানাই থেকে যেতো। এছাড়া ম্যালেরিয়াতো এখানে ডাল-ভাত। এমন কোনো আইভরিয়ান নেই যার জীবনে একবার ম্যালেরিয়া হয় নি। আহরহই এ রোগ হচ্ছে, শত শত লোক মারাও যাচ্ছে। আরো আছে ম্যানিনজাইটিস, ম্যানিনজাইটিস হলে হাজারে একজন বাঁচে, জানালেন আমাদের ডা. (মেজর) কালাম। এ হলো আরেক নির্মম ঘাতক রোগ। ভয়াবহ হলুদ জ্বরতো রয়েছেই। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, হলুদ জ্বর কিংবা ম্যানিনজাইটিসের প্রতিষেধক রয়েছে। টাইফয়েড এবং সব ধরণের হেপাটাইটিসেরও প্রাদূর্ভাব রয়েছে এখানে।

এতোকিছুর পরেও ফরাসী, আমেরিকানসহ নানা উন্নত দেশের হাজার হাজার মানুষ এখানে বছরের পর বছর পরে আছে কোন মধুর লোভে। আমরা না হয় তৃতীয় বিশ্বের মানুষ ডলারের হাতছানির কাছে পরাজিত। এইসব নির্মম ঘাতক রোগের কথা ভেবে, শাদা চামড়ার মানুষগুলোর কি কখনো মনে হয় না, না এবার ফিরে যাই। হয় নিশ্চয়ই, আর তখনি বুঝি পেছন থেকে অরণ্যদেবী ডেকে ওঠে,

যেয়ো না বন্ধু, এদিকে তাকাও
দেখো আমার বুক ভরা কাকাও

হোটেল সোফিয়াতে চেক-ইন করে আমরা যার যার সংক্ষিপ্ত বস্ত্র পরে সোফিয়ার প্রাইভেট বিচটিতে নেমে অন্যান্য নানান রঙের নারী-পুরুষের সাথে জলকেলি করতে শুরু করে দিলাম। হোটেল সোফিয়ার মালিক এক মরক্কান নারী ফাতিআ। আটলান্টিকের পাড়ে গড়ে তোলা এই বিশাল হোটেলটি ফাতিআ নিজেই চালায়। হোটেল সোফিয়ার রয়েছে নিজস্ব বিচ, সমুদ্র থেকে তোলা স্যালাইন জল দিয়ে সচল রাখা মিনি সমুদ্র, একটি সুইমিংপুল, বার রেস্টুরেন্টসহ সমুদ্রের দিকে মুখ করা প্রচুর খোলা স্পেস আর পরিকল্পিতভাবে রোপিত অসংখ্য ফল, ফুল ও কাঠ গাছ। গাছগুলোতে নির্ভয় পাখিরা বসে আছে। সমুদ্র থেকে উঠে আসা ঠান্ডা বাতাশ, গাছের ছায়া আর পাখির কলকাকলীতে মূখর একটি চমৎকার হোটেল লন।

উদ্ভিন্ন যৌবনা এক মরক্কান সুন্দরী ফাতিআর স্বামী এক ফ্রেন্চ বুড়ো। আমরা জাতিসংঘের চারজন অতিথি এসেছি শুনে তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলেন। ফরাসী কায়দায় দু'পাশের গালে চারবার চুমু খেয়ে সৌহার্দ্য বিনিময় শেষে ফাতিআ আমাদেরকে ড্রিংকসে আমন্ত্রণ জানালেন।

বিকেলে এক যুবক এলো নাঈমের সাথে দেখা করতে। ওরা দু'জন মাথায় মাথা ঠেকিয়ে তিনবার ঢুশ-ঢাশ করে সৌহার্দ্য বিনিময় করলো। এই যুবক সান পেদ্রো ইয়াং পেট্রিয়টের সভাপতি। খোদ ইয়াং পেট্রিয়টের সভাপতির সাথে নাঈমের এই

মাখামাখিটা আমার তেমন ভালো লাগলো না। মোশাদ, সিআইএ থেকে শুরু করে হেন কোন গোয়েন্দা সংস্থা নেই যাদের এজেন্ট নেই কোতদিভোয়ায়। যে কোনো সময় যে কোনো বিপদে পড়ে যেতে পারি আমরা।

রাতে চারজনই বারে গেলাম। এক কৃষ্ণ সুন্দরী আমাদেরকে ড্রিংকস সার্ভ করছে। আমি এবং নাঈম রেড ওয়াইন নিলাম, অন্য দু'জন ফানটা। একজন দু'জন করে বাইরে থেকে অতিথি আসছে। কালো শাদা সব রঙের। দু'জন দু'জন, জোড়ায় জোড়ায়, চারজন, ছয়জন আসছেতো আসছেই। মিউজিক বাজছে, নাচ শুরু হয়েছে। প্রথমে ঠান্ডা নাচ। ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠলো ডান্স ফ্লোর। দুই লেবানিয় জুটি ওদের শরীরের সকল বাঁক উন্মুক্ত করে তুলে ধরলো ডান্স ফ্লোরে। আমাদের ওয়াইনের বোতল শেষ হয়ে আসছে। এবার হার্ড ড্রিংকস অর্ডার করলাম, জনি ওয়াকার, ব্লাক লেভেল উইথ আইস। রাত এখন একটা, কর্নেল সোবহানি, কর্নেল এনশাদ রুমে ফিরে গেছে। নাঈমও যাই যাই করছে। ওয়েটার মেয়েটির বুকের অর্ধেকটা খোলা। ও আমাদের টেবিলে এসে বসলো। আমাদের সাথে ড্রিংক করতে চাইলো। আমরা ওর জন্যও একটা জনি ওয়াকার বললাম। উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়েছে। আলো কমে আসছে রুমের। মিউজিকের ভলিউম বাড়ছে, আরো জোরে, আরো জোরে। মিউজিক বাড়ার সাথে সাথে যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীরা যেনো উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আমার টেবিলে বসা মেয়েটি আমাকে টানতে টানতে ডান্স ফ্লোরে নিয়ে গেলো। আমার মাথা ঘুছে, আমি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি। আমি কি নাচছি, না ধীরে ধীরে ঘুমের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি? মেয়েটির বুক খোলা, মেয়েগুলির বুক খোলা, আমি কি নাচতে নাচতে ঘুমিয়ে পড়ছি, আমি কি এই মেয়েটির বুকে মাথা রেখেছি? কে একজন বলছে, সিলভু প্লে, সিলভু প্লে। ও কি আমাকে ডাকছে, আমি মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলাম, কাকাও কাকাও....

এমির গল্প

দুটো বস্তাবন্দী বেড়াল লাফিয়ে উঠে মুক্তিলাভের অভিপ্রায় জানালো। তখন বেশ বড় একটি গর্তে পড়ে প্রাডোর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলো। এখন ওরা শান্ত। ঘাপটি মেরে বসে আছে এমির এবনি কাঠের মতো মসৃণ কালো বুকের ওপর। মাত্র দুমাস আগেই ওকে রিক্রুট করেছি আমি, আমার সহকারী হিসেবে কাজ করছে মেয়েটি। আইভরিকোস্টের অন্য মেয়েদের চেয়ে ও কিছুটা আলাদা। নাকটা বেশ খাড়া, তবে ভারী। ভারী বুক এবং গুরু নিতম্ব আর দশজন আফ্রিকান নারীর মতোই। কোঁকড়ানো এবং জট পাকানো চুল । সেই চুলে হাজার হাজার ছোট ছোট বিনুনি। ওকে আলাদা করে তুলেছে ওর ঠোঁট। কিছুটা এশিয়ানদের মতো, পাতলা।

এটি কোন গল্প নয়। আমি কোন গল্প লিখছি না। আজ ১৩ জুন ২০০৫।

তুমি কি আবিদজানেই জন্মেছো?
না, ডিম্বক্রুতে।
এটা আবার কোথায়?
ঠিক মাঝখানে, বুকে। কোত্দিভোয়ার বুকে একেবারে।
এমি ওর নিজের বুকের মাঝখানটায় পয়েন্ট করে। ছোট ছোট দুটি পাহাড়ের মাঝখানে।
ইয়ামুসুক্রোর কাছাকাছি?
ঠিক ধরেছো।
আবিদজানে কখন এলে?
পাঁচ বছর বয়সে, মায়ের হাত ধরে।
আর বাবা?
অন্য মহিলাকে বিয়ে করেছিলো, মা ওকে ছেড়ে আমাকে নিয়ে আবিদজানে চলে আসে।
তোমার বাবা তাহলে দুই বিয়ে করেছে?
না, এক বিয়েই।
বললে যে অন্য মহিলাকে...
ওটাই, আমার মাকেতো বিয়ে করে নি।
ও। তোমার বাবা এখন কোথায়?

জানি না। সম্ভবত আবিদজানেই আছে।

তোমাকে দেখতে আসে না?

না। ক'জনকে দেখতে আসবে। ওরতো ৩০ জন সন্তান।

হোয়াট? বউ কজন?

একজনই, তবে গার্লফ্রেন্ড ছিলো অনেকগুলো।

তাদেরই একজনের সন্তান তুমি?

প্রথমজনের।

বাবার সঙ্গে তোমার কখনো দেখা হয়েছে?

আমার বয়স যখন দশ, তখন একবার হয়েছিলো।

তোমাকে আদর করেছে?

না। আসলে ঠিক মনে পড়ছে না।

এমি তাকায় বাইরে, যেখানে প্লাতুর পাহাড়ে একটি বড় হাঁস বসে ডিমে তা দিচ্ছে। ওটা ক্যাথিড্রাল। আবিদজানের সবচেয়ে বড় গীর্জা। অসাধারণ আর্কিটেকচার। ঝড়াহত একটি হাঁস

বাবা তোমার কোন খোঁজ নেয় নি এরপর?

না।

তোমার এতে খারাপ লাগে না?

না।

এতে কোন অসুবিধা হয় তোমাদের সমাজে? এই...মানে, এই যে তুমি, মানে তোমার বাবা মা'র বিয়ে হয়নি, অথচ তোমার জন্ম হলো...

না। এখানে এটা কোন সমস্যা না।

ধরো তোমার বিয়ে ঠিক হলো। বরপক্ষ জানলো তোমার এইরকম জন্মের কথা। তাহলে কি বিয়ে ভেঙে যাবার সুযোগ রয়েছে?

না। এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

তুমিতো খ্রীষ্টান। তোমার বাবা, মা?

মা খ্রীষ্টান। বাবার কথা জানি না।

এখানেতো ৩৫ শতাংশ মুসলমান। ওদেরওকি বিয়ে ছাড়া বাচ্চা-কাচ্চা হয়।

সম্ভবত না। ওদের ধর্মে এটা এলাউড না। তবে আইভরিকোস্টের মানুষ প্রথমে আফ্রিকান, পরে মুসলমান, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। তুমি হয়ত দেখেছো, মুসলমান মেয়েরাও বিয়ে ছাড়া সংসার করছে।

খ্রীষ্টান ধর্মে বিয়ে ছাড়া বাচ্চ-কাচ্চার বাবা মা হওয়া এলাউড?

ঠিক জানি না। তবে খ্রীষ্টানরা একবার বিয়ে করলে আর ডিভোর্স দিতে পারে না। এজন্য অনেকেই সহজে বিয়ের ঝামেলায় যেতে চায় না।

তুমিতো অর্থনীতির ছাত্রী। তোমাকে অর্থনীতি নিয়ে দু একটা প্রশ্ন করি। তোমাদের এখানে মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলার। আর শতকরা ৯৫জন দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। বাকী পাঁচ শতাংশ লোকের আয়ের অংকটা বেশ বড়। এই পাঁচ শতাংশ কারা?

বেশীরভাগই লেবানিজ। কিছু ফ্রেঞ্চও আছে। হাতে গোনা কিছু আইভরিয়ানও পেতে পারো। ওদের অনেকেরই ডুয়েল সিটিজেনশীপ। দূর্নীতিগ্রস্থ সরকারী অফিসাররাও এদের দলে। আর আছে আমাদের সো-কল্ড পলিটিশিয়ানরা। ওদের প্রায় সবারই ফ্রান্সে বাড়ি আছে।

ব্রেক থেকে পা সরিয়ে আমি ধীরে ধীরে ক্লাচ রিলিজ করে এক্সেলেটর দাবাতে শুরু করি। সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, ফোর্থ গিয়ার। গাড়ি ছুটছে প্লাতু পেরিয়ে উফু বৈগনি সেতুর দিকে। ডেশবোর্ডে তাকিয়ে দেখি ১১০।

তোমার মা কি আবার বিয়ে করেছে?

হ্যাঁ, সে ঘরে আমার তিন বোন আর এক ভাই।

ওরাতো তোমার সৎ ভাই-বোন।

ঠিক ওভাবে আমি কখনো দেখি নি, আমরা কেউ না। আমার বাবা, মানে আমার মায়ের স্বামী, তাকে নিজের বাবাই মনে করি আমি।

দেখো আমার কাছে, একজন এশিয়ান হিসাবে, এটা খুব অবাক লাগছে।

কোনটা?

এই যে বিয়ে ছাড়া বাচ্চা-কাচ্চা হচ্ছে এবং এটাকে খুব সহজভাবেই মেনে নিচ্ছে সবাই।

তাহলেতো তোমাকে আরো একটু অবাক করতে হয়।

তার মানে?

শোন। কোন মেয়ের বিয়ের আগে বাচ্চা হলে বিয়ের বাজারে তার দাম কমে না একটুও বরং আরো বেড়ে যায়।

বলো কি?

এর কারণ হলো আইভরিয়ান পুরুষেরা বিয়ের আগেই নিশ্চিত হতে চায় যে তার হবু স্ত্রীর সন্তান ধারণ ক্ষমতা আছে। সন্তান দিতে না পারলে আইভরিয়ান পুরুষ আমাকে একদিনও রাখবে না।

আমরা তখন উফু বৈগনি সেতু পেরিয়ে কুমাসির দিকে যাচ্ছি। দু'শ মিটার প্রশস্ত রাস্তায় উঠে গাড়ির গতি আবারো বাড়িয়ে দিলাম।

সলিব্রা জংশনে এসে গাড়ি থামাতে হলো। রেড লাইট। আর তখনি একদল হকার গাড়ি ঘিরে ধরলো। কারো হাতে ক্যালকুলেটর, কারো হাতে ঘড়ি, ভিসিডি, কার্পেট, টুলবক্স, খেলনা, এমনকি কারো কারো হাতে স্ট্যান্ডসহ এক-একটি টেবিল ফ্যান। দুপুরের তীব্র রোদে পুড়ছে হকারগুলি। ডেশবোর্ডে চোখ রেখে দেখি বাইরের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। একটি ছোট্ট শিশু কয়েকটি ছোট ছোট পলিথিনের প্যাকেটে পানি নিয়ে গাড়ির জানালার পাশে এসে লাফ দিচ্ছে। আমি এমির চোখের দিকে তাকাতেই ও বললো, পানি বেচে খায়। পারলে ওকে কিছু খুচরো পয়সা দিয়ে দাও। এই সিগন্যালটা বেশ বড়। প্রায় এক মিনিট। দুটি কিশোর এরি মধ্যে গাড়ির উইন্ডশীল্ডে সাবান লাগিয়ে সাফ করতে শুরু করেছে।

এই জায়গাটির নাম সলিব্রা জংশন কেন?

ওই যে দেখো। ওই বিশাল ফ্যাক্টরিটাই সলিব্রা বিয়ারের ফ্যাক্টরি। ক্যাস্টেল বিয়ারও ওরাই বানায়।

উইন্ডশীল্ডের ওপর দিয়ে ঢাউস সাইজের তিনটি সিলভার কালারের সিলিন্ডারের দিকে আঙুল তোলে এমি। ডানদিকের ফাকা জায়গাটিতে একটি সিমেন্টের ঈগল আর মাথাভাঙ্গা একটি সিংহের প্রতিকৃতি।

আমরা সলিব্রা জংশন পেরুলাম।

কিছু মনে না করলে তোমার জন্ম এবং এই সমাজব্যবস্থা নিয়ে আরো কিছু টুকটাক কথা বলতে চাই।

এমি কিছু বলছে না। চুপচাপ। ও কি মাইন্ড করলো?

আমিও নীরব। যুগল নীরবতা একটা গুমট অস্বস্তি তৈরী করেছে গাড়ির ভেতরে। এসিটা বাড়িয়ে দিলাম। এমি তাকিয়ে আছে বাইরে, জানালা দিয়ে। ওখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'ক্যাপসুড'। এই শহরের একটি অভিজাত সুপারমার্কেট। মেয়েটি হঠাৎ কথা বলে ওঠাতে আমি খানিকটা চমকে উঠি। স্টিয়ারিংয়ে আমার হাত কেঁপে ওঠে।

কি বলতে চাও, বলো।

কোন অসুবিধা হয় না? মানে সামজিক না হোক, নৈতিক?

এই যে আমি.....

হ্যাঁ। ইংরেজিতে এ ধরনের সন্তানদের একটা নাম আছে।

বাস্টার্ড।

না, মানে ওটা একটা গালিতো...

সামাজিক অসুবিধাও হয়।

তোমার হয়েছে?

হয়েছে। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন একটা ছেলেকে আমার খুব ভালো লাগে। আমরা একসময় খুব ঘনিষ্ঠ হই। আসলে আমরা একে অন্যের প্রেমে পড়ি।

এরপর ছেলের অবিভাবক তোমাকে মেনে নেয়নি।

বিষয়টা অতো সিম্পল ফর্মূলায় শেষ হয়নি।

শেষ হয়ে গেছে?

এমি তখন কেঁদে ফেলে। ওর কালো, বড় বড় চোখ দুটিতে লেগুনের নীল জলের স্রোত।

আমি আর কোন কথা বলতে পারছি না। আমরা কুমাসির খুব কাছাকাছি। আমার কম্পিউটার বিগড়েছে। ওটা ঠিক করতে দিয়েছি। সিআইটিএসের ওয়ার্কশপে। কম্পিউটার ঠিক হয়ে গেছে। ওটা আনতে যাচ্ছি। কম্পিউটার নষ্ট হলে ঠিক হয়ে যায়। সবকিছু ঠিক হয় না। এমির কান্না থেমেছে। ও হাত ইশারায় আমাকে বাঁ-দিকের গলিতে ঢুকতে বলে। আমি গাড়ি ঘোরাই।

ছেলেটির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কতখানি গভীর হয়েছিল?

প্রশ্নটি আমি খুব ভয়ে ভয়ে করি ওকে।

আমরা আবিদজানের বাইরেও গিয়েছি।

কোথায়?

প্রথমে ইয়ামুসুক্রো। ওখানেই রাত কাটাই। হোটেলে। এরপর যাই ডিম্বক্রু।

তোমার জন্মস্থান?

হ্যাঁ। তখনি জানতে পারি।

কি?

লামিন।

ওই ছেলেটি?

আমার ভাই।

কুমাসির সিকিউরিটি গার্ড ওর উত্তল মিরর দিয়ে গাড়ির তলা চেক করছে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

ইর্গালেমের ইরিত্রিয়া

ইরিত্রিয়ান তরুণী ইর্গালেমের সঙ্গে ইসায়াস স্কয়ারে বসে যখন চীনাবাদাম খাচ্ছিলো ইয়েশি তখনই হয়ত ঘটনাটা ঘটে। একটা ছোটখাটো জটলা ছিল। তবে ওটা কোন পলিটিক্যাল মিটিং ছিল না। আসমারায় পলিটিক্যাল ক্রাউড নেই। ক'জন টাইগ্রিনিয়ান তরুণকে কিছু একটা শলা-পরামর্শ করতে দেখেছে ইয়েশি। ওর পেছনে, প্রায় ওর ঘাড়ের ওপর এসে উঠেছিল একজন, ঘোড়ামুখোটা। ও-ই কি কাজটা সারলো? ইর্গালেমকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?

ইর্গালেম ওর শাহাদাত আঙুল উঁচিয়ে, বাতাশে বাউলি কেটে বললো, ইম্পসিবল। আসমারায় কোন চোর নেই। নিশ্চয়ই ওটা তোমার পকেট থেকে পড়ে গেছে। ইয়েশির মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ওয়ালেটে শ'পাচেক ডলার ছিল আর হাজারখানেক নাকফা। এক হাজার নাকফাও একেবারে কমতো না, প্রায় ৭০ ডলার। তারচেয়েও বড় কথা ওর ক্রেডিট কার্ডটা ছিল ওয়ালেটে। ইউএন আইডিটা না হয় আবার করে নেওয়া যাবে। ইয়েশি ধরেই নিয়েছে ওগুলো আর পাওয়া যাবে না, কাজেই ওগুলোর রিপ্লেসমেন্ট কিভাবে দ্রুত করে ফেলা যায় সেটা নিয়ে ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ। তখনি আইডিয়াটা ওর মাথায় আসে। পুলিশে খবর দিলে কেমন হয়?

ডানিয়েল এফ্রেম ওকে তিন-চারটি প্রশ্ন করে থানার নোটবুকে টুকে নিল। তারপর বললো, স্পটে চলো। ইর্গালেমকে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে। ইরিত্রিয়ান মেয়েরা বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে ঘুরে বেড়ায় ঠিকই তবে বেশ রয়ে-সয়ে। সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকা কোন বাবা-মাই পছন্দ করেন না। ইর্গা চলে গেলে ইয়েশির নিজেকে বেশ অসহায় লাগে। এই শহরে ওর বয়স মাত্র দু'মাস। থিম্ফু থেকে উড়াল দেবার সময় যে অনিশ্চয়তাটা ওকে চেপে ধরেছিল, ঠিক সেই রকম লাগছে এখন। ইসায়াস স্কয়ারে কয়েকটি ফ্লোরোসেন্ট বাতি জ্বলছে। ফাকা স্কয়ারের ওপর গাড়ি থামায় ডানিয়েল। পেছনে

ইয়েশির ইউএন জিপ। পুলিশটি আবার টাকা-পয়সা চাইবে না-তো? পাথরের ওপর, ঠিক যেখানটাতে বসেছিল ওরা, পথ দেখিয়ে ডানিয়েলকে নিয়ে যায় ইয়েশি। স্কয়ারের কালো ইটের ওপর, পাথরটার পেছনে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ডানিয়েল ওটা তুলে একটা হাসি দিয়ে ইয়েশির হাতে তুলে দেয়। এটাইতো তোমার? ইয়েশি কোন কথা বলতে পারে না। এ-ও কি সম্ভব?

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে আমার চোখের দিকে তাকায় ইর্গালেম। হ্যাঁ সম্ভব। আমরা ইটালিয়ানদের কাছ থেকে সততা শিখেছি। আমি মনে করি আফ্রিকার সবচেয়ে সভ্য জাতি ইরিত্রিয়ান-ইথিওপিয়ান। তুমি সারা আসমারা শহর ঘুরে দেখতে পারো। কোনো বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ড খুঁজে পাবে না। আমাদের দরকার হয় না। আমার ধারণা আসমারায় এ জাতীয় কোনো কম্পানিও নেই। তুমি দরোজায় তালা না লাগিয়ে অফিসে চলে যেতে পারো, কেউ কিচ্ছু ছোঁবে না। আমি অবাক হই ওর কথা শুনে। এতো সৎ তোমরা, তাহলে এতো দারিদ্র কেন? মাথাপিছু আয়তো মাত্র সাড়ে সাত'শ ডলার। দেখি ও খোঁচাটা কিভাবে নেয়। এটা মিডিয়ার প্রপাগান্ডা। শোন, আমাদের সাড়ে ৪ মিলিয়ন লোক সবাই খেতে পরতে পায়। সম্পদের বৈষম্য খুব কম। তুমি চিন্তা করতে পারো, যে দেশের মাথাপিছু আয় মাত্র সাড়ে সাত'শ ডলার সে দেশের মাত্র ১৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে? তাকিয়ে দেখো এশিয়া-আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোর দিকে।

সত্যিই অবাক হই ইর্গার কথা শুনে। বাংলাদেশের চেয়ে সামান্য একটু ছোট দেশ ইরিত্রিয়া। ১২১,৩২০ বর্গকিলোমিটারের পুরোটাই শুস্ক ভুমি। পূর্বদিকে লোহিত সাগরের সাথে ২২৩৪ কিলোমিটারের বিশাল জলসীমান্ত পাওয়ার আনন্দই ইরিত্রিয়ানদের আভ্যন্তরীন পানিশূন্যতার কষ্ট দূর করে দিয়েছে। তারপরেও প্রায়শই খরার করাল গ্রাসে পড়ে ইরিত্রিয়া নতুন করে অনুভব করে নদ-নদীহীন এক শুস্ক ভূ-খন্ডের কষ্টের আর্তি। ১৮৮৫ সালে ইতালি ইরিত্রিয়া দখল করার আগে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি গ্রুপ ইরিত্রিয়ার একেকটি অঞ্চল শাসন করতো। ইতালিয়ানরা মূলত লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসে ইরিত্রিয়ায় জড় হতো এবং নতুন উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় করতো ইথিওপিয়া আক্রমণের জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাজিত ইতালি ইরিত্রিয়ার শাসনভার ব্রিটিশদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের এক রেজুলেশনের মাধ্যমে ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়া একিভূত হয়। এই রেজুলেশনে ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতার দাবীকে উপেক্ষা করা হলেও অটোনোমাস স্ট্যাটাসের কথা স্বীকার করা হয়। ১৯৬২ সালে ইথিওপিয়ার সম্রাট হেইল সেলাসি ইরিত্রিয়ার সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ইরিত্রিয়ার নাম-গন্ধ ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চান। আর তখনি জ্বলে ওঠে আগুন। চাপা পড়ে থাকা স্বাধীনতার দাবীতে মুখিয়ে ওঠে ইরিত্রিয়ানরা। দীর্ঘ সংগ্রাম, ইথিওপিয়ান রাজনীতির চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে অবশেষে ১৯৯৩ সালে ইরিত্রিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

এখন তোমাদের ক্রাইসিসটা কি নিয়ে?
মেয়েটা আবার ঝাঝিয়ে উঠবে নাতো?
তুমিতো ভালো করেই জানো, দুই দেশের বর্ডার ইস্যুটা এখনো সেটেল হয়নি। ইথিওপিয়ার সাথে আমাদের যে ৯১২ কিলোমিটার স্ট্রেইট লাইন বর্ডার আছে সেটা নিয়ে এখন আবার নতুন করে কন্ট্রোভার্সি তৈরী হয়েছে। ইথিওপিয়া বড় দেশ, শাদা চামড়াদের ব্যাবসা-বাণিজ্য ওদের সাথেই বেশী। কাজেই জাতিসংঘ বলো আর যে কোন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিই বলো, ওদের স্বার্থটাই বেশি দেখে। ২৫ কিলোমিটার প্রশস্ত এই দীর্ঘ বর্ডারে রয়েছে অগণিত ল্যান্ড মাইন। এগুলো ডিমাইনিংয়ের কাজ চলছে। ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়া বাউন্ডারি কমিশন (ইইবিসি) সিদ্ধান্ত নেয় ডাবল লাইন বর্ডার হবে। ২৫ কিলোমিটারের এপারে এবং ওপারে। ইইবিসির তত্বাবধানে এবং জাতিসংঘের অর্থে কাঁটাতার উঠবে দু'পাশেই। কিন্তু গতবছর হঠাৎ করেই ইথিওপিয়া মোচড় দেয়। ওরা বলে কাঁটাতার উঠবে শুধু ইরিত্রিয়ার অংশে, ইথিওপিয়ার অংশে নয়। ইইবিসি সেটা সুরসুর করে মেনে নেয়। আমাদের সরকার তখন ক্ষেপে যায়।
সেজন্যই বুঝি গতবছর জাতিসংঘের সব হোয়াইট পিপলদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইরিত্রিয়া ছাড়ার নোটিশ দেয় তোমাদের সরকার? এটা কি রেসিজমের পর্যায়ে পড়ে না?
এ বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই না।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিতে দিতে বলে ইর্গালেম গেব্রেসেলাসি, ইরিত্রিয়া একটি সুন্দর দেশ। চির শান্তির দেশ। এরপর ও একটি হাসি দেয়। সেই স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত হয় এক অনিন্দ্য সুন্দর মাতৃভূমির ছবি।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

মানসুর জাহির কায়রো সফর

মানসুর জাহির মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। গাল বসে গেছে, চোখ কোটরাগত, মাথার চুল সব পেকে শাদা। একমাসে একজন মানুষের এতো পরিবর্তন কি করে হয়? এইডস নাতো? আমি আসলে খানিকটা ফান করে ওকে হাসাতে চাইলাম। কিন্তু ও এতে ক্ষেপে গেল। তুমিওতো দেখি আমাদের জর্দানিয়ান হাতুড়ে ডাক্তারের মতোই কথা বলছো। সে রোজ আমার শরীর থেকে রক্ত নেয়। আজ এইডস, কাল ম্যালেরিরা, পরশু টাইফয়েড এইসব পরীক্ষা করে করে আমাকে প্রায় মেরে ফেলছিল।

দুপুরের তীব্র রোদের ওপর দিয়ে লু হাওয়া ভেসে আসছে। প্রগৈতিহাসিক পিরামিডের নিচে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে হাসান, হোসেন। মানসুরের দুই কিশোর পুত্র। ওরা যতোটা না বিস্মিত পিরামিড দেখে তার চেয়ে বেশি বিস্মিত কায়রো আসতে পেরে। হাসান-হোসেন ভাবতেই পারে নি, এই সামারেই ওদের স্বপ্ন পূরণ হবে। স্বামীর এই ঔদার্হ্যে রিম নিজেও মানসুরের প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞ। মানসুরের চোখে কি বালুর কণা ঢুকলো? ও এমন করছে কেন? হাসান চিৎকার করে ওঠে, বাবা পড়ে গেল। আর তখনি পিরামিডের শরীর থেকে হাত সরায় ছোট ছেলে হোসেন। দু'জনে দৌড়ে ছুটে আসে। মানসুর ততক্ষণে উষ্ণ বালুর ওপর শুয়ে পড়েছে। মাথার ওপর দুপুরের কড়া রোদ। পড়তে পড়তেই সে চিৎকার করে উঠলো, ডাক্তার, হাসপাতাল, বাঁচাও।

মিশরের ডাক্তার জানালো তেমন কিছু না। একটু জ্বর হয়েছে। মানসুর এতে খুশি। ও স্ত্রীকে বলে, তোমরা যাও, ঘোরাঘুরি করো। আমি বরং হোটেলে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিই। ইতস্তত করছিল বটে তবে রিম আল-জাহি শেষ পর্যন্ত দুই পুত্রের অন্তহীন আগ্রহের কাছে হার মানলো। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কিছুতেই ওর মন টিকছে না। আর তাছাড়া শহরটাওতো খুব একটা নিরাপদ না। সুযোগ পেলেই ইজিপশিয়ান বেশ্যাগুলি হোটেলে ঢুকে পড়বে। পুরুষদের বিশ্বাস কি? রিম একটা বুদ্ধি খুঁজছে, কি করে হাসান-হোসেনকে ম্যানেজ করে হোটেলে ফিরে যাওয়া যায়।

এই তাহলে তোমার ছুটির গল্প? কপাল কুঁচকে মানসুর বললো, গল্প এখনো শেষ হয় নি স্যার। দেখোতো আমার বয়স ৫৯ বছর। এখনো আমার বউ আমাকে সন্দেহ করে। কিন্তু এই সন্দেহটাই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। ঠিক ওই সময় ও হোটেলে ফিরে না এলে আমি হয়ত মরে তক্তা হয়ে থাকতাম। জ্বর উঠে গিয়েছিল ১০৫-এ। বউ সন্দেহ করাটা ভালো, কি বলো? আমি বলি অন্য কথা, তোমার অসুখটা কি?

ইবিভি।

ইপস্ট্যন-বার ভাইরাস?

এক্সাক্টলি।

এটা এমন কোন অসুখ না। ৯৫ শতাংশ আমেরিকানের এই অসুখটা হয়। সাধারণ জ্বর সারতে এক সপ্তাহ লাগে। ইবিভি নেয় এক মাস। এর বেশি কিছু না। আমিতো অন্য কথা ভাবছি।

মানসুর তখন কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকায়। ভার্টিকেল ব্লাইন্ডের বাইরে তখন মেঘেদের লুকোচুরি খেলা। সকালের সূর্য ঢাকা পড়েছে একখন্ড কালো মেঘের নিচে, দূরের লেগুনে তারই ছায়া পড়েছে। পানিতে একটা সবুজ রঙ তৈরী হয়েছে।

পিরামিডের ভেতরে হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকা কোনো বিদেহী আত্মা জেগে উঠলো না-তো? জানোতো ফারাওদের একজনের নাম ছিল মানসুর। মমিটা পিরামিডেই আছে। সেই মানসুরের আত্মা হয়ত তোমার ওপর ভর করতে চাইছিল।

মানসুরের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। সত্যিই নাকি? মানসুর নামের মমি আছে ওখানে? দেখি ও খুব সিরিয়াস হয়ে উঠছে। আমি বললাম, না, এমনিই ফান করছিলাম। মাকিয়াতুর কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আমি উঠে পড়ি।

সাতদিন পর। লেগুনের ওপারে সূর্যটা তখন কচ্ছপের ডিমের মতো গোল। সন্ধ্যা হয় হয়। দিনের শেষ রোদের লালচে আভায় লেগুনের পানিতে রক্তের বন্যা। আমি বাড়ি ফিরছি। অফিস থেকে বেরিয়ে একটা সার্কেল করে যখন পাহাড়ের

ওপরে, আমাদের অফিস থেকে, গড়াতে গড়াতে প্রাডো জিপটি নেমে এসেছে ক্যাম্পাসের প্রধান এন্ট্রান্সের কাছে তখনি মনে পড়লো মানসুরের কথা। ও ফোনে বলেছিল, আজ আমার সাথে কথা বলতে চায়। আমি গাড়ি ঘোরালাম। মানসুরের অফিস আমার অফিসের উল্টোদিকে, তিনতলায়। রুমের দরোজায় নক করে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আমি ভেতরে ঢুকে পড়ি। কিন্তু কোথায় মানসুর? ওর কম্পিউটার খোলা। স্ক্রিনে ভাসছে একটি মমির ছবি। টেবিলে ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য কাগজ। মমিদের ওপর সব লেখালেখি ওগুলোতে। রুম খোলা, কম্পিউটার খোলা, ও নিশ্চয়ই আশে-পাশে কোথাও আছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। সূর্য ডুবে গেছে। তখনো আকাশ পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। হারমাটানের মতো আবছা অন্ধকার। দূরে, পাহাড়ের শেষ প্রান্তে, যেখানে মাছের লেজের মতো একটা ভি তৈরী হয়েছে, ওখানে আবছা একটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। মুখ দেখার কোনো জো নেই। ওটাই কি মানসুর? আমি সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে থাকি। পাহাড়ি শিমুলটা পেরিয়ে ছনের ঘরগুলোর কাছে আসতেই বুঝতে পারি ওটা মানসুর। আমি কাছে এগিয়ে যাই। লেগুনের পানির দিকে মুখ করে ও কি সব বলছে। অদ্ভুত এক ভাষা। আমি নিশ্চিত এটা আরবি ভাষা নয়। জর্দানে কি আর অন্য কোনো নেটিভ ভাষা আছে? ওর শরীর কাঁপছে। এতো জোরে কাঁপছে যে চার/পাঁচ গজ দূর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পাহাড়ি শিমুলের ডাল থেকে নিশাচর বাদুড়েরা বেরিয়ে এসেছে। তিনটা বাদুড় মানসুরের মাথার ওপর প্রদক্ষিণ করছে। ও আরো জোরে জোরে কি সব বলছে। ওর শরীরের কাঁপুনি আরো বেড়ে গেছে। ওকে ধরে ফেলা উচিত। এক্ষুণি হয়ত পড়ে যাবে। আমি ওর কাছে এগিয়ে যাই। হাত ধরি। কপালে হাত রাখি। পিতার মতো একজন মানুষ। আমাকে সবসময় সঙ্গ দেয়। মন খারাপ হলে ভালো ভালো কথা বলে। মজার মজার জোকস বলে মন ভালো করে দেবার চেষ্টা করে।

কি আশ্চর্য! ওর গায়েতো জ্বর নেই। শরীর বরফের মতো ঠান্ডা। তারলে কি ওর প্রেসার পড়ে যাচ্ছে ? মানসুর কি মরে যাচ্ছে ? ও এখনো চিৎকার করে সেই অচেনা ভাষায় বক্তৃতা করছে। নীল লেগুনের সমস্ত পানি যেন ওর শ্রোতা, পাহাড়ের নিচের সমস্ত বৃক্ষ-তৃণ-লতা ওর শ্রোতা। ও অনর্গল বক্তৃতা করে যাচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে যাই। আমার সমস্ত শরীর কুলকুল করে ঘামতে থাকে। এক পা দু'পা করে পেছনে সরে আসি। আর হঠাৎ আমার কি হয়, আমি ওর সেই অদ্ভুত ভাষার কথাগুলো সব বুঝতে শুরু করি। মানসুরের মুখ নড়ছে। বাক্য শেষ করে নতুন বাক্য শুরু করার জন্য ও দম নিচ্ছে। ওর বুক উঠা-নামা করছে। ওর মুখটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ওর দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। ওর মুখ থেকে মাংস খসে পড়েছে। শুধু একটা করোটি দাঁড়িয়ে আছে। ওর শরীর থেকে মাংস খসে পড়েছে। শুধু একটা স্কেলিটন দাঁড়িয়ে আছে। আমি কি কাল রাতের সেই মুভিটা দেখছি? স্টিফেন সোমার্সের মামি রিটার্নস ?

ও বলছে, পৃথিবীটা এমন ছিল না। তোমরা পৃথিবীর বাতাস দূষিত করেছো। পৃথিবীর পানি বিষাক্ত করেছো। এই প্রজন্মের মানুষ স্বার্থপর। নিজেদের স্বার্থে পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে.....

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

আবিদজানের বাতাশে বিষ, সরকারের পদত্যাগ

রাত তখন দেড়টা। টেলিফোন বাজছে। এত রাতে কে ফোন করলো? মাঝরাতের টেলিফোন মানেই দুঃসংবাদ। আমার বড় খালু যেদিন মারা যায় সেদিনও মাঝরাতে টেলিফোন এসেছিল। ওপাশ থেকে অ্যাডামের শীতল কণ্ঠ ভেসে এলো। অ্যাডাম আলবাগির আমার সহকর্মী। সিভিল অ্যাফেয়ার্স অফিসার। অমায়িক মানুষ। বাড়ি নাইজেরিয়া। ও বললো, এতো রাতে তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। শোন, অবস্থা বেশি ভালো না। যে কোন সময় ইভাকুয়েশনও হতে পারে। তোমার যেহেতু ছোট ছোট বাচ্চা আছে তাই খবরটা তোমাকে এখনই দেয়া প্রয়োজন মনে করলাম। মারামারি লেগেছে? ও বললো, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। আবিদজানের বাতাশে এখন বিষ ভেসে বেড়াচ্ছে। কারা যেন আবিদজানের ছয়টি স্পটে বিষাক্ত টক্সিড ডাম্প করেছে। একটা মহামারি লেগে যাবে। বাচ্চাদের বাইরে যেতে দিও না। আর সবসময় রেডিও অন করে রেখো। রেডিও মানে হলো আমাদের ওয়াকি-টকি। অনুসির সিকিউরিটি সেকশন যে কোন বিপদ-আপদের খবর এই রেডিওর মাধ্যমে আমাদেরকে আগাম জানিয়ে দেয়। আমি বললাম, টক্সিড কি? ও বললো, আমিও জানিনা। তবে যা

বুঝতে পারছি, টক্সিড হলো বিষাক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল বর্জ্য। বাতাশে বা পানিতে কন্টামিনেশন হলে জনজীবনের জন্য তা এক ভয়াবহ হুমকি। এরি মধ্যে নাকি হাজার তিনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছে আর তিনজন মারা গেছে। বল কি?

পরদিন সকালে আমাদের আর অফিসে যেতে হলো না। রেডিওতে ঘোষণা করা হলো পরবর্তি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা যেন বাসা থেকে না বের হই। আর সমবময় যেন ঘরের দরোজা-জানালা বন্ধ করে এসি চালিয়ে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকি। আমার বাসায় তিনটা বেডরুম। একটা রুমের এসি নষ্ট। লিভিং রুমে কোন এসি নেই। এটাই আবিদজানের কালচার। ওরা লিভিং রুমে এসি লাগায় না। সুতরাং আমাদের চারজনের পৃথিবী এখন ছোট ছোট দুটি শোবার ঘর। কানের কাছে রেডিও লাগিয়ে বসে আছি। যেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনছি। যে কোন সময় ইয়াহিয়া খানের আত্মসমর্পনের খবর শুনে লাফিয়ে উঠবো। তেমন কোন সুসংবাদ এলো না। কোন বিপদ যদি দীর্ঘসময় ধরে অবস্থান করে তাহলে সেটার ভয়াবহতা আস্তে আস্তে কমে আসে। ক্যানসার আক্রান্ত মানুষ প্রথমদিন যখন শোনে তার ক্যানসার হয়েছে তখনি সে অর্ধেক মরে যায়। কিছুদিন পরে এই ভয়াবহ রোগ শরীরে ধারণ করে সে তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম শুরু করে। বিকেলের দিকে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম এবং সন্ধ্যার পরে আবার প্রায় আগের মতোই লিভিংরুমে বসে টিভি দেখতে শুরু করলাম। আমার স্ত্রী মুক্তি বললো, ঢাকার বাতাশে যে পরিমান সীসা ভেসে বেড়ায়, সেই বাতাশে নিঃশ্বাস নিয়ে যখন বেঁচে আছি, তখন এই টক্সিড আমাদের কিছুই করতে পারবে না। মরার আগে মরে কোন লাভ নেই। আমরা মরার আগে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম।

৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬। আজ সকালে অফিসে এসে শুনি টক্সিড ইস্যুকে কেন্দ্র করে আইভরিয়ান সরকার গতকাল পদত্যাগ করেছে। সরকারের নির্বাহী প্রধান প্রধানমন্ত্রী শার্লস কোনান বেনি ৩০ মন্ত্রীর পক্ষে পদত্যাগপত্র পেশ করেন প্রেসিডেন্ট লরেন্ট বাগবোর কাছে। এই বিষয়ে আরো খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলাম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, আবিদজানের ৭টি স্পটে তৈল শোধনাগারের ৫২৮ কিউবিক মিটার বিষাক্ত বর্জ্য ডাম্প করেছে প্রোবো কোয়ালা নমক একটি জাহাজ। ডাম্প করেছে আগস্ট মাসের ১৯/২০ তারিখে। এই জাহাজটি চার্টার করেছে নেদারল্যান্ডসে নিবন্ধিত একটি কম্পানি। কম্পানিটি সরকারের অনুমতি নিয়েই এই বর্জ্য ডাম্প করেছে। এটাই হলো সরকারের বড় ব্যর্থতা। ব্যর্থতার দায় মাথা পেতে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেনি। পদত্যাগ করেছেন নির্দ্বিধায়। আশ্চর্য ব্যাপার। আমার মনে আছে, লঞ্চডুবিতে যখন শত শত লোক মারা যাচ্ছিলো তখন এক সাংবাদিক আমাদের সাবেক নৌ-পরিবহন মন্ত্রী মরহুম আকবর হোসেনকে জিজ্ঞেস করেছিলান, আপনি কি পদত্যাগ করবেন? তিনি ঝাঝিয়ে উঠে বলেছিলেন, আমি পদত্যাগ করলে সমস্যার সমাধার করবে কে? কি কনফিডেন্স! আইভরিয়ান সরকারের এই কনফিডেন্স নেই। আইভরিয়ান পরিবেশ মন্ত্রী বলেছেন, টক্সিড ম্যানেজমেন্ট নো-হাউ আমাদের নেই। বিদেশ থেকে এক্সপার্ট আনা হয়েছে, ওরা বলতে পারবে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায়। অবাক হয়ে যাই এ দেশের মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা দেখে। মানুষের জীবন নিয়ে ওরা খেলে না। চেয়ার আঁকড়ে পড়ে থাকে না। চেয়ারের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি এটা আকবর হোসেন গংরা না বুঝলেও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মন্ত্রীরা এখনো বোঝেন।

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৬
আবিদজান, আইভরিকোস্ট

এক আইভরিয়ান মেয়ের রক্তদান

সঙ্গত কারণেই আমি মেয়েটির নাম উল্লেখ করছি না। উচ্ছল এক তরুণী। আমাদের স্থানীয় সহকর্মী। বয়স একুশ/বাইশ বছর। টিপিক্যাল আইভরিয়ানদের চেয়ে ও খানিকটা খাটো, গায়ের রঙও ততোটা কালো নয়। সিঁড়িতে দেখা হলো, আমি যখন ক্যাফেটারিয়ায় যাচ্ছি এককাপ ধুমায়িত কফির সন্ধ্যানে। ওর মুখে সকালের ঝলমলে রোদ। মাথার শত বিনুনি দুলিয়ে বললো, ব্লাড ডোনেট করতে যাচ্ছি।

'স্বেচ্ছাসেবক হোন, রক্ত দিন, জীবন বাঁচান' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আইভরিকোস্টের ইউনাইডেড নেশনস ভলানটিয়ার (ইউএনভি) প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীর মতো একটি মহৎ এবং অতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। আজ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৬। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচী। কর্মসূচীটিকে প্রয়োজনীয় বলছি এজন্য যে, মিশনের প্রকিউরমেন্ট কমিটির একজন মেম্বার হবার সুবাদে আমি জানি এই দেশে কর্মরত জাতিসংঘের

দেশি-বিদেশি কর্মচারি-কর্মকর্তাদের জীবন বাঁচাতে রক্তের কতো প্রয়োজন। দু'সপ্তাহ আগে প্রকিউরমেন্ট কমিটির এক মিটিংয়ে আমাদের চিফ মেডিকেল অফিসার, ডাক্তার মইসকে দেখেছি এক প্রাণান্তকর যুক্তিযুদ্ধে নেমেছেন কমিটিকে কনভিন্স করতে, কেন রক্ত কেনার ব্যাপারে সম্পুর্ণ প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়াটি মানা সম্ভব হয়নি। তোতাপাখির শেখানো বুলির মতো আমাদের বিজ্ঞ সদস্যরা কেবল মন্তব্য করে যাচ্ছেন, পুরো নিয়ম মানা হয়নি, কাজেই এটা পাশ করা যাবে না। একমাত্র আমিই বলেছিলাম, রক্ত কেনার ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দেওয়া যেতে পারে। আমি সবসময় একটা কথা বিশ্বাস করি, মানুষের জন্য আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। আমি জানি আমার এই মন্তব্য কোট করা হবে। এবং এজন্য আমি বিপদেও পড়তে পারি। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য যদি বিপদে পড়তে হয়, সেই বিপদে আমি স্বানন্দেই পড়তে চাই।

সকালের রোদটা যখন এসি রুমের ভার্টিকেল ব্লাইন্ডের ফাঁক দিয়ে এসে গালের ওপর আছড়ে পড়ে, তখন আমার কাছে আলো-ছায়ার এই খেলাটি বড় অদ্ভুত লাগে। ক্যাফেটারিয়ার বিশাল জায়েন্ট সাইজের কাচের উইন্ডোগুলোতে লাগানো ভার্টিকেল ব্লাইন্ডগুলো এজন্যই আমার খুব পছন্দ। এসপ্রেসোর ছোট্ট শাদা কাপটি হাতে নিয়ে যখন দ্বিধার দোলায় দুলছিলাম, রক্ত দিতে যাবো কি যাবো না, তখন ক্যাফেটারিয়ায় এসে ঢুকলেন প্যাট্রেসিয়া ভিকা, ইউএনভি প্রোগ্রাম ম্যানেজার। মরিশাসের এই মহিলা তেমন ভালো ইংরেজী বলে না কিন্তু ওর মনটি দ্বীপদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সমুদ্রের হাওয়ার মতোই খোলা। দেখা হলেই ইংরেজী ফ্রেন্চ মিলিয়ে এক অদ্ভুত ভাষায় অভিবাদন জানাবে, কুশল জিজ্ঞেস করবে। আজ ওর কণ্ঠে কিছুটা অভিমান, কী ব্যাপার, তুমি যে এখনো এলে না? সুঁই দেখলেই যে আমার মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা হয় একথা আমি ওকে কিভাবে বোঝাই?

আজ আমার গাড়ি নেই। কাজেই লাঞ্চেও যাওয়া হয়নি। বিকেলে একটু আগে-ভাগেই বেরিয়ে পড়লাম। দেখি কাউকে পাওয়া যায় কি-না লিফটের জন্য। বরাবরের মতো সামনের গেইট দিয়ে না বেরিয়ে সেব্রোকোর পেছনের গেইট দিয়ে, যেখানে একটা মস্ত বড় পাহাড়ি শিমুল ছাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে, ওখান দিয়ে বেরুলাম। শিমুলতলায় কি কেউ কাঁদছে? দুই হাঁটুর নিচে মাথা গুঁজে কে যেন বসে আছে। আমার কি এগিয়ে যাওয়া উচিত? আমি এগিয়ে যাই। ওমা এতো সেই মেয়ে, সকালে যে উদ্ভাসিত হাসিতে ঝলমলে রোদ খেলিয়ে রক্ত দিতে গেল। আমি ওর নাম ধরে ডাকলাম। ও মাথা তুললো, ঘাড় ঘোরালো। তাকালো আমার দিকে। মেয়েটির দু'চোখ ঝাপসা। সেই ঝাপসা চোখে ও কি আমাকে চিনতে পারছে? বললাম, চিনতে পারছো, আমি কাজী। ও তখন প্রায় শব্দ করে কাঁদতে শুরু করলো। ও-ওকি আমার মতো সুঁই দেখে ভয় পেয়ে গেল নাকি? কিন্তু সে-তো কোন সকালের কথা। জিজ্ঞেস করলাম, রক্ত দিয়ে ভয় পেলে নাকি? মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। বললো, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে? ওকে খুব অসহায় লাগছে। এইরকম পরিস্থিতিতে কাউকে 'না' বলা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু আমি নিজেই আজ খোঁড়া মানুষ, গাড়ি নেই। ওকে পৌঁছে দিই কি করে? বললাম, চলো।

একটা রেড ট্যাক্সি নিলাম। এই শহরে দুই ধরণের ট্যাক্সি আছে। লাল আর হলুদ। হলুদ ট্যাক্সিগুলো বাসের মতো। একজন একজন করে যাত্রী তোলে, তারপর সবাইকে বাড়ি বাড়ি পৌছে দেয়। লাল ট্যাক্সিগুলো প্রাইভেট, রিজার্ভ খেপ মারে। লাল ট্যাক্সিতে বসে মেয়েটি বললো, ওরা আমার রক্ত নেয়নি? আমি বললাম, কেন হিমোগ্লোবিন কম? এতে মন খারাপের কি আছে। তুমি বেশী করে কলিজা খাবে। হিমোগ্লোবিন বেড়ে যাবে। মেয়েদের রক্তে হিমোগ্লোবিন একটু কমই থাকে। ও বললো, না, আমার রক্তে এইচআইভি আছে। আমি আঁতকে উঠলাম। তবে আমার চমকানোটা ওকে বুঝতে দিলাম না। একটা শুকনো হাসি দিয়ে বললাম, এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এইচআইভি বহন করলেই মানুষ মরে যায় না। তোমারতো আর এইডস হয়নি? ও কোন কথা বলছে না। বুঝলাম, আমার এই যুক্তিতে ও তেমন খুশী হয়নি।

যে দেশের ছেচল্লিশ শতাংশ মানুষের রক্তে এইচআইভি সে দেশে এটা কী খুব অস্বাভাবিক কোন ঘটনা? ব্লাড স্ক্রিনিং করতে গিয়ে এমন দু'চারটা কেস যে পাওয়া যাবে এটাতো প্রায় অবধারিত। ওকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছি, জীবনের সব অবধারিত ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। যেমন মৃত্যু। মানুষের জীবনে মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্যি আর কি আছে। সবচেয়ে অবধারিত সত্যের নাম হলো মৃত্যু। আমরা কি সারা জীবন এই সত্যের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে প্রানান্তকর চেষ্টা করছি না?

আমার কেবলই মনে হচ্ছে এই রক্তদান কর্মসূচীটি না আয়োজন করলেই ভালো হতো।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

গজমোতির দেশে

পরিস্কার আকাশ। তিনদিন অবিরাম বর্ষণের পর ঝকঝকে রোদ উঠেছে। বৃষ্টিধোয়া সকালের রোদ খুব তীব্র হয়। তীব্র রোদে পুড়ছে এখন আবিদজান শহর।

এবারের ইয়ামুসুক্রো ভ্রমণটা নানান কারণে আমার জন্য ছিল খুবই ব্যতিক্রম এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের নিরস্ত্রিকরণ ও পূনঃআত্মিকরণ প্রক্রিয়ার সংগে জড়িত প্রথম সামরিক ব্যাটেলিয়ন হিসাবে দায়িত্বগ্রহন করে বাংলাদেশ মিলিটারির ব্যানব্যাট-৪ গতবছর আগস্ট মাসে, যার কমান্ডার কর্ণেল হুমায়ুন বখত। ব্যানব্যাট-৪-এর একবছর ইতোমধ্যেই পার হয়ে গেছে। ওরা এখন দেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত। নতুন একটি ব্যাটেলিয়ন বাংলাদেশ থেকে আসছে আগামী ৬ অক্টোবর। নতুন ব্যাটেলিয়নটি ব্যানব্যাট-৪-এর স্থলাভিষিক্ত হবে।

ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে ব্যানব্যাট-৪ ইয়ামুসুক্রোর এলিট শ্রেণীর মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, ওদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট গলফ ক্লাবটি মেরামত করে দেয় এবং 'পিস-কাপ টুর্ণামেন্ট' শিরোনামের একটি প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। প্রতিযোগীতাটি অনুষ্ঠিত হবে আজ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬। কর্ণেল হুমায়ুন অনেকদিন আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন এই দিনটি যেন ফ্রি রাখি। গতকাল কয়েক দফা কথা হয়। শেষমেষ ঠিক হয় আমরা ৩০ তারিখ সকালে ইয়ামুসুক্রোর উদ্দেশে রওয়ানা হব। অগ্নি খুব-ই এক্সাইটেড। আড়াই'শ কিলোমিটারের এই লম্বা ড্রাইভটি বেশ উপভোগ্য। তাছাড়া ইয়ামুসুক্রো গেলে আমরা যে হোটেলটিতে উঠি, সেই প্রেসিডেন্ট হোটেলের চমৎকার সুইমিংপুলে সাঁতারকাটার সুযোগটিই অগ্নির এক্সাইটমেন্টের বড় কারণ। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ হলো ব্যানব্যাট-৪-এর একবছরের কাজের কিছুটা খোঁজ-খবর করা, যার সাফল্যের সঙ্গে এই মিশনের সাফল্যও জড়িত। লে. কর্ণেল দিদারুল আলম আমাদের পারিবারিক বন্ধু। অগ্নি, জল দু'জনই দিদার ভাইকে বেশ পছন্দ করেন। আমাদের সফরসঙ্গী দিদার ভাই ন'টা বাজার আগেই তৈরী হয়ে আমাদের জন্য সেব্রোকোতে অপেক্ষা করছেন।

সিদ্ধান্ত হলো, প্রতি এক ঘন্টা পরপর গাড়ি থামিয়ে দশ মিটিটের একটা ব্রেক নেব। এতে লম্বা জার্নির ক্লান্তিটাকে এড়ানো যাবে। পথে দু'বার গাড়ি থামালাম। দ্বিতীয়বার যখন গাড়ি থামাই, দেখি রাস্তার পাশে লেখা 'মরোনু'। জায়গাটার নাম মরোনু, পড়তে পড়তে কেমন যেন আমরা সকলেই একটু নড়ে-চড়ে বসলাম। নিজেদের জড়তা দূর করতেই হয়তো 'মরোনু' শব্দটা নিয়ে হালকা রসিকতা শুরু করলাম। আমি ড্রাইভ করছিলাম ১২০ কিলোমিটার গতিতে, এর চেয়ে জোরে গাড়ি চালাবার অনুমতি নেই আমাদের। ১২০ কিলোমিটার গতি আমাদের কাছে যথেষ্ঠ মনে হলেও, পেছন থেকে যখন সাঁই সাঁই করে অন্য গাড়িগুলো আমাদেরকে ভেংচি কেটে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিলো তখন আমার ড্রাইভিং ইগোতে বেশ একটু আঘাত লাগছিলো বৈ-কি? এই রাস্তায় প্রায় রোজই দু'একটা এক্সিডেন্ট হচ্ছে। আমাদের ইউএন এক্সপার্টদের অভিমত হলো, দ্রুত-গতিই এজন্য দায়ী। আর আবিদজান-ইয়ামুসুক্রো রাস্তায় এক্সিডেন্ট মানেই হলো ডেথ ক্যাজুয়ালটি। এর প্রমাণতো আমরা পেলামই। সেই ২৫ আগষ্ট ট্রাজেডির কথা মনে হলে এখনো শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই পথেইতো, টিয়াসলে নামক সেই অপয়া জায়গাটায় প্রাণ দিলো আমাদের ৬ বাংলাদেশী সৈনিক। ওইদিনই মাত্র প্লেন থেকে নেমেছিল বেচারারা। কতো স্বপ্ন ছিল, কত আশা ছিল। এক বছরে যা ডলার আয় করবে তা নিয়ে ঘরে ফিরবে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে। সবার মুখে হাসি ফুটবে। একটি মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনা সব মিথ্যে করে দিল।

কিছুদূর এগোতেই একটা ছোট্ট শহর পড়লো। এই শহরের নাম তমুদি। ডানদিকে পহাড়ের মাথায় ত্রিভূজ আকৃতির একটা টকটকে লাল চার্চ। বাঁ দিকে এক চিলতে শহর। তমুদির রাস্তায় একদল নারী-পুরুষ ইতস্তত হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওদের পরণে হাতির প্রতিকৃতি আঁকা কড়া হলুদ রঙের পোশাক। প্রায় সব মেয়েরই গলায়, হাতে, হাতির দাঁত ও হাঁড়ের তৈরী অলঙ্কার। আইভরিয়ানদেরকে বলা হয় ইলিফ্যান্ট ন্যাশনাল। হাতিই ওদের জাতীয় প্রতীক। আইভরিয়ান ফুটবল দলটিকেও বলা হয় এলিফ্যান্ট। দেশের সর্বত্রই অতি সুলভে পাওয়া যায় হাতির দাঁত ও হাঁড়ের অলঙ্কারাদি। ছোট বেলায়

যে গজমোতির দেশের কথা শুনেছিলাম, আটলান্টিক মহাসাগরের নীল জলের ফেনায় গড়ে ওঠা এইতো সেই গজমোতির দেশ।

হোটেলে ব্যাগ রেখে চলে গেলাম ব্যাটেলিয়ন সদর দপ্তরে। বটতলায় গাড়ি রেখে, ডানদিকের এ্যবাকাডো গাছটি পেরিয়ে আমরা এসে ঢুকলাম বিশাল হলরুমটিতে। হলরুমে ঢুকেই টের পেলাম আজ খুব গরম পড়েছে। তাপমাত্রা তেত্রিশ। হলরুমের মাথার ওপর তাবুর মতো ছড়িয়ে আছে বিশাল একটি গাছ। কেউ এই গাছটির নাম জানে না। অনামিকা গাছটি মাথার ওপর ছায়া দিয়ে না রাখলে সিনথেটিক তাবুর এই সুবিশাল হলরুমটিতে বসা দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো। ওদের জায়েন্ট সাইজের এলসিডি স্ক্রিনে তখন চ্যানেল আই-এর অনুষ্ঠান হচ্ছে। অনুষ্ঠানের নাম, লেটস মুভ। আমরাও বেশ মুভড হলাম এতোদিন পর বাংলা চ্যানেলে অনুষ্ঠান দেখতে পেয়ে। জলের বয়স আড়াই বছর। ও অনেকদিন পর ওর প্রিয় অনুষ্ঠান, বাংলা বিজ্ঞাপন দেখতে পেয়ে দু'হাত ফ্ল্যাপ করে মাথা দুলিয়ে নাচতে শুরু করলো।

সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট গলফ ক্লাবে শ'তিনেক লোকের জমায়েত। প্রেসিডেন্ট গলফ ক্লাবের মূল ভবনটির দিকে তাকিয়ে মনে হলো একটি অর্ধচন্দ্র যেন মাটিতে উপুড় হয়ে আছে। বাঁ দিকে সবুজ ঘাসের গালিচার অপূর্ব ল্যান্ডস্ক্যাপ। ওটাই গলফ কোর্স। আজ সারাদিন খেলা হয়েছে। এখন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং প্রায় তিন'শ লোকের এক বিশাল নৈশ ভোজসভা। ক্লাব কমপ্লেক্সের বিশাল ক্যাফেটারিয়া কাম বারে হুশ-হাশ শ্যাম্পেইনের বোতল লাফিয়ে উঠছে। আবিদজান থেকে আসা অনুসির গলফ-প্রেমিক দলটির সাথে ইয়ামুসুক্রোর স্থানীয় গলফ খেলোয়াড়দের একটি চমৎকার মিলনমেলা বসেছে আজ ক্লাব-বারে। সাদায়-কালোয় কি অদ্ভুত বন্ধুত্ব। ক্রীড়ার কি অপূর্ব শক্তি! এরি মধ্যে সবাই এসে গেছে। সবাই এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে প্রধান অতিথির জন্য। আজকের প্রধান অতিথি সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী জ্যঁ কোনান বেনি। তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শার্লস কোনান বেনির বড় ভাই। কিন্তু তিনি এখনো আসছেন না কেন? এটাই আইভরিকোস্টের সংস্কৃতি, প্রধান অতিথি আসবেন সবার পরে এবং বেশ বিলম্বে। সবাই তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকবে। অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের মাথায় যখন কেবল একটাই চিন্তা কখন আসবেন প্রধান অতিথি ঠিক তখনি তিনি আসবেন। এক্ষেত্রেও তাই হলো। তিনি এলেন নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট পরে। এদিক থেকে বাঙালী সংস্কৃতি আর আইভরিয়ান সংস্কৃতির মধ্যে কোনো তফাত নেই। হঠাৎ দিদার ভাই ছুটে এসে আমার স্ত্রী মুক্তিকে বললেন, ভাবি গেস্ট অব অনার তালিকায় আপনিও আছেন। আপনাকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে। হুমায়ুন ভাইয়ের মাথায় হয়তো এই দুষ্টুবুদ্ধি খেলে থাকবে যে শাড়ি পরা এক বাঙালী নারীকে মঞ্চে তুলে সবাইকে চমকে দিই। পাশাপাশি কিছুটা হলেও বাংলাদেশের স্বরূপ আজকের এই মহতী আয়োজনে তুলে ধরা হবে। অনুষ্ঠানে র‍্যাফেল ড্র-র আয়োজন ছিল। অতি আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের তিনজনের টিকিটই র‍্যাফেল ড্র-তে উঠলো। মুক্তি যেহেতু নিজেই বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছিলো তাই সে তার নিজের পুরস্কারটি সারেন্ডার করে দিল। জলকে কিছুতেই ম্যানেজ করা যাচ্ছে না। মঞ্চের পেছনের সুইমিং পুলে ও পারলে এক্ষুণি ঝাপ দেয়। আমরা কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি সমুদ্রে কিংবা সুইমিং পুলে গেলে ও ঘন্টার পর ঘন্টা পানিতে নেমে থাকে। শুধু তাই না, আবিদজান শহরের ওপর দিয়ে যখন গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাই, সেটা দিনে কিংবা রাতে যখনই হোক না কেন, যতক্ষণ লেগুনটা দেখা যায় ও ততক্ষণই লেগুনের টলমলে পানির দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহলে কি এটা নামের প্রভাব?

জলের জলজ অত্যাচারে আমরা শেষ পর্যন্ত প্রধান অতিথির ভাষণ না শুনেই হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালে হুমায়ুন ভাই ফোন করে বললেন, ঝটপট তৈরী হয়ে নিন, আপনাদের নিয়ে বেশ কয়েকটা জায়গায় যাবো। আইভরিকোস্টের পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল ইয়ামুসুক্রোর আভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাটগুলো বিমানবন্দরের রানওয়ের মতো সোজা এবং কমপক্ষে তিন'শ ফুট প্রশস্ত। খুবই পরিকল্পিত শহর। তারচেয়েও পরিকল্পিত রাস্তাঘাট। অথচ সারাদিনে কোন কোন রাস্তায় পাঁচ/দশটা গাড়িও দেখা যায় না। বড় শখ করে আইভরিকোস্টের জাতির জনক দোর্দন্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট উফুয়ে বৈগনি বানিয়েছিলেন এ শহর। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইয়ামুসুক্রোকে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে গড়ে তুলবেন। কি নেই এ শহরে? পার্লামেন্ট হাউস, প্রেসিডেন্ট প্যালেস, রাস্ট্রীয় অতিথি ভবন, পাঁচতারা হোটেল, গলফ কোর্স, ইন্টারন্যাশনাল পিস সেন্টার, সুবিশাল একেকটা রাজপথ সব আছে। একটি আধুনিক রাজধানী হবার সব যোগ্যতাই রয়েছে এ শহরের। শুধু প্রেসিডেন্ট বৈগনি নেই। তাঁর মৃত্যু এবং অব্যবহিত পরেই সংঘটিত গৃহযুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে এ শহরের সমস্ত জৌলুস। একটি বিশাল প্রাসাদে কোন মানুষ না থাকলে যেমন প্রাসাদটিকে মনে হয় এক প্রেতপুরী তেমনি আইভরিকোস্টের রাজনৈতিক রাজধানী ইয়ামুসুক্রোতে কোন রাস্ট্রীয় কর্মকান্ড নেই বলে এ শহরটি পরিনত হয়েছে বিলীন হয়ে যাওয়া প্রগৈতিহাসিক কোন এক ইজিপশিয়ান শহরে। এক খা খা বিরান শহর। সেই বিরান শহরে আমরা এক পর্যায়ে হারিয়ে গেলাম। আমরা সবাই উইন্ডস্ক্রিণে চোখ রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি

প্রেসিডেন্ট হোটেলের টাওয়ারটি দেখার জন্যে। ওটাই ল্যান্ডমার্ক। এক পর্যায়ে হঠাৎ যেন মেঘের নিচ থেকে পূর্ণচন্দ্রের মতো বেরিয়ে এলো ভ্যাটিকানের চেয়েও বড়, ইয়ামুসুক্রোর গর্ব, সেই বিখ্যাত বাসিলিকার সুবিশাল সুশুভ্র গম্বুজটি। আমরা উল্লসিত হলাম। যাক অন্তত বাসিলিকার গম্বুজটি অনুসরণ করে ব্যাটেলিয়নের বেইজে ফিরে যেতে পারবো। এতো বিশাল-প্রশস্ত রাস্তায় হারিয়ে যাওয়ার কারণ হলো, ইয়ামুসুক্রোর পাহাড়ি ল্যান্ডস্ক্যাপ এবং রাস্তার দু'পাশের ঘন অরণ্য। একেকটি বৃক্ষের উচ্চতা কম করে হলেও দেড়-দু'শ ফুট। পাইন, মেহগনি, পাহড়ি শিমুল, বনবট, জারুল, নিম এবং আরো নাম না জানা অসংখ্য গাছের পাশাপাশি রয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত নারকেল, পাম এবং রাবার বাগান।

একই রাস্তায় দুই-তিনবার করে পাক খেতে খেতে অবশেষে এসে পৌছলাম আইভরিকোস্টের একমাত্র ডোমেস্টিক ওয়াটার সাপ্লাইয়ার, ফরাসী কম্পানী সোদেসি-র (SODECI) ইয়ামুসুক্রো অফিসের নির্বাহী প্রধানের বাসায়। বেশ নির্জন অভিজাত এলাকায় একটি ছোটখাট ভিলায় থাকেন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই এই ভদ্রলোক। তিনি আমাদের গ্রিট করে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকেই উঁচু শ্রেণীর আইভরিয়ানদের যা রুচি, সেই রুচির পরিচয় পেলাম দেয়ালে ঝোলানো বড় বড় দু'টি অসাধারণ তৈলচিত্র দেখে। একটি ছবিতো খুবই চমৎকার। ধোয়া দিয়ে তৈরী এ্যবস্ট্রাক্ট। কখনো মনে হয় উচ্ছাসে ভেঙে পড়া এক নারী, আবার মনে হয় মরুপ্রান্তরের এক দ্রুতগামী অশ্ব, আবার মনে হয় একটি পাখি ওড়ার অপেক্ষায়। ভদ্রলোকের নামটি আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না বলে বেশ অস্বস্তি লাগছে। কুশল বিনিময়ের পরপরই ১৭ মিলিয়ান আইভরিয়ানের বুকের ভেতরে গুঞ্জরিত প্রশ্নটি করলাম তাকে, সোদেসির পানি এতো এক্সপেনসিভ কেন? একটি মাঝারি সাইজের এপার্টমেন্ট, যেখানে ৪ সদস্যের একটি পরিবার বসবাস করে, সেই পরিবারকে প্রতি মাসে পানির বিল গুনতে হয় কুড়ি হাজার সিফা (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ২৭০০ টাকা), আপনি কি মনে করেন না সোদেসি মানুষের ওপর জুলুম করছে? ভদ্রলোক বেশ হকচকিয়ে গেলেন আমার এই প্রশ্ন শুনে। তিনি বললেন, আপনিতো দেখি আইভরিয়ানদের মতোই কথা বলছেন। দেখুন, কম্পানিটি ফরাসী বলেই লোকের যতো অসন্তোষ। একটি আইভরিয়ান কম্পানী এই টাকা চার্জ করলে ওরা এসব বলতো না। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সার্ভিসের প্রশংসা করবেন। কখনো কি দেখেছেন আট মিলিয়ন লোকের আবিদজান শহরে এক মিনিটের জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ ছিল? দেখেন নি। ভালো সার্ভিসের জন্যতো একটু বেশি পয়সা দিতেই হবে। তাছাড়া আমরা পানি উৎপাদন করি দু'ভাবে। ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পাশাপাশি রিজার্ভারের পানি পিউরিফাই করি। ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্লান্টের খরচ সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়ই ধারণা আছে। পরিবেশের কথাটি মাথায় রেখেই আমার কম্পানি সব পানি মাটির নিচ থেকে তোলে না। আমরা যদি দেশের পুরো পানির চাহিদা মেটাতে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করতাম তাহলে অনেক সস্তায় পানি দেওয়া যেত ঠিকই কিন্তু পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হতো। বুঝলাম ফরাসীরা বেশ ভালোভাবেই এই আইভরিয়ানটির মগজ ধোলাই করেছে। পাশাপাশি একটা বিষয়ের তারিফ না করে পারছি না। সোদেসি একটি বিদেশি কম্পানি হওয়া সত্বেও এখানকার পরিবেশের ভারসাম্যের বিষয়টি মাথায় রেখে ব্যবসা করছে। অথচ আমাদের ওয়াসা এতো পুরোনো একটি রাস্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আজো ভূ-গর্ভস্থ পানি টেনে তুলছে! বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে তাপমাত্রার যে ঋতুবৈরীতা গত এক-দেড় দশক ধরে পরিলক্ষিত হচ্ছে, অতি মাত্রায় ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন এর একটি বড় কারণ সন্দেহ নেই। কে জানে সামনে আরো কত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের জন্য ওৎ পেতে আছে।

এই বিষয়ে আর না এগোনোই ভালো। ব্যানব্যাট-৪ সম্পর্কে কথা উঠতেই ভদ্রলোক উচ্ছসিত প্রশংসা শুরু করলেন। শান্তি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশী মিলিটারিদের ভূমিকা খুবই ইতিবাচক। কমান্ডার হুমায়ুনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মিলিটারি ইয়ামুসুক্রোর মানুষের আক্ষেপ-আক্রোশ কমাতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘ সম্পর্কে মানুষের মনে যে নেতিবাচক ধারণা ছিল, সেটা এখন আর নেই, অন্তত আমি ইয়ামুসুক্রোর কথা বলতে পারি।

এরপর আমরা এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইয়ামুসুক্রোর গভর্ণর জনাব দ্রি কোফি আপোলিনেয়ারের বাসভবনে গিয়ে হাজির হই। আগে থেকেই এপোয়েন্টমেন্ট করা ছিল। কাজেই বাড়ির সিংহ দরোজায় কর্মরত নিরাপত্তা রক্ষীরা আমাদের সসম্মানেই অভিবাদন জানিয়ে অভ্যন্তরে নিয়ে গেল। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনি পেরিয়ে বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই দেখি জনাব কফি আমাদের স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ষাটের কোঠায় উপনীত ছোটখাট কৃষ্ণ বর্ণের এক মানুষ। হাসিতে উদ্ভাসিত। সকালের মিষ্টি রোদ তার উজ্জ্বল সাদা দাঁতে ঝিলিক দিয়ে হাসির দ্যুতি ছড়িয়ে দিলো পুরো আঙিনায়। সদর ড্রয়িংরুমে আমাদের নিয়ে বসালেন তিনি। নিজেও বসে পড়লেন একটি ডাবল সোফায়। আমাদের দেশের এই পর্যায়ের কোনো নেতার বাড়িতে সাধারণত নেতার নিজের জন্য ড্রয়িংরুমেও আলাদা করে একটি আসন সংরক্ষিত থাকে কিন্তু জনাব কফির ঘরে সেই রকম কোনো আয়োজন দেখলাম না। তিনি নিজে মদ্যপান কিংবা ধুমপান করেন না কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের জন্য সবরকম আয়োজনই আছে। তিনি এই বিশাল সরকারী বাড়িটিতে একাই থাকেন। স্ত্রী থাকেন দেশের প্রধান শহর আবিদজানে। দুই মেয়ে পড়ছে আমেরিকায়। একটি ট্রেতে করে খানসামা আমাদের জন্য

নানান রকমের পানীয় এবং স্ন্যাকস নিয়ে এলো। বলাই বাহুল্য যে ওতে খুব দামী স্কচ, ওয়াইন এবং বিয়ারও ছিল। তাছাড়া নানান রকম ফলের জুস এবং সফট ড্রিঙ্কসতো ছিলোই। জল নেমেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো ঘরের সবগুলো ডেকোরেশন পিসের বারোটা বাজাতে। আমরা এতে খানিকটা বিরক্ত হলেও গভর্ণর সাহেব বারবার অভয় দিয়ে বরং ওর হাতে এটা সেটা তুলে দিতে লাগলেন। আমরা গভর্ণরের সাথে বেশ কিছু ছবি তুললাম। বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা জানতে চাইলাম। তিনি অত্যন্ত সরলভাবে বললেন, আমি আসলে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছুই জানি না। বাংলাদেশ নামে যে একটা দেশ আছে এটাই জানতাম না। যখন বাংলাদেশী মিলিটারি এলো আইভরিকোস্টে তখনি কেবল জানতে পারলাম আপনাদের দেশটির কথা। তবে এখন আমি বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। আমি মনে করি বাংলাদেশের মানুষ খুব নরম ধরণের মানুষ এবং খুব শান্তিপ্রিয়। আমি আরো মনে করি বাংলাদেশীরা খুবই অতিথিপরায়ন এবং দয়ালু। মানুষের কষ্ট দেখলে এগিয়ে যায়, মানুষকে সাহায্য করে। আমি প্রশ্ন করলাম, আমাদের ডিডিআর ব্যাটেলিয়ন সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি? তিনি বললেন, ডিডিআরের বলেন আর অনুসির বলেন, সাফল্য নির্ভর করে আইভরি কোস্টের মানুষের কাছে তাদের গ্রহনযোগ্যতার ওপর। এদিক থেকে বাংলাদেশী এই ব্যাটেলিয়নটি খুবই সফল। ইয়ামুসুক্রোর মানুষ তাদেরকে অন্তর থেকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা তাদেরকে অর্জন করতে হয়েছে। তারা তাদের যোগ্যতা দিয়েই এই ভালোবাসা অর্জন করেছেন। আমি ইয়ামুসুক্রোর গভর্ণর হিসাবে কর্ণেল হুমায়ুন এবং তার ব্যাটেলিয়নের কাছে কৃতজ্ঞ। নানানভাবে তারা আমাকে সাহায্য করেছে। আমি লেখালেখির সঙ্গে জড়িত একজন মানুষ, একথা জানতে পেরে তিনি আমাকে বললেন, যদি পারেন আপনার লেখনিতে তুলে ধরবেন, আমরা আইভরিকোস্টে বিদেশী বিনিয়োগ আহবান করছি। কোন বাংলাদেশী ব্যবসায়ী যদি বিনিয়োগ করতে চান আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে সাহায্য করবো। শান্তি প্রক্রিয়া নিয়েও তিনি বেশ খোলামেলা কথা বলেন। তার মতে, সরকার এবং বিদ্রোহী দুই দলের শীর্ষ নেতাদের এখন একটাই স্বপ্ন কি করে ক্ষমতায় যাবে এবং ক্ষমতায় গিয়ে অতিদ্রুত ধনী হয়ে উঠবে। আমি মনে করি না শীর্ষ নেতাদের কেউই শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি আন্তরিক। বেশীরভাগের মনেই অসৎচিন্তা। অবৈধ অর্থের লোভে একেকজন হা করে আছে। আর এই সুযোগটি নিচ্ছে বিদেশী শক্তিগুলো।

আমি ভাবছি আমাদের দেশের কথা। রাজনীতিকদের লোভ যদি দেশপ্রেমকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে সেই দেশ কেবল পেছনের দিকেই যাবে, কখনোই সামনে এগোতে পারবে না। কতগুলো হাইরাইজ দালান আর কয়েকটি সেতু একটি দেশের উন্নয়নের ইন্ডিকেটর না। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি, স্থিতিশীলতা, জনজীবনের নিরাপত্তা, আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ এইগুলোই হলো দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষণ। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা কি কেবল পেছনেই হাঁটছি না? পেশাগত প্রয়োজনে এবং ভ্রমণের নেশায় নানান দেশে ঘুরে বেড়াই। স্বচক্ষে দেখি বিভিন্ন দেশের ইমিগ্রেশন অফিসার আমার অতিপ্রিয় সবুজ পাসপোর্টের প্রতি কিভাবে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। একজন ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে আমি কে এটা কোন বিষয় না, ওর কাছে বিষয় হলো আমি কি রঙের পাসপোর্ট বহন করছি। কেন টিআই-এর রিপোর্টে বারবার শীর্ষ দূর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে বাংলাদেশের নাম আসে? কেন লক্ষ লক্ষ বাঙালী অবৈধভাবে বিদেশে পাড়ি জমায়? প্রায়শই এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় আমাকে। কতো আর ধামাচাপা দেওয়া যায়। থলের বেড়াল একদিনতো বেরিয়ে পড়েই। গত জুনে যখন ছুটিতে ঢাকায় গিয়েছিলাম তখন রোজ ভোরে হাঁটতে বেরুতাম। আমাদের প্রাতঃভ্রমণের ছোট্ট দলটির একজন ছিলেন সাবেক মন্ত্রী এবং আমলা এ.বি.এম. গোলাম মোস্তফা। শেষদিন বিদায় নেবার সময় আশির কোঠায় পৌছুনো এই প্রবীন নেতা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, একটা কথা সবসময় মনে রাখবে। বিদেশের মাটিতে তুমি হচ্ছো বাংলাদেশের এ্যমবাস্যডর। সবসময় চেষ্টা করবে, তোমার প্রতিটি আচরণ যেন দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। এ কথা আমি বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি, প্রবাসী বাংলাদেশীরা কদাচ এমন আচরণ করেন যার জন্য দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে। বরং তাদের কাজ, তাদের পরিশ্রম, তাদের দক্ষতা, তাদের সততা সবসময়ই বিদেশীদের কাছে প্রশংসিত হয়। ইটালিতে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে, বৃটেনে, আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে দেখেছি সর্বত্রই বাঙালী কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হচ্ছে। এমন কি জাতিসংঘের যেখানেই বাংলাদেশী সামরিক/বেসামরিক অফিসার/সৈনিক কাজ করছে, একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সর্বত্রই বাংলাদেশীদের জয়-জয়কার। যখনই অন্য কোন মিশনে বা অন্য কোন দেশে কর্মরত কোন বাংলাদেশীর সাফল্যের কথা শুনি গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে, নিজের অজান্তেই গেয়ে উঠি, আমার সোনার বাংলা / আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু যখনই দেশের আভ্যন্তরীণ চিত্রটি দেখি তখনি ফুটো হয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চিমসে যাই। দু'বছর আগে যখন নিউইয়র্কে বেড়াতে যাই, তখন শুনি ক'দিন আগে আমাদের এক শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা নিউইয়র্কের জ্যামাইকাতে নগদ আট লক্ষ ডলার দিয়ে একটি বাড়ি কিনেছেন। কোত্থেকে আসে এই টাকা? একজন দেশপ্রেমিক প্রবাসী যখন তার সারাজীবনের কষ্টার্জিত অর্থ নিয়ে স্বপ্নের বাংলাদেশে ফিরে যান, দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার অভিপ্রায়ে দেশে বিনিয়োগ করতে চান তখন তাকে ঘিরে ধরে সরকারী-বেসরকারী চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীরা। বছরের শুরুতে একটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিকে সংবাদ ছাপা হয়েছিল, এক প্রবাসী ব্যবসায়ী কক্সবাজার থেকে তার শত কোটি টাকার বিনিয়োগ গুটিয়ে আবার বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আমাদের যুবরাজদের দোর্দন্ড প্রতাপে এমনি করে যদি সৎ এবং

ইনোভেটিভ ব্যবসায়ীরা মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে দেশের চেহারা বদলাবে কি করে? যেসব সন্ত্রাসীদের ভয়ে প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন আমরা সবাই জানি এইসব সন্ত্রাসীরা কারা? কি এদের পরিচয়? এরা সবাই রাজনীতিকদের হাতের লাঠি, ভোটের গ্যারান্টি। তৃতীর বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এই একই রাজনৈতিক চিত্র নানান ফর্মে দেখা যায়। আজ যখন গভর্নর কফি তার দেশের রাজনীতিকদের দূরভিসন্ধির কথা বললেন তখন আমার দেশের অধিকাংশ রাজনীতিকের অসহিষ্ণু এবং লোভী চরিত্রই চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

হুমায়ুন ভাইয়ের মোবাইল বার বার বাজছে। ফোনে তাগিদ দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট গলফ ক্লাবের ডিরেক্টর তুরে মোহাম্মদ। তুরের ওখানে যখন পৌছলাম তখন প্রায় দুপুর। তুরে আমাদেরকে তার ক্লাব দেখাতে চাইলো। কিছুক্ষণ ক্লাবের বারটিতে বসলাম। অমায়িক মানুষ তুরে মোহাম্মদ। এখন রমজান মাস। তুরে নিজে রোজা রাখলেও আমাদেরকে আপ্যায়ন করার চেষ্টা করলেন। এদেশের অবস্থাসম্পন্ন মুসলমানেরা প্রতি রমজান মাসে গরীব মুসলমানদের নামের তালিকা তৈরী করে। ধনীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে সারা মাসের খাবার প্রদান করে। যাতে পবিত্র রমজান মাসে কাউকে ভুখা থাকতে না হয়। তুরে সেই প্রোগ্রাম নিয়ে মহাব্যস্ত। সাহায্য চাইলেন ব্যানব্যাটের কাছে, হুমায়ুন ভাই সাহায্যের আশ্বাস দিলেন।

ইয়ামুসুক্রো ছাড়ার আগে আমাদেরকে আরো একটি বাসায় যেতে হবে। যুবকের নাম সুমিত অরুণ চন্দ। সুইস মা আর বাঙালী পিতার সন্তান। ভাঙা ভাঙা কয়েকটি বাংলা শব্দ জানে। ওর মেয়ে বন্ধু গ্রিক বালিকা পিনাকে নিয়ে একটি বিশাল ভিলায় থাকে সুমিত। ওকে কাল রাতেই কথা দিয়েছি ওর ওখানে যাবো। সুমিত বার বার ফোন করছে। ওরা দুজনই অনুসিতে কাজ করে। ইয়ামুসুক্রোর ইলেকশন অফিসার। বাড়ির ভেতরে ওভাল ড্রাইভওয়ে। আমরা গিয়ে বসলাম সুমিংপুল সংলগ্ন ছনের ছাউনিটির নিচে। পাশেই সুমিত-পিনার মুরগীর খামার, তারের জালে আটকানো। বাড়ির ভেতরে বিশাল বিশাল কয়েকটা পাহাড়ি শিমুল, বনবট, আমগাছ, পেটমোটা একটা নিম গাছ আর বেশ কিছু পুরোনো মেহগণি গাছ। ছায়াসুনিবিড় এক বিশাল বাড়ি বলতে যা বোঝায় সুমিতের বাড়িটি ঠিক তাই। মুরগীর খামারের তারের ওপর বসে একটি ঘুঘু করুণ সুরে ডেকে চলেছে।

সুমিং পুল দেখে জল বার বার পুলের চারপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে অগ্নিরও ইচ্ছে নেমে পড়ার। শুধু অনুমতিটা পেলেই হয়। আমরা খুব বেশিক্ষণ বসলাম না। এবার ছুটিতে যখন ঢাকায় যাবো তখন কোলকাতা বেড়াতে যাবো শুনে সুমিত ওদের কোলকাতার বাড়ির ঠিকানা দিতে চাইলো। আরো জানালো ঢাকায় ওদের পরিবারের অনেকেই এখনো আছে। ওর এক চাচা খুব বড় জাজ। তবে ঠিক কোথায় আছে তা ও জানে না।

আমরা ব্যনব্যাটে এসে দেখি দিদার ভাই অপেক্ষায় অস্থির। তিনটার মধ্যে রওনা হতে না পারলে আবিদজানে ফিরে ইফতারি ধরা যাবে না। তাছাড়া এই রাস্তায় রাতে ড্রাইভ করা অনেকটা সুইসাইড করার শামিল। ইয়ামুসুক্রো-আবিদজান রাস্তায় প্রায় এক-দেড়শ কিলোমিটারের মধ্যে কোন হোটেল-মোটেল কিছুই নেই, এমনকি গাড়ি মেরামতের কোন ওয়ার্কশপ বা ফুয়েল স্টেশনও নেই। লোকালয় চোখে পড়ে ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটার পরপর। এমন পথে রাত করাতো দূরের কথা দিনের বেলায় জার্নি করাও খুব একটা সুখকর নয়। যদি একবার গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়ায় তাহলে খবর আছে।

রিয়ার ভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছি আমাদের পেছনে বাসিলিকার সুবিশাল গম্বুজটি ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। আর মাত্র দশদিন। এরপরই ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। আমি যদিও আবার ফিরে আসবো এই গজমোতির দেশে কিন্তু মুক্তি, অগ্নি আর জল হয়ত খুব শিগগিরই আবার আসছে না। বাড়ি ফেরার প্রাক্কালে এই ইয়ামুসুক্রো ভ্রমণটা ওদের জন্য একটা মজার স্মৃতিময় ঘটনা হয়ে থাকবে।

মাইলস্টোনের দিকে তাকিয়ে দেখি আবিদজান এখনো দু'শ কিলোমিটার দূরে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২ অক্টোবর, ২০০৬

যীশুর গায়ে রোদ লাগে না

এসফল্টের রাস্তাটা পিছলাতে পিছলাতে পাহাড় থেকে নেমে এসে যেখানে সমতল ভূমিতে লেপ্টে গেছে ঠিক ওখানেই একটি নামফলক। লাল জমিনের ওপর শাদা লেখা, বনুয়া। ডানদিকে অনেকখানি সমতল, আনারসের মাঠ আবার উঠতে শুরু করেছে ওপরে। ওখানেই আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক'শ ফুট উঁচু মেরীমূর্তি। কোলে শিশুপুত্র যীশু। শাদা এই নারীমূর্তিকে ঘিরে এক পাকা বেদী, বেদীর ওপর একদল কালো মানুষ ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য প্রার্থনায় নিমগ্ন। স্থাপত্যশিল্পের বৈচিত্র ছাড়া দৃশ্যটা একই, সর্বত্র। আইভরিকোস্টের এখানে-সেখানে এমন অসংখ্য ধর্মশালা পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা ত্রিভূজ, কোনটা পাখি, কোনটা মেরী, কোনটা নৌকা, আবার কোনটা বর্তুল, গোলাকার গম্বুজ। রঙের বৈচিত্রও লক্ষ্য করার মতো। গাঢ় নীল, লাল, হলুদ, সবুজের সাথে শাদার প্রাধান্য সর্বত্র। শ্বেতপাথরের প্রতি যতোটা না প্রেম, আমার মনে হয় তার চেয়েও বেশি শাদার প্রতি প্রভূত্ব। এ দেশের মানুষ বেড়াল, কুকুর, খোরগোশতো বটেই, এমন কি ইঁদুর (বেশ বড়সড় এই ইঁদুরগুলোকে ওরা বলে আগুটি) এবং বাদুড়ও খায়। বাদুড়ের স্যুপ নাকি অসাধারণ সুস্বাদু খাবার। কিন্তু অতি আশ্চর্য এই যে ওরা এখানে-সেখানে বসে থাকা ধবল বকগুলোকে খায় না। কারণ ওরা শাদা, ওরা আকাশ থেকে নেমে আসা দেবদূত।

দুপুর হেলে পড়লেও আকাশে জ্বলন্ত সূর্য্য। দাবদাহে পুড়ছে পাম আর কাকাওয়ের বন। আমরা আশ্বিনি বিচ থেকে ফিরছি। আবিদজান শহর থেকে এক'শ কিলোমিটার দূরের এই বিচে প্রতি রোববার ছুটে আসি সজীব হওয়ার জন্য। বুক ভরে আটলান্টিকের নোনা বাতাশে নিঃশ্বাস টেনে আমরা আরো একটি কর্মসপ্তাহ কাটানোর জন্য তৈরী হই। আশ্বিনি বিচে আসা-যাওয়ার পথে মেরীকে সবসময়ই দেখি পুত্র যীশুকে কোলে নিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে দূরের পান্থজনদের বিলাসী গাড়িরগুলো গুনছে। প্রায়ই ভাবি একদিন ওর কোলের কাছে যাবো, জিজ্ঞেস করবো, ঈশ্বরের পুত্রকে ধর্মের কোলে বন্দী করে রেখেছো কেন? ওকে ছেড়ে দাও মানুষের ভিড়ে, বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিক কালো মানুষের রক্তের ভেতর।

মূল সড়ক থেকে মেরীমূর্তির পদতল অব্দি একটি প্রশস্ত মেঠোপথ। আমি গাড়ি নামিয়ে দিলাম মেঠোপথে। সাথে আমার দুই পাকিস্তানী সহকর্মী, সাজ্জাদ মোহাম্মদ আর আজরা লোদী, ওরা পাকিস্তান পুলিশ বিভাগের দুই ডিএসপি। আজরা কিছুটা আপত্তি করলেও সাজ্জাদের আগ্রহ আমার মতোই। আনারসের মাঠ পেরিয়ে উন্মুক্ত গীর্জার কাছাকাছি পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য, দূর থেকে অতোটা বোঝা যায়নি। যেখানে গাড়ি পার্ক করেছি ওখান থেকে মেরীর পদতল অব্দি একান্নটি সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'পাশে, প্রতিটি সিঁড়িতে, হাঁটু গেঁড়ে শত শত তরুণী দু'হাত জড়ো করে বাইবেলের শ্লোক পাঠ করছে আর চোখের পানি ফেলছে। আমি সিঁড়িতে পা রাখতেই সাজ্জাদ আমার জামা খামছে ধরলো। 'দাঁড়ান, ওদের সংস্কারগুলো জেনে নেওয়া দরকার, জুতো পরে এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যাবে কি-না কে জানে?' সাজ্জাদের কথায় আমি তেমন কর্ণপাত না করে তরতর করে ওপরে উঠতে লাগলাম। নানান দেশে এমন অনেক ধর্মশালায় গিয়েছি, বিদেশিদের জন্য এগুলোতো দর্শনীয় স্থানও, কেউ আপত্তি করেনি। দুবাইয়ের একটি দর্শনীয় মসজিদে দেখেছি বিদেশিরা জুতো পরে, শর্টস পরে, এমন কি মেয়েরাও, দেদারসে ঢুকছে। শুধু এক জায়গায়, কাঠমুন্ডুতে আমি বেশ আহত হয়েছি। পশুপতিনাথ মন্দিরের ছবি তুলতে গেলে এক নিরাপত্তাকর্মী ছুটে এসে আমার হাত থেকে ক্যামেরা কেড়ে নেয়। এ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ধর্মশালা দর্শন করতে গিয়ে বিপদে পড়ি নি। অবশ্য স্থানীয় জনগনের স্পর্শকাতরতার বিষয়টি সবসময় খেয়াল রেখে এগুনোই ভালো। কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে যেন আঘাত না লাগে এটা লক্ষ্য রাখা একজন সচেতন পর্যটকের দায়িত্ব। সৌদি আরবের বিষয়টি অবশ্য ভিন্ন, ওখানেতো কোন মেয়ে একা বাইরে বেরুতেই পারে না। জেদ্দা কিংবা রিয়াদ বিমান বন্দরে দেখেছি শাদা চামড়ার বিদেশি মেয়েগুলো প্লেন থেকে নেমেই বুরকা পরে ফেলে। হিজাব না পরে কোন মেয়ে সৌদি আরবে চলা-ফেরা করতে পারে না।

একান্নটি সিঁড়ি ভেঙে মেরীর পদতলে নির্মিত গোলাকার সুবিশাল বেদীর কাছে পৌঁছে গেছি, পেছনে সাজ্জাদ, আজরাতো গাড়ি থেকেই নামেনি। বেদীর চতুর্দিকে গোল হয়ে হাঁটু গেঁড়ে, পাকা বেদীর ওপর নতজানু মস্তক রেখে প্রার্থনায় নিবিষ্ট অসংখ্য মানুষ। অতি আশ্চর্যজনকভাবে এখানে কোন রোদ নেই। এক সুশীতল ছায়া, তার ওপর দিয়ে বহু দূর থেকে ভেসে আসা মিষ্টি হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলায় রোদে খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে যখন ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে জিরোবার জন্য গাছতলায় বসে পড়তাম, তখন গাছের ছায়ায় শীতল বাতাশে যেমন প্রাণ জুড়াতো ঠিক সেইরকম এক অনুভূতি হচ্ছে এখানে। অথচ দূরে, যতদূর চোখ যায়, আনারসের মাঠ, কাকাও বন, পাম বন কিংবা রাবার বন তীব্র রোদে পুড়ছে। এখানে রোদ নেই কেন? ওপরে তাকিয়ে দেখি একখন্ড ভারী মেঘ ঠিক আমাদের মাথার ওপর স্থির

দাঁড়িয়ে আছে, ছায়া দিচ্ছে প্রার্থনারত মানুষদের। কেমন একটা ধাক্কা লাগলো। আশপাশে কাউকে পাওয়া যায় কি-না জিজ্ঞেস করার মতো খুঁজতে লাগলাম। খানিকটা দূরে একটি ছোট্ট ঘর, তার কার্নিশের নিচে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গেলাম। কুশল বিনিময় করে নাম জিজ্ঞেস করলাম। বললো, জোসেফ। 'জোসেফ, বিষয়টা কি? শুধু এখানে ছায়া আর সর্বত্র রোদ ?' জোসেফ খুব ক্ষেপে গেল। ওর রাগ আমার মূর্খতার ওপর। যেন আমার জানা উচিৎ ছিল, এখানে রোদ না থাকারই কথা, কারণ মা মেরী তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ঈশ্বর কি করে তার নিজের পুত্রকে রোদে পোড়াবেন?

ওর সাথে আর কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে লাগলাম। এই বিশ্বাসী যুবক নিশ্চয়ই রোজ এখানে আসে না দেখার জন্য যে যীশু রোদে পুড়ছে কি-না? জোসেফ আসুক আর না আসুক আগামী রোববার আবার যখন অশ্বিনি বিচে যাবো তখন আমি ঠিকই দেখতে আসবো যীশুর গায়ে রোদ লাগছে কি-না।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৮ আগস্ট, ২০০৭

রোজার প্রথম দিন

আজ রমজানের প্রথম দিন। স্বাস্থ্যগত কারণে এবার রোজা রাখতে পারছি না। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। পূর্বদিকের বারান্দা। সকালের সূর্য্য এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ওপাশের একটি লেবাননি বাড়িতে বিশাল দুটি পান্থনিবাশ। পান্থনিবাশের পাতার চিরল ছায়া এসে পড়েছে বারান্দায়। সেই ছায়াতে প্লাস্টিকের সবুজ চেয়ার টেনে বসে পড়ি। দু'টি ঘুঘু পালা করে ডাকছে। করুণ ডাক। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া তেমন বের হয় নি এখনো। বারান্দার উল্টোদিকে, ডানে আরো একটি বিশাল বাড়ি। ও বাড়ির দেয়ালের বাইরে, গাড়ি পার্কিংয়ে, একজন লোক সিন্ধুকের মতো এক লোহার বাক্সের ডালা খুলছে। একটি গ্রন্থ বের করলো। ওর পরণে গেরুয়া রঙের বুবু (গলা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত জোব্বা ধরণের পোশাক), মাথায় শাদা টুপি, কাঁধের ওপর গোলাপী রঙের স্কার্ফ। এবার ও সিন্ধুকের ওপর বসে পড়লো। তারপর গ্রন্থটির ভাঁজ খুলে তেলাওয়াত করতে লাগলো। সে কোরআন পাঠ করছে।

মার্কোরি এলাকায় এই দৃশ্য প্রায়শই দেখা যায়। এদের অধিকাংশই অভিবাসী। বুরকিনা ফাসো থেকে জীবিকার সন্ধ্যানে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে আইভরিকোস্টে। আইভরিয়রা খুব অহংকারী জাতি। পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ আইভরিকোস্ট। এক সময় এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার ছিল। ওরা বুরকিনিদের সহ্য করতে পারে না মোটেও। ওরা মনে করে এই অভিবাসী মুসলমানগুলো এসেই আমাদের দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেছে। বুরকিনা ফাসো ছাড়াও টোগো, মালি এবং নিজার থেকেও আইভরিকোস্টে পাড়ি জমিয়েছে অনেকে। এই হতদরিদ্র দেশগুলোর শতকরা ৯৫ ভাগই মুসলমান। আইভরিয়রা ওদের কাজ না দিলেও, স্থানীয় লেবাননিরা ওদেরকেই কাজে নেয়। এদের অধিকাংশই নৈশ-প্রহরী, মালি, গৃহপরিচারিকা প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর কাজ-কর্ম করে। যারা কাজ জোগাড় করতে পারে না, তারা পথের পাশে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে ভিক্ষা করে।

বিকেলে যখন হাঁটতে বের হই তখনো ও কোরআন পাঠ করছে। আমি এগিয়ে যাই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওর তেলাওয়াত শুনি। কি সুমধুর সুর। এক কৃষ্ণ পুরুষের কণ্ঠে এমন অপূর্ব মধুর সুরে কোরআন পাঠ আগে আর কখনোই শুনিনি। ***'ক্বা-লা মুসা লিক্বওমিহিস তা-ঈনু বিল্লা-হি অছবিরূ ইন্নাল আরদোয়া লিল্লা-হি ইয়ুরিছুহা-মাই ইয়াশা-উ মিন ইবা-দিহ; অল আ-ক্বিবাতু লিলমুত্তাক্বীন'*** *(মুসা স্বীয় কওমকে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, ধৈর্য্য ধর, দেশ আল্লাহরই; তিনি বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকার করেন, পরিনামতো মুত্তাকীদের জন্য।)* আমি চোখ বন্ধ করি, এই আওয়াজ শুনে কে বুঝবে ও কালো না শাদা। তৎকালীন মক্কার সবচেয়ে সম্পদশালী দুটি গোত্রের একটির প্রধান ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক আর অন্যটির প্রধান ছিলেন কাফের উমাইয়া ইবনে খলফ। উমাইয়ার কৃতদাস কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বেলাল গোপনে ঈমান এনেছিলেন বলে তার ওপর বর্বরোচিত অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসে। 'দি মেসেজ' সিনেমাতে এ

দৃশ্য দেখেছি। এই নির্মম অত্যাচারের খবর পেয়ে আবুবকর বেলালের যা দাম তার চেয়ে দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে বেলালকে ছাড়িয়ে আনেন এবং মুক্ত করে দেন। এই বিষয়ের ওপর একটি সূরা নাযিল হয়। সূরা লা'ইল।

সেই কালো পুরুষ হযরত বেলাল মদিনায় ইসলামের প্রথম মসজিদের ছাদে দাঁড়িয়ে আজান দেন। সেটাই ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক আজান। সেই আজান শুনে আনন্দে আমার বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, দেখ বিশ্ববাসী, ধর্ম কিভাবে বর্ণবিভেদ দূর করে সাম্য প্রতীষ্ঠা করে। মক্কা বিজয়ের পরেও ক্বাবা ঘরে প্রথম আজান হযরত বেলালই দেন।

লোকটি কোরআন বন্ধ করে আমার দিকে তাকায়। 'বঁসুয়া' (শুভ বিকেল) বলে শুভেচ্ছা জানায়। আমিও বঁসুয়া বলে আরো কয়েক পা এগিয়ে ওর কাছে যাই। ওর নাম জিজ্ঞেস করি। 'আমি ইব্রাহিম বাম্বা। আপনি কি আমাকে কিছু সিএফএ দেবেন? রমজান মাস। আল্লাহপাকের পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করছি। কিছু অর্থ পেলে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ইফতারি আর সেহরী খেতে পারি'। মার্কোরি ধনী লেবাননিদের আবাসিক এলাকা। ইব্রাহীম বাম্বাকে অতিক্রম করে যাবার সময় বিলাসবহুল জমকালো একেকটা মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ, পুঁজো, শেব্রোলে ঘোঁৎ করে থামে। টিনটেড কাচ নেমে যায়। ভেতর থেকে ধবধবে ফর্শা রমনীদের হাত বেরিয়ে আসে। টুং করে কিছু খুচরা পয়সা পড়ে ওর এল্যুমিনিয়ামের বাটিতে।

তখন ইফতারির আজান হয়ে গেছে গেছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে মার্কোরির সবচেয়ে অভিজাত সড়কটি অতিক্রম করি। এখানে চার/পাঁচটি লেবাননি বাড়ির সান্ধ্যপ্রহরী, মালি একত্রিত হয়ে ফুটপাতে কাগজের ছেঁড়া কার্টন বিছিয়ে গোল হয়ে বসেছে। ওদের সামনে কয়েকটি বাটিতে এবং এ্যলুমিনিয়াম ফয়েলে মোড়ানো নানান রকম খাবার। আলুকো, কুসকুস, এ্যটেকে, পোঁড়া মাংস, পেঁয়াজপাতা, মূলা, লেটুশপাতা আর কামরাঙা মরিচ। আমাকে দেখে সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, 'বঁসুয়া'। ওদের একজন, যার দুই পাশের গালে তিনটি করে ছয়টি আঁচড়ের দাগ, যার উচ্চতা সাত ফুট, যার গায়ে অসুরের মতো শক্তি, এবং যে সেই অসুরশক্তি কোন এক অদ্ভুত উপায়ে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে মনিবের সামনে এসে দাঁড়ায়, সে দুই হাত নেড়ে তার বড় বড় দাঁতগুলো বের করে একটি প্রশস্ত হাসি দিয়ে আমাকে ডাকছে ওদের সাথে ইফতারিতে অংশ নেয়ার জন্য। এই লোকগুলোর সাথে আমার একটি নিঃশব্দ, নির্বাক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। রোজই এই পথ দিয়ে হেঁটে যাই। রোজই চোখাচোখি হয়। কখনোই বঁজু (সুপ্রভাত), বঁসুয়ার বেশি কোন কথা হয় না। কিন্তু এরই মধ্যে ওদের সাথে কেমন যেন এক আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যেদিন অফিস থেকে ফিরতে দেরী হয়ে যায়, যেদিন সন্ধ্যার নির্জন অন্ধকারে হাঁটতে বের হই, তখন 'এই লোকগুলো আছে' এই ভরসায়ই সাহস পাই। এই নিরাপত্তাহীনতার শহরে একদল আমারই মতো অভিবাসী কালো মানুষের উপস্থিতি আছে জেনে নিজেকে নিরাপদ মনে করি। ইফতারিতে যোগ দেওয়ার জন্য ওদের আন্তরিক আহবানে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। আমিতো রোজা রাখিনি। রমজান মাসে রোজা না রেখে পথে বের হওয়া এ দেশেও এক বিরাট বিড়ম্বনা। ভীষণ বিব্রতকার অবস্থায় পড়তে হয়। ঠিক করেছি, কাল থেকে রোজা রাখবো। এবং একদিন সত্যি সত্যি ওদের সাথে ইফতারি করতে ফুটপাতে বসে পড়বো।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

কাসাপ্পু গ্রামের নৃত্য

অমাবশ্যা রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঠিক হলো আমরা কাসাপ্পু গ্রামে যাবো। মান ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার লে. কর্ণেল সাঈদ সিদ্দিকী জানালেন, আয়োজন সম্পন্ন। রাত তখন প্রায় দশটা। আমরা বেরিয়ে পড়েছি। সন্ধ্যার দিকে হালকা বৃষ্টি হলেও এখন ফকফকা আকাশ। এসফল্টের মসৃণ রাস্তা। গাড়ি চলছে নিঃশব্দে। মূল সড়ক থেকে ডানে বাঁক নিয়ে শ'দুয়েক গজ ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগুতেই কাসাপ্পু গ্রাম। গ্রামের নামফলক মূল সড়কেই দেখেছি।

গাড়ির হেডলাইটের আলোতে একদল বাচ্চা-কাচ্চা হল্লা করে উঠলো। বুঝতে পারছি, এই জমায়েত আমাদের আগমন উপলক্ষেই। গাড়িগুলোর বাতি নিভে গেলে নিরেট অন্ধকার গায়ের ওপর পাথরের মতো হালমে পড়ে। আমরা অন্ধ হয়ে যাই। কেউ একজন চিৎকার করে ওঠে, বাতি জ্বালাও। অমনি চারটি জিপের হেডলাইট জ্বলে ওঠে। আর একদল শিশু আবারো হল্লা করে ওঠে। একদিকে ছোট্ট এক সামিয়ানা পাতা, অন্যদিকে খোলা উঠান। উঠানের পেছনে বিশাল দুটি মাঙ্গোদ্যু (আমগাছ)। মাঙ্গোদ্যুর নিচে একটি জটলা। জটলার ভেতর থেকে তিন যুবক বেরিয়ে আসে। হাতে ওদের তামতাম। মাথায় বিশেষ ধরণের রঙিন টুপি। অন্যদিক থেকে বেরিয়ে আসে তিন কিশোরী। অতি সংক্ষিপ্ত বস্ত্র ওদের পরণে। বুকে-পিঠে হলুদ রঙের তিনটি করে, প্রজাপতির পাখার মতো দুই দিকে ছড়ানো আঁচড়ের গভীর দাগ আঁকা। শরীরের গঠন দেখে আন্দাজ করছি ওদের একজনের বয়স ষোল, দ্বিতীয়জন বার আর ছোটটির সাত কি আট হবে। এক বয়স্ক লোক একটি জলপিঁড়ির ওপর থেকে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তার হাতে গোত্রপ্রধানের ন্যায়দন্ড। এসে আমাদের সকলের সাথে মাথায় মাথায় তিনবার ঠোকাঠুকি করে কুশল বিনিময় করলেন। এরপর তিনি দুই মিনিটের একটি বক্তৃতা করেন। ইয়াকুবা ভাষার বক্তৃতা। আমরা কিছুই বুঝলাম না। সিলভা, আমাদের দোভাষী। ও বুঝিয়ে দিল, আপনাদের আগমনে ইয়াকুবা সম্প্রদায় সম্মানিত বোধ করছে। আপনারা বিদেশি মেহমান, আমাদের বন্ধু। আমরা বিশ্বাস করি আপনারা আমাদের উপকার করতেই এসেছেন। আপনাদের সম্মানে ইয়াকুবা সম্প্রদায় একটি বিশেষ নাচের আয়োজন করেছে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আজ আকাশে শ্যু (চাঁদ) নেই। শ্যু-এর আলোতে পরীর নাচ দেখতে পারতেন।

বক্তৃতা শেষ করে তিনি আমাদের সকলের সাথে হ্যান্ডশেখ করলেন। একজন জোকারের মতো লোক হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়ে কি সব বলছে আর সবাই হো হো হি হি করে হেসে উঠছে। আমাদের সামনে, তিনদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে শতাধিক নারী-পুরুষ। শুধু আমরা ক'জন সামিয়ানার নিচে বসা, আর আমাদের উল্টোদিকে একটি বড়সড় জলপিঁড়ির ওপর গোত্রপ্রধান এবং তার সাথে আরো দু'জন বুড়ো মানুষ বসে আছেন। জোকার কিছু একটা ইঙ্গিত করতেই তামতামে তেহাই বোল উঠলো আর সাথে সাথে কিশোরী তিনটি লাফ দিয়ে বৃত্তের ভেতরে চলে এলো। শুরু হয়ে গেল উদ্দাম নৃত্য। সমবেত ভিড় এক অদ্ভুত ছন্দে গাইছে, 'তলেও তলেও, মা তোলো'। একদল বলছে, 'তলেও তলেও' আর অন্যদল বলছে, 'মা তোলো'। আমি সিলভাকে জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কি? সিলভা জানালো, যুদ্ধ ভালো নয়, আমরা শান্তি চাই। মেয়ে তিনটি নাচতে নাচতে আমাদের সামনে চলে আসছে, এরপর একজনকে নির্বাচন করে হাত ধরে বৃত্তের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে ওদের সাথে নাচার জন্য। প্রথমেই উঠে গেলেন লে. কর্ণেল আজহার আব্দুল্লাহ। দুই মিনিট নেচেই তিনি ঘেমে ফিরে এলেন। এবার আমার পালা। ওদের সাথে তাল রেখে নাচা অসম্ভব। কি এক অদ্ভুত দক্ষতায় অর্ধ দন্ডায়মান অবস্থায় মাথা সামনের দিকে ঝুকে দুই বাহু এবং বুক দোলাচ্ছে। মনে হচ্ছে তিনটি কাঁদাখোঁচা পাখি সৈকতের নরোম বালুতে নাচছে।

পুরো আইভরিকোস্টে প্রায় ৩০ হাজার ইয়াকুবা আছে। ওদের অল্প কিছু মুসলিম, অল্প কিছু খ্রীস্টান আর বাকী সব এনিমিস্ট। ওরা জল এবং পাথরের পূজো করে। ভাত, এবং কাসাবা খায়। খুব কম ছেলে-মেয়েই স্কুলে যায়। ওদের নিজস্ব ভাষা আছে, ইয়াকুবা ভাষা। রোমান হরফেই এই ভাষা লেখা হয়। একটি ইয়াকুবা দম্পতির গড় ছেলেমেয়ে ৯ জন। ইয়াকুবারা পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করে। জুম চাষ করে। ভূট্টা ও ধান লাগায়। ছেলেরাই বাইরে কাজ করে। ঘরের কাজ মেয়েদের। ছেলে-মেয়ে সকলেই পামরসের মদ গ্লাউয়ে পান করে।

এবার গান বদল হলো। এখন ওরা গাইছে, 'ঝুম ঝুম, ঝুম ঝুম'। নাচতে নাচতে একটু পর পর দাংয়ের (আকাশের) দিকে তাকাচ্ছে। যারা তামতাম বাজাচ্ছে তারাও দাংয়ের দিকে তাকাচ্ছে। ওখানে কি আছে? দেখার জন্য আমরাও তাকাই। নিরেট অন্ধকারের ভেতর একদল তাঁরার হাসি। ওদের তামতামগুলো অন্যরকম। প্রতিটার সামনেই ফনাতোলা চামড়ার সাপ।

আমরা যখন ঘরে ফিরছি, গাড়ির ভেতরে চলছে, 'তলেও তলেও, মা তোলো' ছন্দের ঝড়।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭